

প্রাণমোহোদক

সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়



রামায়ণ-মহাভারতে মারণাস্ত্রের যে বিপুল
সম্ভার আমরা দেখেছি, আজ এতকাল
পরে সেই বিচিত্রক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রগুলি
কোথায় আছে, কেউ কি জানে? কোথায়
গেল পরশুরামের কুঠার, যা দিয়ে নাকি
এত নরহত্যা হয়েছিল যে সেই রক্তে
পাঁচ-পাঁচটা হৃদ তৈরি হয়েছিল
সমস্তপঞ্চকে? কোথায় গেল ভীমের
কালান্তক লৌহগদা, যার আঘাতে চূর্ণ
হয়েছিল মহাবল দুর্যোধনের ঊরু? রাম
হরধনু ভঙ্গ করার পর জনকরাজা কী
করেছিলেন তার ভাঙা টুকরোগুলো
নিয়ে? কী হবে যদি জানা যায় এইসব
দিব্য অস্ত্রের কয়েকটিকে আজও
সংগোপনে একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে
মানবচক্ষুর আড়াল থেকে লুকিয়ে
রেখেছে একদল বীর যোদ্ধা, আর
এদেরই কোনো একটিকে ব্যবহার করে
বন্দীদশা থেকে ফিরে আসতে চাইছে
এক অমিত শক্তিশালী, হিংস্র রাক্ষস?

গল্পের নায়ক বছর পনেরোর অনাথ
কিশোর অভী বেরিয়েছিল সোনার পাখি
ধরতে, কিন্তু তার জীবনটাই পালটে
গেল এক রহস্যময় যোদ্ধার আবির্ভাবে।
তার সঙ্গে অভিযানে বেরিয়ে সে জানতে
পারল, রাক্ষসদের সঙ্গে মানুষদের
প্রলয়ংকর যুদ্ধ শুরু হওয়া সময়ের
অপেক্ষামাত্র। আর তার চেয়েও ভয়ংকর
জিজ্ঞাস্যঃ কে সেই অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীর
প্রলয়যোদ্ধা, যার আগমনে ধ্বংস হয়ে
যেতে চলেছে সমগ্র মানবসভ্যতা?

প্রলয়যোদ্ধা

সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়

অরুণ

অরুণ্যমন প্রকাশনী

উৎসর্গ

প্রাইমারি স্কুলের ক্ষুদে খোকাকে স্পাইডারম্যানের হাত ধরিয়ে
প্রথম ফ্যান্টাসি চিনিয়েছিলেন যিনি, সেই দাদিকে,

আর

মধ্য-ত্রিশের ধেড়ে খোকার ফ্যান্টাসিযাত্রার প্রতিটা অধ্যায় যাঁর এক-সমুদ্র
উৎসাহে বাস্তবায়িত হয়েছে সাদা পাতার গায়ে, সেই সহধর্মিনীকে।

।। ভূমিকা ।।

“আই নিড আ হিরো
আয়াম হোল্ডিং আউট ফর আ হিরো টিল দ্য এন্ড অফ দ্য নাইট
হি'জ গট্টা বি স্ট্রং অ্যান্ড হি'জ গট্টা বি ফাস্ট
অ্যান্ড হি'জ গট্টা বি ফ্রেশ ফ্রম দ্য ফাইট!”

বনি টাইলারের কণ্ঠে হোক বা ‘শ্রেক-টু’ ফিল্মের সেই রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মুহূর্তে ফেয়ারি গডমাদার হিসেবে জেনিফার সন্টার্সের গলায়, এই গানটা শোনামাত্র আমাদের রক্তে একটা দুলুনি আসে। সেটার গতি বাড়ে, শিরায় আর ধমনীতে ছড়িয়ে পড়ে তাপ। আমরা সোজা হয়ে বসি। আগ্রহের সঙ্গে তাকাই দরজা বা স্ক্রিনের দিকে।

কেউ কি আসবে?

কেউ কি আসে?

গান থেমে যায়। নয়তো লুপে ঘুরতে-ঘুরতে ডুব দেয় নিজের মতো করে ক্লাস্তির বৃত্তে। আমরাও চলি নিজেদের ছকে। তবু, ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের স্বপ্নরা পিছু ছাড়ে না। তারা বলে চলে~

“সামহোয়ার আফটার মিডনাইট ইন মাই ওয়াইল্ডেস্ট ফ্যান্টাসি,
সামহোয়ার জাস্ট বিয়ন্ড মাই রিচ দেয়ার'জ সামওয়ান রিচিং ব্যাক ফর মি!

...

আপ হোয়ার দ্য মাউন্টেনস্ মিট দ্য হেভেনস্ আবড
আউট হোয়ার দ্য লাইটনিং স্প্লিটস্ দ্য সি
আই কুড সোয়ার দ্যাট দেয়ার'জ সামওয়ান সামহোয়ার ওয়াচিং মি!”

হিরো! এই নায়ককে খুঁজে বেড়াই আমরা। সে এমন কেউ— যে কোনো বাধা মানবে না, যে কাউকে ভয় পাবে না, যে অন্যায়ের প্রতিকার করবে। করবেই!

মানুষ ঠিক কবে থেকে কল্পনা করতে শিখেছে— এ-কথা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে সেদিন থেকেই তার মনে বাসা বেঁধেছে ন্যায় আর অন্যায়ের ধারণা। একটু-একটু করে সে তার মতো করে ঠিক আর বেঠিকের সংজ্ঞা নির্ধারিত করেছে। আর সেদিন থেকেই সে নায়কের সন্ধান করেছে। সে এমন কাউকে পেতে চেয়েছে— যে তার সঙ্গে হওয়া, দেশ-কাল-সমাজের সঙ্গে হওয়া, হয়তো পৃথিবীর সঙ্গে হওয়া অন্যায়ের বদলা নিতে পারে।

প্রলয় এলেও যে যোদ্ধা ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হয় না।

আপনি বলবেন, এমন আবার হয় নাকি? এ নেহাতই কষ্টকল্পনা— ফ্যান্টাসি! হয়তো তাই। তবু সেই গিলগামেশের যুগ থেকে আজকের অ্যাভেঞ্জার্স অবধি সবই তো ফ্যান্টাসি দিয়েই চিহ্নিত। যুগে-যুগে, দেশে-দেশে শুকিয়ে যাওয়া জলের দাগ আর কালসিটের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা যন্ত্রণার স্মৃতি মুছিয়ে দেওয়ার জন্য কল্পনা থেকেই তো এসেছে নায়কেরা। কল্পনা থেকেই তো তারা রুখে দাঁড়িয়েছে অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য, নিজেকে ‘ইনএভিটেবল’ ভাবা ধ্বংসের সামনে। তাই কল্পনা থেকে অক্সিজেন পেতে চাওয়াটা অবিশ্বাস্য নয়।

অবিশ্বাস্য হল এই কষ্টকল্পিত চরিত্রগুলো। তারা হারে অনেকবার, হারায় অনেক কিছু। তবু শেষ অবধি তারা হেরো নয়, হিরোই থেকে যায় আমাদের কাছে।

কেন? কীভাবে?

ফ্যান্টাসি-র ইতিহাস প্রায় ধর্ম বা বিশ্বাসের মতোই পুরোনো। কেউ বলবেন, ওই ধর্ম বা বিশ্বাসও একসময় ফ্যান্টাসিই ছিল; পরে সেগুলো গুরুগম্ভীর এবং নীতির জালে বদ্ধ কল্পনা হতে-হতে শেষে একেবারে প্রাণঘাতী চেহারা নিয়েছে।

আবার এও সত্যি যে কিছু-কিছু ফ্যান্টাসি দুম্ করে সত্যি হয়ে যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ছত্রিশ রানে অল-আউট হয়ে তিনদিনে টেস্ট হারল ভারতীয় দল। পরের টেস্টেই তারা অস্ট্রেলিয়াকে চূর্ণ করছে, তারপরের টেস্টে ভাঙাচোরা আর আহত খেলোয়াড়দের নিয়ে খেলে টেস্ট ড্র করছে, আর সিরিজের শেষ দিনে ত্রিসবেনের মতো জায়গায় তিনশোর উপর রান তাড়া করে জিতছে— এটা আমাদের আগের প্রজন্মের কাউকে বললে তিনি কি বিশ্বাস করতেন? উঁহু, বরং বলতেন, “এগুলো ফ্যান্টাসি ছাড়া কিছু না!”

ফ্যান্টাসি সত্যি হল, কারণ ওই প্রলয়ঙ্কর বোলিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে পালটা মার দেওয়ার মতো কিছু যোদ্ধা ছিল।

আভিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে ফ্যান্টাসি হল এক ধরনের কল্পকাহিনি (ইমাজিনেটিভ ফিকশন)— যা পটভূমি, কাহিনির চরিত্র এবং চালিকা শক্তির দিক দিয়ে ‘অন্যরকম’ হয়। এই ‘অন্যরকম’ ভাবটি যদি অলৌকিক বা অতিলৌকিক শক্তির প্রভাবে হয়, তাহলেই একে সচরাচর ফ্যান্টাসি বলা হয়। শেকসপিয়রের ‘আ মিডসামার নাইটস্ ড্রিম’ থেকে টোকিয়েন-এর ‘লর্ড অফ দ্য রিংস্’— এমন বহু-বহু স্মরণীয় লেখা এই গোত্রীয়। ফ্যান্টাসি থেকে সায়েন্স ফিকশন আলাদা হয়, কারণ দ্বিতীয় ধারার সাহিত্যে অলৌকিক বা অতিলৌকিক (ম্যাজিক)-এর বদলে প্রযুক্তি তথা এখনও অনাবিষ্কৃত বিজ্ঞান বড়ো ভূমিকা নেয়। বাংলায় আমরা সায়েন্স ফিকশন-কে কল্পবিজ্ঞান বলি বটে। তবে দুই ধারার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। কল্পবিজ্ঞানে কিছু ফ্যান্টাসির উপাদান মিশে যেতে পারে কাহিনির মাধুর্য ও লয় রক্ষার্থে।

এইসব তাত্ত্বিক কচকচানি থাকুক। বরং ভাবি, ফ্যান্টাসি ক'রকমের হয়।

কোনো-কোনো কল্পকাহিনি সংঘটিত হয় আমাদের চেনাজানা পৃথিবীতেই— অথচ তাতে এমন কিছু অলৌকিক বা অতিলৌকিক উপাদান তথা শক্তির উপস্থিতি লক্ষ করা যায় যা বদলে দেয় চরিত্রদের, বা মানবজাতির ইতিহাসকেই। একে বলা হয় লো-ফ্যান্টাসি। বাংলায় এমন কাহিনির উদাহরণ অত্যন্ত সীমিত। অনুষ্টুপ শেঠ-এর 'মিশন পৃথিবী', সায়ক আমান-এর 'আরিন ও আদিম দেবতার উত্থান', তমোঘ্ন নস্কর-এর 'ধুকুমার'... ব্যস। এ-বাদে এই ধারায় স্মরণীয় লেখা আমি অস্তিত্ব পাইনি।

কিছু কল্পকাহিনি সংঘটিত হয় একেবারে অন্য কোনো পৃথিবীতে। তাতে ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা আমাদের মতো হলেও সেখানকার পরিবেশ, প্রকৃতি, তাতে অংশ নেওয়া বিভিন্ন চরিত্র— সবকিছুই হয় একেবারে অন্যরকম। তবে সেখানেও বিপদ ঘনায়। কারও, বা কিছু একটার উপস্থিতিতে সেখানেও আলোকে ক্ষীণ করে অন্ধকারের ঢেউ তুলে দুনিয়া ভাসিয়ে দিতে চায়। তখন আত্মপ্রকাশ করে এক বা একাধিক নায়ক। প্রলয়ের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করতে চায়। ফিরিয়ে আনতে চায় আলো আর শুভ-কে। এদের আমরা বলি হাই-ফ্যান্টাসি।

কখনও-কখনও এমনও হয় যে চেনাজানা পৃথিবীতে ঘটতে থাকা লো-ফ্যান্টাসি হঠাৎ প্রসারিত হয়। ঘটনা ও ঘটমানের সীমা ছাপিয়ে তা সহসা আমাদের নিয়ে যায় চেনা পৃথিবীর বাইরে এক কল্পনাভীত জগতে— যেখানে হাই-ফ্যান্টাসির বাস। জয়ঢাক থেকে প্রকাশিত যৌথ উপন্যাস 'ইতি রুদ্রট' এমন ধাঁচের লেখা।

তবে আলোচ্য উপন্যাস তা নয়। সেটি বিশুদ্ধ হাই-ফ্যান্টাসি। কিংবদন্তি আর রূপকথার কুয়াশায় ঢেকে যাওয়া, অন্যরকম হয়েও যেন চেনা সেই পৃথিবী। কুহক আর সাহস, জাদু আর তরবারি সেখানে একইসঙ্গে ঝলসায়। সেই পৃথিবীতে সত্য, ন্যায়, স্মৃতি, আর মুক্তির জন্য লড়তে চলেছে কেউ। সে জানে, তার সামনে প্রলয়। তবু সে যোদ্ধা পিছিয়ে আসে না।

সে কি পারবে?

“থ্রু দ্য উইন্ড অ্যান্ড দ্য চিল অ্যান্ড রেইন
অ্যান্ড দ্য স্টর্ম অ্যান্ড দ্য ফ্লাড
আই ক্যান ফিল হিজ অ্যাপ্রোচ
লাইক দ্য ফায়ার ইন মাই ব্লাড!”

পাতা ওল্টান এবার। দেখে নিন কী করতে পারে সেই প্রলয়-যোদ্ধা।
সে এসে গেছে।

ঋজু গাঙ্গুলী
কলকাতা, জানুয়ারি ২০২১

‘প্রলয়’ আসার আগে লেখকের কিছু কথা

ধরুন, আপনাকে যদি একটা (একটাই মাত্র) অলৌকিক ক্ষমতা পাওয়ার বর দিতেন কোনো দেবতা, আপনি কী নিতেন?

চাইলেই আপনি পেতে পারেন গুপি-বাঘার মতো জব্বর বর। সবার তাক লেগে যাবে, এমন একটা অসম্ভব ইচ্ছাপূরণের বর। কিন্তু মাত্র একটা।

আপনি চাইতে পারেন সুপারম্যানের মতো মারাত্মক দৈহিক শক্তি, ধরের হাতুড়ির মতো বজ্রডাকা একটা অস্ত্র, হ্যারি পটারের মতো অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আলখান্না, ফ্ল্যাশের মতো অসম্ভব গতি, অথবা ম্যাগনেটোর মতো ধাতব পদার্থকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। চাইতে পারেন আইনস্টাইনের মতো ক্ষুরধার মেধা, শচীন তেডুলকরের মতো অপার্থিব ক্রীড়াদক্ষতা, লতা মঙ্গেশকরের মতো কোকিলকণ্ঠ, অথবা চাইতে পারেন আমি যেটা চেয়েছিলাম, তার মতো কিছু।

আমি কী চেয়েছিলাম? আসছি সে কথায় একটু পরে। তার আগে এই বর পাওয়ার প্রসঙ্গ কেন উত্থাপন করলাম ‘প্রলয়যোদ্ধা’র মতো ফ্যান্টাসি অ্যাডভেঞ্চার বইয়ের মুখবন্ধে, সে কথা বলি।

একটা অসম্ভব ইচ্ছা –যে ইচ্ছা পূরণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা বাস্তব পৃথিবীতে নেই, বা যে ইচ্ছা পূরণ করার সাধ আমাদের আছে কিন্তু সাধ্য নেই – সেই ইচ্ছাগুলোই কি আমরা ‘বর’ হিসাবে পেতে চাইব না? এমন কোনো ইচ্ছা, যা আমরা লালন করে এসেছি মনে মনে দীর্ঘদিন, কিন্তু সাহস করে বলতে পারিনি কখনও, স্বপ্নে হোক বা কল্পনায় তার বাস্তবায়ন যদি ঘটতে পারি, তাই কি ‘ফ্যান্টাসি’ নয়? খুব ছোটবেলায় ফ্যান্টম কমিক্স পড়ে যে ছেলেটা স্বপ্ন দেখত, সেও একদিন হাতে খুলিচিহ্ন-আঁকা আংটি পরে দুষ্টের দমন করে বেড়াবে, তার সেই চাওয়া এই পরিণত বয়সে এসে যতই হাস্যকর লাগুক, সেটা কি ছোটবেলার ফ্যান্টাসি নয়? ফ্যান্টাসির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অক্সফোর্ড ডিকশনারির প্রথম কথাটাই হল “a pleasant situation that you imagine but that is unlikely to happen”; এই ‘আনলাইকলি টু হ্যাপেন’ যেকোনো কল্পনার উড়ানই কি শৈশব হোক বা যৌবনের, পাঠকের হোক বা লেখকের, ফ্যান্টাসির আত্মা নয়?

প্রশ্ন হল, এইরকম একটা ফ্যান্টাসি গল্প লেখায় কেন হাত দিলাম? উত্তরটা সহজ – পাঠক হিসাবে আমি নিজে যেধরনের লেখা পড়তে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি, লেখক হিসাবে সেই ধরনের লেখাই যে লিখতে চাইব, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। হ্যারি পটার বা পার্সি জ্যাকসনের ভক্ত পাঠক হিসাবে একটা বিষয় আমাকে ভীষণভাবে পীড়া দিয়েছে যে বাংলায় এইধরনের হিরোয়িক ফ্যান্টাসি খুব একটা লেখা হয়নি; আদৌ যদি হয়ে থাকে, আমার সীমিত পাঠপরিসরে সে বিষয়ে আমি অবগত নই। তাই অন্তর থেকে একটা তাগিদ ছিল ভারতীয় পটভূমিকায় ভারতীয়

চরিত্র নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার ফ্যান্টাসি লেখার এবং এর লেখক হিসাবে আমার একদম প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল পাঠককে আনন্দ দেওয়া, যে আনন্দকে কল্পবিজ্ঞানের মায়েস্ত্রো অভিহিত করেন “sense of wonder” নামে, আর আমাদের কবি যে আনন্দের মননে বলেন “বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান”। সে আনন্দসন্ধানের কাজে কতটা সফল হওয়া গেছে, পাঠক বিচার করবেন। অগ্রজসম সুসাহিত্যিক মাননীয় ঋজু গাঙ্গুলীবাবু এবং অরণ্যমনের মাননীয় চিরঞ্জী৭ দাসবাবুকে অশেষ ধন্যবাদ এই নব্যকলমের উপর ভরসা রাখার জন্য। শিল্পী কৃষ্ণেন্দু মন্ডলকে কৃতজ্ঞতা জানাই চিত্তাকর্ষক প্রচ্ছদ ও অলংকরণগুলির জন্য।

এখানে একটা কথা না বললেই নয়। ভারতীয় পুরাণ বা মহাকাব্যকে কোনোভাবেই নকল না করেও সেখান থেকে যে বিপুল পরিমাণ মানিক্যসম্ভার আহরণ করা যায় একান্তই ভারতীয় স্বাদের ফ্যান্টাসি জগৎ সৃষ্টির উপাদান হিসাবে (ঠিক যেমন পটারদুনিয়ায় জে. কে. আর. করেছেন গ্রিক, কেল্টিক উপকথা এবং বাইবেল থেকে), এই সত্য উপলব্ধি করেছি এই উপন্যাসের নেপথ্যের তথ্য সংগ্রহ করার সময়। কিন্তু এ কথাও বলব, পটার-কাহিনী এবং ভারতীয় মহাকাব্য – এই দুই ভিন্নধর্মী সাহিত্যধারা ‘প্রলয়যোদ্ধা’র জমিকে উর্বর করলেও সজ্ঞানে আমি কোথাও এই দুটি সোর্সকে অনুকরণ করিনি। বিশেষ কোনো একধরনের ম্যাজিক স্কুল ব্যাপারটা ফ্যান্টাসি সাহিত্যে অবশ্যই নতুন নয়। পটারভার্স ছাড়াও ভ্যাম্পায়ার অ্যাকাডেমি, পার্সি জ্যাকসন, হিরোজ অফ অলিম্পাস, আ উইজার্ড অফ আর্থসী বা দ্য নেম অফ দ্য উইন্ডের মত উপন্যাস এবং সিরিজগুলোতে আমরা অদ্ভুত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেখা পাই, যেখানে বিশেষ ধরনের ক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্ররা পড়তে আসে। গ্রাফিক নভেলের দুনিয়াতেও অভাব নেই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের। সুপারহিরো এক্সমেন কমিক্সে প্রফেসর চার্লস জেভিয়ার চালান ‘এক্স-ম্যানসন’ স্কুল, যেখানে ঘুরে বেড়ায় উলভারিন, জিন গ্রে, স্টর্ম, স্কট সামার্স, বিস্টদের মত সুপারপাওয়ারের অধিকারী মিউট্যান্টরা। আর ভবিষ্যতের মহাবীরদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো শিক্ষকের খোঁজে আমাদের বিদেশে না তাকালেও চলে। স্বয়ং গুরু দ্রোণাচার্যের ক্লাসই তো আছে অনুপ্রেরণা হিসাবে। তাঁর ছাত্রদের নিয়েই তো মহাভারতের এত বড়ো যুদ্ধটা হয়ে গেল। কিন্তু ‘প্রলয়যোদ্ধা’র সামরিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই পূর্বসূরীদের মিল এইটুকুই। বলা যায়, ফ্যান্টাসির সেই পরিচিত ঐতিহ্যকেই এই উপন্যাস অনুসরণ করেছে।

মিস্টবর্ণ ট্রিলজি-খ্যাত লেখক ব্র্যান্ডন স্যান্ডারসন একবার ফ্যান্টাসি নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, বেশিরভাগ ফ্যান্টাসির মূল কথা হল, যদি কোনো সাধারণ মানুষ দেবতাদের মত ক্ষমতা পেয়ে যায়, তাহলে কী হবে? এ যেন হঠাৎ পাওয়া কোনো এক অলৌকিক ‘বর’, যার বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে কোনো এক হরিদাস পাল, সমকক্ষ হয়ে ওঠে অমিতপ্রভাব দেবতাদের। কিন্তু তারপর? ক্ষমতার অলিন্দে অনুরণিত হয়ে চলে বহু ব্যবহৃত কিন্তু আজও অতি প্রাসঙ্গিক স্পাইডারম্যানের সেই জীবনদর্শনঃ “With great power comes great

responsibility". কী হয় যখন একটা সরল, সাধারণ ছেলে বুঝতে পারে তার জন্য ডাক পাঠিয়েছে নিয়তি, আর তার হাতে উঠে আসে এমন এক ধ্বংসের অস্ত্র যাকে ভয় পায় দেবতা-দানব সকলে? সেই 'গ্রেট পাওয়ারের' সঙ্গে আসা অসাধারণ হয়ে ওঠার 'গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি' সামলাতে পারবে তো ওই নিতান্ত সাধারণ ছেলেটা?

তার সেই বিচিত্র যাত্রাপথের সফরসঙ্গী হওয়ার সাদর আমন্ত্রণ রইল আপনার।

কী বর চাইবেন, এতক্ষণে ঠিক করে ফেলেছেন তো?

কী বলছেন? এই সব বর-টর, এসব আবার বাস্তবে হয় নাকি? ফ্যান্টাসি তো সোনার পাখির মতোই কল্পনার জিনিস; তা আবার সত্যি হয় নাকি?

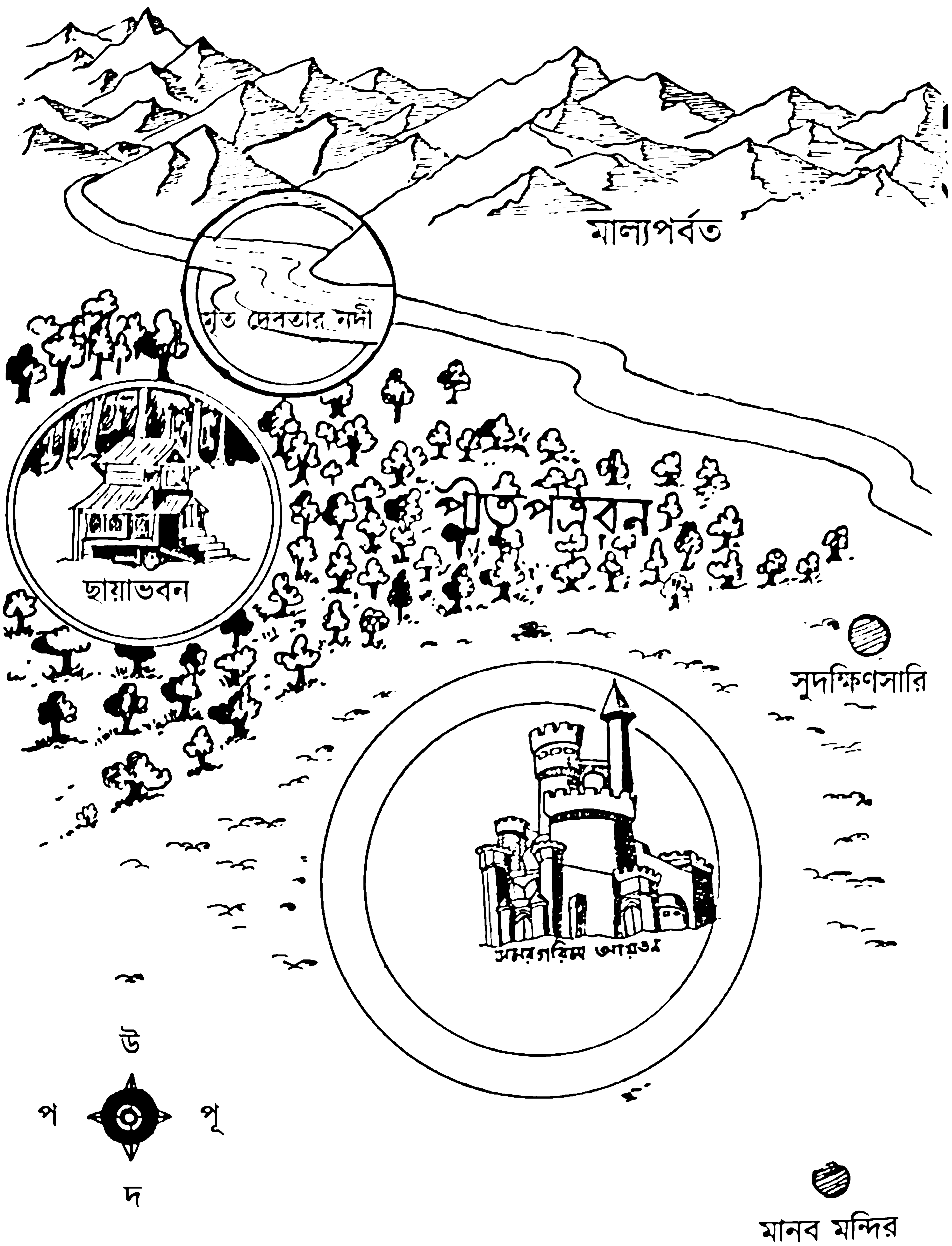
হয়, হয়। খুব করে চাইলে সে চাওয়া সত্যি হয়। আমারটা হয়েছে তো।

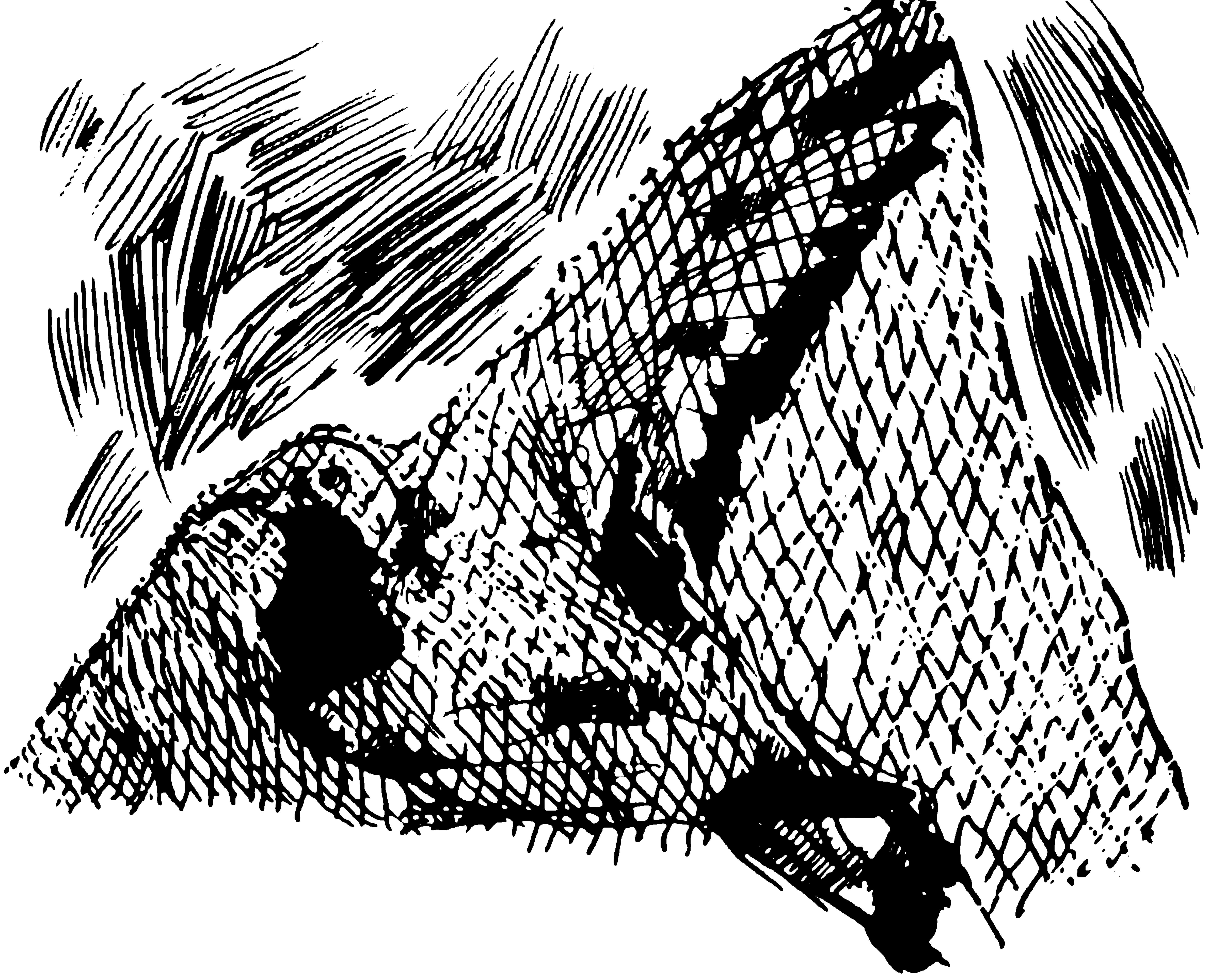
বিশ্বাস হল না? আমার পাওয়া 'বর'টা বলি তাহলে?

আমি কী চেয়েছিলাম, জানেন? আমি চেয়েছিলাম, আমার বইটা একবার হাতে তুলে নিন আপনি, একবার দেখুন পাতা উলটে। মানুষ, রাক্ষস আর অর্ধরাক্ষসদের বহুবর্ণরঞ্জিত জগতের একঝলক দৃশ্য উঁকি দিয়ে যাক আপনার চোখের তারায়। একটা অতি সাধারণ ছেলের অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্পের চিরন্তন ফ্যান্টাসি স্পর্শ পাক আপনার পাঠকল্পনার – হ্যাঁ, আপনারই।

বিশ্বাস করুন, যা পড়তে চলেছেন, এ আপনার জন্যই লেখা। সোনার পাখির দিব্যি।

সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়
জানুয়ারি, ২০২১





।। প্রথম অধ্যায় ।।

স্বর্ণখেচর

সোনার পাখি খুঁজে পাওয়া বড়ো সহজ কাজ নয়।

প্রায় দু'ঘণ্টা হতে চলল ওরা দু'জন ঘুরছে বৈকালির জঙ্গলে। যখন ওরা ঢুকেছিল, তখন পূর্বদিকের মিঠে রোদ গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে লম্বা লম্বা রেখায় এসে পড়ছিল ওদের পায়ের কাছে; এখন সূর্য অনেকটা ওপরদিকে উঠে গেছে। ঘাম দিচ্ছে কপালে।

জামার হাতায় মুখ মুছল অভী। পাখিগুলোকে খুঁজে বের করা যে বেশ কঠিন কাজ, সে ভালোই জানে। ঝরে পড়া হলদে পাতার সঙ্গে মিশে এমনভাবে লুকিয়ে থাকে সোনালি প্রাণীগুলো যে ঠাহর করে ওঠা মুশকিল। এমনকি রবিকাকার মতো ওস্তাদ লোকও এখনও হাতড়ে বেড়াচ্ছে জঙ্গলময়।

বিশাল বিশাল সব পুরোনো গাছের কাণ্ড কালচে সবুজ হয়ে এসেছে। তাদের ছালের সোঁদা গন্ধ পাচ্ছিল অভী। এমনিতে রবিকাকা ওকে শিকারে আনতে চায় না; বলে, “ও ছোটো ছেলের কাজ নয়।” শিকার মানে অবশ্য কোনো জন্তুজানোয়ার মারা নয়; এই পাখি ধরার অভিযানগুলোকেই রবিকাকা ‘শিকার’ বলে।

আজ সে রীতিমতো আন্দোলন করে জঙ্গলে আসার অনুমতি আদায় করেছে। কাল রাতে কিছুটি না খাওয়ার হুমকি দিতে রবিকাকা ঘাবড়ে গিয়েছিল; আর ‘না’ বলতে সাহস পায়নি।

মাথার ওপরে গাছের ডালগুলো থেকে কতরকমের চেনা-অচেনা পাখি ডাকছে। জঙ্গলের মাটি জায়গায় জায়গায় নরম হয়ে আছে – পা ফেললে ‘ভুস’ করে পা ডুবে যায়। পাখির সন্ধানে মাটিতে নজর রাখতে গিয়ে তার চোখে পড়ল, নিমগাছের তলায় একটা বড়োসড়ো মাটির ঢিবির দিকে কুচকাওয়াজ করে চলেছে ডেঁয়োপিঁপড়ের বাহিনী।

রবিকাকা সাবধান করে দিল। “অভী, ভুলেও শুকনো পাতা মাড়াবি না। স্বর্ণখেচর ভালো দেখতে পায় না ঠিকই, কিন্তু ওর কান খুব সজাগ। এ পাখি ধরার কাজে যদি আমার সঙ্গে নিয়মিত আসতে চাস, তাহলে কিন্তু এই ব্যাপারগুলো চটজলদি শিখে নিতে হবে।”

মাথা নাড়ল অভী। এত কাণ্ড করে তবে সে আসতে পেরেছে এই পাখিধরার অভিযানে। উলটোপালটা কিছু করলে রবিকাকা হয়তো আর সঙ্গে আসতেই দেবে না। খুব সাবধানে, দেখেওনে পা...

মড়াং!

যাক্সাবা! মরা ডালটা চোখেই পড়েনি। আর পা-টাও পড়বি তো পড়...

চোখ পাকিয়ে তার দিকে ফিরেছিল রবিকাকা, নীচুগলায় একটা ধমকও দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই তার চোখে পড়ে গেল জিনিসটা।

রবিকাকার ডানহাতের তর্জনী উঠে এল মুখের সামনে, ঠোঁট সরু হয়ে গেল।

“শশশ!”

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অভীও দেখতে পেল পাখিটাকে। সেই পিঁপড়ের ঢিবিটার ঠিক পেছনেই বসে আছে স্বর্ণখেচর – টুকটুক করে ধরে খাচ্ছে একটা একটা পিঁপড়ে।

হঠাৎ শব্দ হওয়ায় একটু চমকে উঠে মাথাটা তুলে তাকিয়েছিল পাখিটা, আর রবিকাকা অমনি দেখে ফেলেছে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে ওদের, ব্যাটা উড়ে পালায়নি।

নিমগাছের পাশে এত নিখুঁতভাবে পাখিটা মিশে আছে পাতার মাঝে যে তাকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল বলতে হবে। অভী তাকাল রবিকাকার দিকে। সে তাকে এক পা পিছিয়ে যেতে ইশারা করল।

এত কাছ থেকে যেন হাতছাড়া না হয় এই মহামূল্যবান স্বর্ণখেচর।

রবিকাকার দীর্ঘ, বলশালী শরীরটা একটুখানি ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে; গুঁড়ি মেরে সে এগিয়ে গেল পিঁপড়ের ঢিবিটার দিকে। পাখিটা তখনও একমনে পিঁপড়ে খেয়ে যাচ্ছে।

শুকনো পাতায় যাতে পা না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রেখে চুপিসারে রবিকাকা এসে পৌঁছোল নিমগাছের পেছনে। পাখিটা এখনও কিছু বুঝতে পারেনি। শিকারের এত কাছে তাকে পৌঁছোতে দেখে অভী দম বন্ধ করে তাকিয়ে রইল।

‘হুস্’ করে ডালটা এসে পড়ল তার গায়ের ওপর। পিঁপড়ে খাওয়া ভুলে ‘ক্যাঁ-ক্যাঁ’ করে ডানা ঝটপটিয়ে পালানোর চেষ্টা করল সোনার পাখি, কিন্তু

পারল না। জালের সঙ্গে ভালোমতোই জড়িয়ে গেছে সে।

শূন্যে দু'হাত ছুড়ে চোঁচিয়ে উঠল রবিকাকা। “ধরেছি!”

অভী ছুটে এল। “তুমি বলেই এত সহজে পারলে।”

রবিকাকা হাসল। “উঁহু! আমি নই, আমরা। তুই যদি গাধামি করে শুকনো ডালে পা না দিতিস, তাহলে কাজটা এত সহজে হত না।”

রাগ করবে, না হাসবে, ভাবতে অভীর একটু সময় লাগল।

রবিকাকা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জাল গুটিয়ে নিল না; বলল, “কাছে আয়। ভালো করে দেখ।”

পাখিটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল অভী। ব্যর্থ ডানা-ঝটপটানি তখনও চলছে জালের তলায়। রবিকাকার নীচুগলায় বলা কথাগুলোর মধ্যেও উত্তেজনার আঁচটা পরিষ্কার। “ভালো করে পালকগুলো দেখ। বিশেষ করে লেজের দিকেরগুলো। খাঁটি সোনা।”

সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে স্বর্ণখেচরের পালকগুলো। অভী বুঝতে পারল, কী এক অজানা কারণে তার বুক ধুকধুক করছে।

সে বলে উঠল, “আজ রাতে আমি তোমার সঙ্গে যাব।”

“ব্যবসায়ীদের কাছে? অসম্ভব। ছোটো ছেলেদের জন্য ওসব জায়গা নয়।”

“শিকারে আসার আগেও তুমি একই কথা বলেছিলে।”

“সে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। বাড়াবাড়ি করিস না অভী।”

অভী গম্ভীরমুখে বলল, “বাড়াবাড়ির কী দেখলে?”

রবিকাকা কয়েক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে; তারপর বলল, “আমি জন্তুজানোয়ারের ভয় পাই না রে। কিন্তু মানুষদের আমি ভয় করে চলি। আর সেইসঙ্গে রাক্ষসদেরও।”

“রাক্ষস বলে কিছু হয় না,” হেসে উঠল অভী। “তুমি মাঝেমধ্যেই রাক্ষসদের কথা বলো কেন গো? ওসবে আবার কেউ বিশ্বাস করে নাকি?”

মাথা নাড়ল রবিকাকা। “সে তো সোনার পাখিতেও কেউ বিশ্বাস করে না।”

পাখিটা এতক্ষণে ছটফটানি বন্ধ করেছে। জংলা দুপুরের আলোয় কী অপূর্ব লাগছে তাকে!

অভী বলল, “আচ্ছা রবিকাকা, আমরা পাখিটাকে মারব না তো? পশুপাখি মারতে আমার ভালো লাগে না।”

“আমারও না। আর স্বর্ণখেচর মারার তো প্রশ্নই ওঠে না। এ মায়াজগতের পাখি – ভীষণ দুর্লভ। সারা পৃথিবীতে আর গুটিকয়েক হয়তো আছে। আমাদের কাজ একে ব্যবসায়ীর কাছে নিয়ে যাওয়া। সেখানে ওরা এর লেজ থেকে পালক খসিয়ে নিয়ে একে ফেরত দেবে, আর আমরা আবার একে এনে এই জঙ্গলে ছেড়ে দেব। কয়েকমাসের মধ্যেই স্বর্ণখেচরের আবার পালক গজিয়ে যায়।”

“আমরাই যদি পালক ছাড়িয়ে নিয়ে যাই?”

রবিকাকা বলল, “উঁহু। ওরা পাখির গা থেকে পালক ছাড়াবে, এটাই দস্তুর।

তবে তো প্রমাণ হবে, পালকগুলো আসল। নয়তো এসব দুর্মূল্য জিনিসের নকলের অভাব তো আর বাজারে নেই।”

জাল থেকে ছাড়িয়ে পাখিটাকে একটা ছোট থলিতে পুরে ফেলল সে; বলল, “চল, এবার ফেরা যাক।”

অভী বলল, “রাতে আমাকে নিয়ে যাবে তো?”

“ভেবে বলব। এখন ফিরি চল। খিদে পাচ্ছে।”

জঙ্গলের পথ ধরে ফিরে চলল ওরা। এখন আর শুকনো পাতায় শব্দ হলেও ভয়ের কিছু নেই।

বৈকালির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ধু-ধু মাঠ। মাঠ পেরিয়ে ওদের বাড়ি। মাঠের ঈশান কোণে বড়ো বটের তলায় বসে ছিল ছেলেগুলো।

ওদের দেখেই অভীর হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেল।

সে পেছন ফিরে দেখল, রবিকাকা সন্তর্পণে থলিটা পকেটে ঢোকাচ্ছে।

এই ছেলেগুলোর সঙ্গে ওদের বরাবরের শত্রুতা। রবিকাকা চাপা গলায় বলল, “অভী, ওরা যাই বলুক, পাস্তা দেওয়ার দরকার নেই। মাথাগরম করবি না একেবারে।”

অভী উত্তর দিল না। সে বুঝতে পেরেছে, ওরা তাদের ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছে। ওই যে উঠে দাঁড়াল ওদের পালের গোদা রণিতটা। ছেলেটা ওর থেকে বয়সে বড়ো, চেহারাতেও। ব্যায়াম করা পুষ্ট শরীর। তার তুলনায় অভী নিতান্তই এক বছর-পনেরোর রোগাপটকা।

রণিতের হাতে একটা ইকিস্টিক আছে, খেয়াল করল সে।

রবিকাকা আবার সতর্ক করল, “সাবধানে অভী। ঠান্ডা মাথায়।”

“এই আসছেন কাকা-ভাইপো!” ব্যঙ্গের সুরে চিৎকার করে বলল রণিত। হো হো করে হেসে উঠল তার চ্যালা-চামুন্ডারা।

আর একটা ছেলে, সুমিত না কী যেন নাম, বলে উঠল, “হাঁটিছে দেখ উল্লুকটা!” – বলে বিচ্ছিরিভাবে নকল করতে লাগল অভীর হাঁটার কায়দা। আর একটা হাসির রোল উঠল বটতলায়।

অভী হঠাৎ অনুভব করল, তার হাতের তালুদুটো বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। যখনই সে রেগে যায়, এমনটা কেন যে হয়, সে নিজেও জানে না।

রবিকাকা বলল, “উত্তর দিস না, অভী। পা চালিয়ে পেরিয়ে চল। সব কথার উত্তর দিতে নেই।”

ফাঁকা মাঠে মাথার ওপর ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, কপাল থেকে গড়িয়ে নামছে ঘাম। কিন্তু অভীর হাতদুটোতে যেন পৃথিবীর যত বরফ সব এসে জমা হচ্ছে; হাতগুলো ভারী লাগছে।

রবিকাকার হাতে জালটা ঝুলছিল। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে রণিত বলল, “বেচারারা গরিব মানুষ, শিকার করে খায়। আজ ওদের জালে কিন্তু দারুণ জিনিস পড়েছিল, জানিস তো?”

রবিকাকার মুখটা যে একমুহূর্তের মধ্যে শক্ত হয়ে উঠল, তা নজর এড়াল না অভীর।

“কী জিনিস? কী জিনিস?” বাকিরা জানতে চাইল।

যেন ভারী রসিকতা করছে, এমনভাবে রণিত বলে উঠল, “বাতাস!”
আবার হাসির রোল।

অভীর মনে হল, ছুটে গিয়ে ছোকরার গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়, কিন্তু রবিকাকা চাপা গলায় বলল, “হাসুক ওরা। তোর-আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা যে কী জিনিস পেয়েছি, তার মূল্য বোঝার সাধ্য ওদের নেই। অবশ্য আমরা ওদের জানাতেও যাচ্ছি না।”

ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে হাসল সে।

রণিতের দলবল ঝামেলা পাকানোর একটা অজুহাত খুঁজছিল। হকিস্টিক হাতে লাফিয়ে উঠল রণিত। “আমাদের দেখে হাসা হচ্ছে?”

বাকি ছেলেগুলোও এগিয়ে এল দলপতির পেছন পেছন। এইবার মজা হবে জোরদার, ওরা জানে।

দুটো কিস্তুর ধোলাই দেখতে কার না ভালো লাগে?

রবিকাকা বলল, “শোনো হে ছোকরা, আমরা কিন্তু কোনোরকম ঝুটঝামেলা করতে চাইছি না।”

“ঝামেলায় তো তোরা পড়েই গেছিস, ভিখারির দল। কাজকন্মো তো কিছু করতে দেখি না তোদের। দিন চলে কী করে? কোথায় যাস ভিক্ষে করতে? ক’পয়সা পাস শিকার ক’রে? নাকি চুরি করিস?”

অভী বলে উঠল, “আমরা শিকার করি না। আমরা চুরি কিংবা ভিক্ষেও করি না।”

রণিত হি হি করে হাসল। “শিকারিও নই, ভিখারিও নই। বাঃ বাঃ! হ্যাঁ রে বুড়ো, আমাদের দেখে তুই হাসলি কেন, সেইটা বল আগে। আমাদের দেখে তোর সং মনে হয়?”

অভীর হাতগুলো যেন ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে, মাথার মধ্যে তাল পাকাচ্ছে অসহনীয় ঘৃণাবোধ। সে বলল, “কাকার কী মনে হয় জানি না, আমার কিন্তু মনে হয়।”

চোখ সরু করে তাকাল রণিত। “ও বাবা! গুঁয়োপোকাকার বাচ্চাটা দেখি বেশ চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি ঝাড়ে! দাঁড়া, তোর ব্যবস্থাই আগে করছি।”

হকিস্টিকটা বাগিয়ে ধরল সে। রবিকাকা এগিয়ে এসে শান্তভাবে বলল, “কেটে পড়ো এখান থেকে, রণিত। তোমার বাবা এখানকার নামকরা ব্যবসায়ী, তাঁর একটা মানসম্মান আছে। সেইজন্যই বলছি, ভদ্রলোকের আর নাম ডুবিয়ে না। মারামারি করতে চাইলে বরং এমন লোকের সঙ্গে গিয়ে করো, যাকে অন্তত দু’ঘা দিতে পারবে। বলি, হকিস্টিক ধরতে জানো আদৌ?”

অভী বুঝতে পারার আগেই রণিত তেড়ে এল। প্রচণ্ড বেগে হকিস্টিক ঘুরিয়ে সে আঘাত করল রবিকাকার মাথায়।

কী এক অদ্ভুত কৌশলে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় রবিকাকা যে আঘাতটা এড়িয়ে গেল, কেউ বুঝতেই পারল না। চোখের নিমেষে রণিতের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে তার হাতটা মুচড়ে দিল সে, আর রণিতের হাত থেকে অস্ত্রটা ছিটকে পড়ল

তিন হাত দূরে। গভীর শ্বাস টেনে বাকি ছেলেগুলো পিছিয়ে গেল কয়েক পা।
রবিকাকা রণিতের হাত ছেড়ে দিল। মোচড়ানো কবজি নিয়ে “উঃ উঃ”
করতে করতে সে সরে গেল কিছুটা। তার চোখে জল এসে পড়েছে। তার
চালাদের চোখে ভয়, বিস্ময়, সম্ভ্রম।

রবিকাকা মিষ্টি হেসে বলল, “আজকের মতো তাহলে পড়াশোনা এখানেই
বন্ধ হোক। এবার ছোকরারা বাড়ি যাও, মায়ের কাছে ফিরে যাও; কেমন?”

রণিত আর কিছুটা বলল না। তার মাথা নীচু – দলের ছেলেদের সামনে
তার সম্মান ধুলোয় মিশে গেছে।

মাঠ পেরিয়ে বাকি রাস্তাটা চুপচাপ বিনা বাধায় হেঁটে এল ওরা। রাগে
তখনও অভীর রণের শিরা দপদপ করছে। নিজের হাতের দিকে তাকাল সে।
এখনও বেশ ঠান্ডা হাতগুলো, তবে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। দরজা খুলে
ভেতরে ঢুকল ওরা।

পকেট থেকে স্বর্ণখেচরের থলিটা বার করে পাখিটাকে একটা ছোট্টো
খাঁচায় ভরতে ভরতে রবিকাকা বলল, “আয়, এবার খাওয়া-দাওয়া করে একটু
বিশ্রাম করে নেওয়া যাক। আজ রাতে মোটা টাকা পাওয়া যাবে।”

জানালা দিয়ে বহুদূরের মাঠে জটলাটায় ছেলেগুলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব
এখনও দেখা যাচ্ছে, অভী সেইদিকে তাকিয়ে ছিল। রবিকাকা এসে তার
কাঁধে হাত রাখল। “ঘৃণা করিস না রে ওদের। ওরা আমাদের বোঝে না, তাই
খোঁচাতে চায়। একটা কথা মনে রাখিস, আজ রাতে যাদের সঙ্গে আমরা দেখা
করতে যাচ্ছি, তাদের তুলনায় ওই ছেলেগুলো আদৌ বিপজ্জনকই নয়।”

অভী একটু খুশি হয়ে তাকাল। যাক, সে তাহলে যাচ্ছে।

সে প্রশ্ন করল, “কেমন মানুষ তারা?”

রবিকাকা গম্ভীরমুখে বলল, “তাদেরকে আদৌ ‘মানুষ’ বলা যায় কিনা,
সন্দেহ আছে আমার।”

রাতের জঙ্গলের চেহারা দিনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিশাল বিশাল থামের
মতো দাঁড়িয়ে আছে কালো কালো গাছের ছায়ামূর্তি। মাথার ওপর গাছের
পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে টুকরো টুকরো তারাভরা আকাশ। জঙ্গলের
মধ্যে কেমন একটা ঠান্ডা, গা-শিরশিরে ভাব। দূরে কোথায় কুব-কুব করে কী
একটা পাখি ডাকছে। শুকনো পাতার ওপরে হঠাৎ খচমচ শব্দে বোঝা যায়,
কোনো একটা ছোটোখাটো জন্তু চলে গেল।

রবিকাকার একহাতে একটা বড়োসড়ো টর্চ, আর আর এক হাতে পাকা
বাঁশের লাঠি। অভীর হাতে দুলছে স্বর্ণখেচরের ছোট্টো খাঁচাটা। পাখিটা সাড়াশব্দ
করছে না; বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

মাটিতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সামনে যাচ্ছিল রবিকাকা; বলল, “সাপ আসবে
না এতে। ওদের কান নেই বটে, কিন্তু মাটির কম্পনে বুঝে নেবে, এদিকে
আসা ঠিক নয়।”

শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলছিল ওরা অন্ধকার জঙ্গল ভেদ করে। বড়ো বড়ো গাছগুলোর ঝুপসিমতো মাথায় শ'য়ে শ'য়ে দপদপ করছে জোনাকি। একটানা ঝাঁঝি ডেকেই চলেছে জঙ্গলময়। রবিকাকার টর্চের আলোয় দেখা গেল, গাছের ফাঁকে ফাঁকে জাল বিছিয়ে চুপটি করে বসে আছে মাকড়সারা। আলো গায়ে পড়তে তাদের একজন একটু নড়ে উঠল।

“দারুণ লাগছে কিন্তু!” খুশিয়াল গলায় বলে উঠল অভী।

রবিকাকা বলল, “আস্তে বল। রাতের জঙ্গলে চ্যাঁচাতে নেই।”

“ঠিক আছে, চ্যাঁচাব না। কিন্তু আর কতদূর?”

“খুব দূরে নয়, কিন্তু খুব কাছেও নয়। এই জঙ্গল পেরিয়ে পাহাড়। সেই পাহাড়ের তলায় মারীচের দোকান। খদ্দেররা সেখানেই অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।”

আরও ঘণ্টাখানেক জংলা পথে হাঁটার পর গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল কালো পাহাড়ের বহুদূরের অবয়বটা। অভীর ক্লান্ত লাগছিল, কিন্তু অদ্ভুত এক উত্তেজনায় তখনও সে ফুটছে। আগে সে কখনও রান্সস দেখেনি।

রবিকাকা অবশ্য সাবধান করে দিয়েছে ওখানে গিয়ে বেফাঁস কিছু না বলতে। রান্সসদের সঙ্গে মানুষদের মৌখিক সদ্ভাব একটা আছে ঠিকই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কেউ কাউকে পছন্দ করে না। রবিকাকা বলে দিয়েছে, “যারা এসব জিনিসের ব্যবসা করে, তারা সাধারণত বিপজ্জনক লোক হয়। তাই সাবধানে থাকাই ভালো।”

“আমরাও তো এসবেরই ব্যবসা করছি। আমরাও কি বিপজ্জনক?”

“নই কে বলেছে?” হেসে বলেছিল রবিকাকা।

ছোটো পাথরের বাড়িটা দূর থেকেই দেখতে পেল অভী। ভেতরে আলো জ্বলছে, জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

তারা-মিটমিট আকাশের গায়ে পাহাড়টাকে একটা দানবের মতো লাগছে। ওরা দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল।

রবিকাকা বলল, “রান্সসেরা বেশিরভাগ আমাদের মতোই দেখতে হয়। বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। এই যে মারীচ – যার কাছে আমরা এখন যাচ্ছি – দিব্যি সবার সামনে তেল, নুন, চাল, ডালের ব্যবসা করছে। দেখে কারও বোঝার সাধ্য নেই, ও মায়াবিদ্যায় কত বড়ো ওস্তাদ একজন রান্সস। তবে হ্যাঁ, লোকটা নিজেকে খুব একটা ঝামেলায় জড়াতে চায় না।”

অভী বলল, “ঝামেলায় জড়াতে চায় না তো স্বর্ণখেচরের পালকের মতো গোপন জিনিসের চোরাব্যবসা করে কেন?”

রবিকাকা বলল, “ও বেচারার ওপরেও চাপ আছে। রান্সসদের মধ্যে প্রভাবশালী লোকের তো অভাব নেই। ওর দোকানটাকে ব্যবহার করে এইসব মায়াজগতের জিনিসের গোপন কারবার অনেকদিন ধরেই চলছে, যদিও বাইরে থেকে দেখে কিছুটা বোঝার উপায় নেই।”

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনবার টোকা দিল রবিকাকা। “দোকান আজ বন্ধ হয়ে গেছে, কাল সকালে এসো,” ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল।

রবিকাকা হেঁড়ে গলায় গেয়ে উঠল, “খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।”

ঝট করে খুলে গেল দরজাটা। ভেতরে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে।

যে লোকটা দরজা খুলেছিল, সে বলল, “এসো রবি, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।”

তারপর তার চোখ পড়ল পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অভীর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসি মিলিয়ে গেল তার। সতর্কভাবে সে বলল, “এ কে?”

“আমার ভাইপো, অভী।”

“তোমার ভাই আছে, জানতাম না তো?”

“এবার জানলে তো? ভাই আর তার বউ মারা গেছে অনেকদিন। এ ছেলেটাকে আমিই মানুষ করছি।”

ভেতর থেকে কড়াগলায় কে যেন বলল, “কে এসেছে, মারীচ? ভেতরে না এসে বাইরে দাঁড়িয়ে এত খোশগল্প কীসের?”

মারীচ ঢোক গিলে বলল, “এই যে, আসছি।” তারপর নীচুগলায় বলল, “তুমি বুদ্ধিমান লোক বলেই তো জানতাম, রবি। এইটুকু মানুষবাচ্চা নিয়ে এসব জায়গায় কেউ আসে? যাক গে, ভেতরে এসো। সাবধানে কথাবার্তা বোলো। ব্যাটার মেজাজ খুব একটা সুবিধের নেই আজ।”

তার পেছন পেছন ওরা দু'জন দোকানঘরের ভেতর ঢুকে এল। নানা আকারের বস্তায় ডাই করা আছে ভূষিমালা দোকানের মালপত্র। রবিকাকা ইশারা করল দোকানের পূর্বদিকে একটা ঘরের পর্দাটানা দরজার দিকে। “এদিকে, অভী।”

পর্দা সরিয়ে প্রথমে ঢুকল মারীচ, তারপরে রবিকাকা, শেষে অভী। এ-ঘরে একটা মস্ত টেবিলের ওপর হ্যাজাক জ্বলছে, তাই সামনে ঘরের তুলনায় এ-ঘরে আলো বেশি।

দেয়ালে ঝুলছে সুন্দর সুন্দর পটচিত্র। এক জায়গায় টাঙানো আছে একটা কারুকার্য করা বড়ো ঢাল, তার নীচে কোনাকুনি ভাবে রাখা আছে দুটো তলোয়ার। আর তার ঠিক নীচেই টেবিলের ওপারে বসে আছে দুটো লোক।

তাদের একজনের মুখের ওপর এমনভাবে কাপড় ঢাকা দেওয়া আছে যে চোখদুটো ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় লোকটার চেহারাটা অবশ্য দেখার মতো। গায়ের রং টকটকে ফর্সা, লম্বা কোঁকড়া চুল, অসম্ভব বলশালী শরীর। তার চোখের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী, মোটা খয়েরি গোঁফ, মুখে নিষ্ঠুরতার ছাপ স্পষ্ট। সবার অলক্ষ্যে রবিকাকা পিঠে একটা খোঁচা মারতেই অভী বুঝে গেল, এই লোকটার থেকে সাবধানে থাকতে হবে।

লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। রবিকাকা বলল, “বৈদূর্য, এ আমার ভাইপো। স্বর্ণখেচর ধরায় আমার সঙ্গে থাকে। বিশ্বস্ত ছেলে, ভয়ের কিছু নেই।”

বৈদূর্য বলল, “ভয় আমার থাকবে কেন? ভয় তোমার হওয়া উচিত।”

তার চোখে চোখ রেখে রবিকাকা বলল, “এখনও তো হচ্ছে না দেখছি। তোমাদের সঙ্গে আমার শ্রেফ ব্যবসার সম্পর্ক, এটা মনে রেখো বৈদূর্য। আমি

মাল দেব, তোমরা পয়সা দেবে - ব্যস, গল্প শেষ। তার বেশি আমিও এগোই না, তুমিও এগোতে যেয়ো না। সম্পর্ক ভালো থাকবে।”

বৈদূর্য চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, “বড়োকর্তার আদেশ এলে তোমার সঙ্গে আর কোনো লেনদেন থাকবে না। তখন বরং তুমি ভেবো তুমি কী করবে।”

মারীচ ব্যস্ত হয়ে বলল, “আহা, ওসব কথা এখন থাক না। রবি, তুমি পাখি বার করো। বৈদূর্য, টাকাটা নিয়ে এসো।”

বৈদূর্য বলল, “তুমি আমাকে হুকুম দেওয়ার কেউ নও, মারীচ। আর রবি, তোমাকে খোলাখুলিই বলছি, তোমার মতো এত চালাক-চতুর মানুষদের আমি পছন্দ করি না।”

রবিকাকা হাসল। “জানি, জানি, নিজের পিঁপড়ে-বুদ্ধির স্তরের কাউকে না পেলে তোমার কথাবার্তা বলতে সমস্যা হয়। যাকগে, মেলা রাত করে লাভ নেই। কাজের কাজ সেরে ফেলাই ভালো।”

বৈদূর্য কুটিল হাসি হাসল। “রাত বাড়লেই তো আমাদের মজা।”

রবিকাকা বলল, “হ্যাঁ, পাঁচার সঙ্গে ঈগলের ওইখানেই তফাত। যাকগে, এই নাও স্বর্ণখেচর। পালক ছাড়িয়ে ফেরত দাও আমায়।”

তার চোখের ইশারায় অভী খাঁচাটা রাখল টেবিলের ওপর। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় পাখিটা চোখ-মিটমিট করে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল।

একটা থলি বার করে টেবিলের ওপর রাখল বৈদূর্য, কিন্তু দিল না।

“পালক ছাড়াও,” মারীচকে হুকুম দিল সে।

অভী এতক্ষণে খেয়াল করে দেখল বৈদূর্যর পাশে বসা লোকটাকে। আপাদমস্তক ঢেকে বসে আছে সে, একটা কথাও বলছে না। তার চোখদুটো কেবল দেখা যাচ্ছে, আর সেগুলো স্থির হয়ে আছে অভীর মুখের ওপর। সেদিকে তাকিয়ে তার যেন হঠাৎ গা কঁপে উঠল।

মারীচ খাঁচা খুলে সোনার পাখিটাকে বার করে আনল। সে নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ কায়দা জানে, কারণ পাখিটা একটুও ছটফট করল না। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় ঝকঝক করছে তার সারা শরীর।

একটা একটা করে লম্বা লম্বা সোনার পালক ছাড়িয়ে টেবিলের ওপর জড়ো করছিল মারীচ। টাকার থলিটা টেবিলের ওপর দিয়ে ঘষটে ছুড়ে দিল বৈদূর্য রবিকাকার দিকে। “গুনে নাও।”

রবিকাকা থলিটা হাতে নিয়েই চমকে উঠেছিল। “এত ভারী কেন? কত স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছ?”

“দ্বিগুণ।”

জ্র কোঁচকাল সে। “দ্বিগুণ কেন?”

“স্বর্ণখেচর আর ফেরত পাবে না তুমি।”

চট করে উঠে দাঁড়াল রবিকাকা। “এমন কথা তো ছিল না।”

মারীচও চমকে উঠেছিল। সে অনুনয়ের সুরে বলল, “বৈদূর্য, কথা শোনো। অনর্থক ঝামেলা কোরো না।”

তাকে পাত্তা না দিয়ে বৈদূর্য বলল, “আমি যা বলব, সেটাই শেষ কথা। স্বর্ণখেচর আর পাবে না তুমি, রবি।”

অভীর মাথা গরম হতে শুরু করল, আর সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারল, তার হাত ঠান্ডা হতে শুরু করেছে।

রবিকাকা টাকার খলিটা খুলে মুদ্রাগুলো ঢালল টেবিলের ওপর, তারপর গুনে গুনে তুলে নিল কতগুলো মুদ্রা। তারপর শান্তভাবে বলল, “মারীচ, তোমার পালক ছাড়ানো হয়ে গেছে দেখছি। অভীর কাছে খাঁচাটা আছে। ওতে পাখিটাকে ভরে দাও। বাকি টাকা এখানেই রেখে গেলাম।”

মারীচের শাঁখের করাতির অবস্থা। কাতর চোখে সে একবার রবিকাকার দিকে, আর একবার বৈদূর্যর দিকে তাকাল। রবিকাকা বলল, “বৈদূর্য, মনে রেখো, এ পাখির ওপর তোমার কোনো অধিকার নেই।”

রাগে বৈদূর্যর চোখ জ্বলছে, কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। সে বলল, “কেন, স্বর্ণখেচর তোমার সম্পত্তি নাকি?”

“স্বর্ণখেচর কারও সম্পত্তি নয়। আমি ওকে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দেব আবার। ও একটা মুক্ত প্রাণী – ওর স্বাধীনতা কারও ‘সম্পত্তি’ হতে পারে না; তোমারও নয়, আমারও নয়।”

“আমার কথার অবাধ্য হওয়ার ফল জানো?” শরীর টানটান করে উঠে দাঁড়াল বৈদূর্য, কোঁকড়া চুলগুলো নেমে এল চোখের ওপর, কেঁপে উঠল মোটা খয়েরি গোঁফটা, কোমরে ঝোলানো তরবারির হাতলে হাত চলে গেল তার।

“ফালতু তথ্য আমি সাধারণত মনে রাখতে পারি না, বৈদূর্য। তবে তুমি জানো তো আমি কী করতে পারি?”

“জানার খুব ইচ্ছে আমার। আজই দেখা যাক না পরীক্ষা করে।”

মারীচ চেষ্টা করে উঠল, “দোহাই তোমাদের, থামো তোমরা। কে কত বড়ো বীর পরীক্ষা করার যদি ইচ্ছা থাকে, বাইরে গিয়ে মারামারি করো। আমার দোকানে আমি এসব হতে দেব না।”

জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকাল বৈদূর্য। “রাক্ষস জাতের কলঙ্ক তুমি, মারীচ।”

মারীচ মুখ বিকৃত করে বলল, “রাক্ষস জাতের গর্ব তোমার জন্যও এমন কিছু বাড়ছে না, বৈদূর্য। এমনিতেই হাজারো অবিশ্বাস ঘাড়ে করে আমাদের চলতে হয়। তোমার ব্যবহারে লোকে রাক্ষসদের আরও একবার ‘বিশ্বাসঘাতক,’ ‘লোভী’ বলে জানবে।”

বৈদূর্য নিষ্ঠুরভাবে হাসল। “এদেরকে ফিরে যেতে দিলে তবে না জানবে!”

অভীর আশ্চর্য লাগছে, ওই আপাদমস্তক ঢাকা লোকটা কিছু বলছে না কেন! মানুষ, রাক্ষস – কী ও?

রবিকাকার হাতে উঠে এল পাকা বাঁশের লাঠি। তার ইশারায় মারীচ পাখিটাকে খাঁচায় ভরে খাঁচাটা অভীর হাতে তুলে দিল। রবিকাকা বলল, “জঙ্গলের পথ দিয়ে আমরা ফিরছি, বৈদূর্য। ইচ্ছে হলে আসতে পারো। ওখানে আমাদের বাঁচানোর জন্য কেউ থাকবে না; তোমাকে বাঁচানোর জন্যও।”

বৈদূর্য দাঁত বার করল। “অত নিশ্চিন্ত হওয়া ভালো নয়, রবি। তোমার যাত্রা শুভ হোক।”

বাইরে যাওয়ার দরজা পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিতে এল মারীচ; বলল, “এইরকম কয়েকটা জুটেছে এখন। এরা শুধু বোঝে খুনোখুনি আর ভাঙচুর। সাবধানে যেয়ো, রবি। অভী, কাকাকে সামলে রেখো।”

অভী স্নান হাসি হাসল। রবিকাকা বলল, “চললাম, মারীচ। ওপরমহলে বলে দিয়ো, এইরকম লোক পাঠালে আমি কিন্তু আর তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারব না। তখন রাক্ষসরা কোথা থেকে স্বর্ণখেচরের পালক পাবে, এখন থেকে যেন ভেবে রাখে।”

মারীচ বলল, “বলব। এসো তোমরা।”

জঙ্গলের পথ দিয়ে ফিরতি পথে শুরু হল হাঁটা। খাঁচার ভেতর পাখিটা বসে আছে চুপ করে। অভী বলল, “ওরাই রাক্ষস তো?”

“হুঁ।”

“দেখে বোঝার উপায় নেই।”

“বলেছিলাম কিনা।”

“এই পালকগুলো নিয়ে ওরা কী করে?”

“আমি যতদূর জানি, স্বর্ণখেচরের পালকের কিছু ঔষধিগুণ আছে। মানুষদের ওষুধ রাক্ষসদের শরীরে সবসময় কাজ করে না। তাই ওদের ওষুধকে কার্যকর করতে গেলে ওই পালকের সাহায্য লাগে। তবে ইদানীং দেখছি, পালকের চাহিদা খুব বেড়ে গেছে। আর যাই হোক, ওষুধ তৈরিতে এত পালক লাগার কথা নয়। ব্যাটারা বোধহয় নতুন কোনো মতলব ভাঁজছে।”

জঙ্গলের মধ্যে পাতায় খচমচ শব্দ হল। অভীর হাতে চাপ দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল রবিকাকা।

বুকটা ‘ধক্’ করে উঠল অভীর। এ শব্দ যে ভারী কিছু চলার শব্দ, সেও বুঝতে পেরেছে।

খচ্-খচ্-খচ্। পদশব্দগুলো এগিয়ে আসছে। অনেকগুলো ভারী শরীর – নিজেদের অস্তিত্ব লুকানোর কোনো চেষ্টাই আর তারা করছে না।

অন্ধকার গাছের সারির ফাঁক দিয়ে এগিয়ে এল কালো কালো শরীরগুলো। রবিকাকা টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু ততক্ষণে প্রতিপক্ষ জেনে গেছে ওদের অবস্থান।

হাতের লাঠি উঁচিয়ে ধরল রবিকাকা। অভী অবশ্য খুব একটা সাহস পেল না। অতগুলো লোকের বিরুদ্ধে ওই একটা লাঠি আর কতটুকুই বা ভরসা? একটা লোক চেষ্টা করে উঠল, “পাখিটা নিয়ে খতম কর ব্যাটারদের!”

একজন এগিয়ে এল, তার হাতে উদ্যত তরবারি। রবিকাকা বলল, “আমার পেছনে থাক, অভী। ভুলেও এগোবি না।”

হাতের লাঠি বনবন করে ঘুরতে লাগল তার। এতখানি ক্ষিপ্ততার সঙ্গে তাকে নড়াচড়া করতে কখনও দেখেনি অভী। সামনের লোকটার হাত থেকে অস্ত্র উড়ে গেল। পরের আঘাতটা মুহূর্তের মধ্যে এসে পড়ল তার ঘাড়ে। “উঃ” শব্দ করে আক্রমণকারী লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

“আয়, কে আসবি আয়!” – বাঘের মতো হুংকার দিল রবিকাকা।

আরও চারটে লোক ঘিরে ধরল ওদের। জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার – কেবল পাতার ফাঁক দিয়ে তারার আলো আসছে। আকাশে চাঁদ নেই। একটা লোক তেড়ে এল অভীর দিকে, হাতে তার খোলা তলোয়ার।

পলকের মধ্যে তাকে আড়াল করে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল রবিকাকার লাঠি। ফট করে শব্দ হল একটা। একজনের কোনো একটা হাড় তো নিশ্চয়ই ভাঙল।

অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর হঠাৎ শোনা গেল টগবগ করে ঘোড়া ছোটানোর আওয়াজ। কয়েক মুহূর্ত পরেই চারপাশ থেকে আক্রমণকারীদের ভয়ানক কলরোল শোনা যেতে লাগল।

“পালা, পালা!”

“একটা সমরোত্তম আসছে যে!”

“মানে মানে কেটে পড় রে!”

নিমেষের মধ্যে আততায়ী রাক্ষসের দলের কে কোথায় পালাল, তার আর খবর পাওয়া গেল না। অশ্বারোহী এসে দাঁড়াল ওদের সামনে; তার পরনে যোদ্ধার পোশাক, কোমরে তরবারি।

ঘোড়া থেকে নেমে এল সে; বলল, “চিনতে পারছ, রবি?”

রবিকাকা টর্চ জ্বলে আলো ফেলল আগন্তুকের মুখে। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে মানুষ হাত তুলে চোখটা আড়াল করে; এ লোকটা কিন্তু দিব্য তাকিয়ে রইল আলোর দিকে, যেন আলো পেরিয়ে অন্ধকারেও সে বেশ দেখতে পাচ্ছে।

লোকটা লম্বা, কানের ওপর দিয়ে বড়ো বড়ো চুল এসে পড়েছে কাঁধের ওপর; তার ধূসর রঙের চোখে কীসের যেন দুষ্টমি ঝলক দিচ্ছে। ঠোঁটের কোণে লেগে আছে মুচকি হাসি। পরিষ্কার করে কামানো সুশ্রী মুখমণ্ডল। অভীর দিকে তাকিয়ে একগাল হাসল সে, যেন কতদিনের চেনা। অভীও পালটা হাসি হাসল।

রবিকাকা বলল, “চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু ঠিক চিনে উঠতে পারছি না। কে আপনি বলুন তো? আপনাকে দেখে রাক্ষসগুলো পালালই বা কেন?”

রবিকাকা তাকে চিনতে পারল না দেখে লোকটা দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল। “ওঃহো, আমাকে তুমি চিনবে না, আমি আগেই ভেবেছিলাম। আমার নাম মেঘবর্ণ, তবে লোকে আমাকে ‘সমরোত্তম মেঘবর্ণ’ বলে ডাকে।”

রবিকাকা বলল, “বাঃ, চমৎকার তো! ‘সমরোত্তম’ কি আপনার নাম?”

মেঘবর্ণ বলল, “না, ওটাকে আমার উপাধি বলতে পারো। তবে আমি ছাড়াও ওই উপাধিধারী আরও কয়েকজন আছেন।”

অভী বলল, “আপনাকে দেখে ওরা পালাল কেন?”

মেঘবর্ণ বলল, “সমরোত্তমদের চেয়ে বেশি ভয় ওরা আর কাউকে পায় না। পালাবে না?”

রবিকাকা বলে উঠল, “আমরা ওখান থেকে বেরোনোর পর মারীচ আপনাকে খবর দিয়েছে, না?”

“ক্ষুরধার বুদ্ধি, রবি!” মেঘবর্ণ হাসল। “হ্যাঁ, মারীচ জানত, জঙ্গলেই তোমাদের পরপারে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে বৈদূর্য। ওর আদেশমাত্রই রাক্ষসদের একটা দল জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে তোমাদের অপেক্ষা করছিল।

উপায়ান্তর না দেখে মারীচ গোপনে আমাকে খবর পাঠায়। জানাজানি হলে ও বেচারার আর ধড়ে মাথা থাকবে না।”

রবিকাকা বলল, “সাহায্য করতে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু না এলেও চলত। ওই ক’টাকে আমিই সামলে নিতে পারতাম।”

অদ্ভুতভাবে তাকাল মেঘবর্ণ। “আমি জানি। আমাকে ‘তুমি’ই বলো, রবি; ‘আপনি’ নয়।”

“আপনি জানতেন রবিকাকা ওই রাক্ষসগুলোকে একাই সামলাতে পারবে? কী করে জানলেন? আপনি কাকাকে কীভাবে চিনলেন?” অভী প্রশ্ন করল।

মেঘবর্ণ বলল, “বলব অভী, কিন্তু এখন নয়, পরে কোনোদিন। রবি, কাল সকালে একবার তোমার বাড়ি যাব। আমি জানি, তুমি কোথায় থাকো।”

“কিছু দরকার আছে?”

“আছে। অভীর দু’হাতের চিহ্নটা দেখেছ নিশ্চয়ই?”

রবিকাকা হঠাৎ চুপ করে গেল। অভীর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, তার দুটো হাতেরই তালুতে একটা করে নীলচে গোল ছাপ আছে – পয়সার মতো দেখতে অনেকটা। “এগুলো কী?” জানতে চাওয়ায় রবিকাকা বলেছিল, “জন্মদাগ। জড়ল।”

হাতগুলো মেঘবর্ণের সামনে মেলে ধরল অভী; সেই একই প্রশ্ন করল, “এগুলো কী?”

মেঘবর্ণ বলল, “নিয়তিলাঞ্ছন।”

“মানে?”

“মানে, তোমার নিয়তির ডাক। কিন্তু আজ ওকথা থাক। কাল সকালে আমি আসব। তখন বাকি কথা হবে।”

ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সমরোত্তম মেঘবর্ণ। অভী বলল, “কী বলতে চায় এ লোকটা, রবিকাকা?”

রবিকাকা দাঁড়িয়ে ছিল একটা পাথরের মূর্তির মতো। তার কথা শুনে হঠাৎ যেন ঘোর কাটিয়ে বলল, “কী জানি! এখন ফিরি, চল।”

বাকি পথটা আর একটা কথাও হল না। বাড়ি ফিরে অল্প কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। ঘরের এক কোণে রাখা রইল সোনার পাখির খাঁচাটা। বাটিতে করে কিছু খাবার আর জল দিল তাকে অভী।

সে খেয়াল করল, আজ শোয়ার আগে রবিকাকা অন্যবারের মতো স্বর্ণমুদ্রাগুলো গুছিয়ে তুলেও রাখল না।

অনেক রাতে একবার ঘুম ভাঙল অভীর। অন্ধকার ঘরে সে গুনতে পেল, রবিকাকা ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কী যেন বলছে সে? অভী কান খাড়া করে রইল।

“তোকে ছেড়ে থাকতে আমার খুব কষ্ট হবে, অভী।”

খোলা জানালা দিয়ে অন্ধকার মাঠের ঝিরঝিরে আরামদায়ক হাওয়া আসছে। অর্ধেক পৃথিবী ঘুমোচ্ছে নিঃসাড়ে।

সারা রাত অভীর চোখে আর ঘুম এল না।



।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

সমরোস্তম মেঘবর্ণ

সাদা ঘোড়াটাকে মাঠের ওপর দিয়ে আসতে দেখে অভী বলল, “সেই লোকটা আসছে।”

রবিকাকাও এসে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে একবার দেখে নিল তাকে। ধীরেসুস্থে দুলাকি চালে আসছে ঘোড়াটা, তার ওপরে বসে আছে সমরোস্তম মেঘবর্ণ। তার লম্বা চুল উড়ছে সকালের হাওয়ায়।

অভী বলল, “ব্যাপার কী বলো তো? লোকটা কে?”

রবিকাকা গম্ভীরমুখে বলল, “আমিও তো তাই ভাবছি।”

মেঘবর্ণ এসে দাঁড়াল ওদের দরজার সামনে। ঘোড়া থেকে নামল সে। রবিকাকা বেরিয়ে এল দরজা খুলে।

মেঘবর্ণ বলল, “রবি, তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল যে।”

রবিকাকা মাথা নাড়ল। “ভেতরে আসুন।”

অভী বসে ছিল ঘরের মধ্যে। মেঘবর্ণ ঢুকতে উঠে দাঁড়াল সে। ঘরের এক কোণে ঝুলছে স্বর্ণখেচরের খাঁচাটা। সেদিকে তাকিয়ে মেঘবর্ণ একটু হাসল।

অভী বলল, “বসুন।”

মেঘবর্ণ বলল, “তোমাদের দু’জনকেই বলছি, আমাকে ‘তুমি’ই বলো, ‘আপনি’ নয়। রবি, আমাকে চিনতে পারছ না একেবারেই?”

রবিকাকা এসে বসল তার সামনে; বলল, “সত্যি কথাই বলছি। এখন

মনে হচ্ছে তোমাকে আগে যেন কোথায় দেখেছি, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না।”

মেঘবর্ণ তার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে একটু অস্বস্তিভরে রবিকাকা বলল, “আমার এরকম মাঝে মাঝে হয়। অনেক অদ্ভুত ঘটনার দৃশ্য চোখের সামনে ছবির মতো দেখতে পাই, যেসব ঘটনার কথা আমি মনেই করতে পারি না। তোমাকে দেখেও আমার সেইরকম কিছু মনে হচ্ছে।”

“কী মনে হচ্ছে?”

“মনে হচ্ছে যেন আমি কোনো একসময় তোমাকে চিনতাম। কিন্তু এখন আর মনে পড়ছে না।”

একটা দুঃখের হাসি হেসে মেঘবর্ণ বলল, “এমন কষ্টদায়ক সত্যকথা অনেকদিন শুনিনি, বন্ধু। কিন্তু ও প্রসঙ্গ থাক, আজ আমি অভীর জন্য এসেছি।”

অভী চমকে উঠে তাকাল তার দিকে। রবিকাকার চোখে সতর্ক দৃষ্টি। “কী বলতে চাইছ তুমি?”

“কী বলতে চাইছি, তুমি জানো রবি। ওর হাতে নিয়তিলাঞ্ছন আছে। কাল রাতে জঙ্গলে এই কথা উঠতে তুমি চমকে উঠেছিলে, আমার নজর এড়ায়নি। অর্থাৎ, ওই নীলচে গোল চিহ্নগুলোর মানে কী, সেটুকু অন্তত তোমার মনে আছে।”

রবিকাকা চুপ করে আছে দেখে অভী বলল, “এগুলোর মানে কী?” – হাতগুলো সে মেলে ধরল ওদের সামনে; সেগুলোর ওপর নীল রঙের মুদ্রার মতো চিহ্নগুলো যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মেঘবর্ণ বলল, “এগুলোর মানে হল, তোমার এবার নিয়তির ডাকে সাড়া দেওয়ার সময় এসেছে।”

“মানে?”

“মানে তোমাকে নিয়তি বেছে নিয়েছেন তাঁর নির্দিষ্ট কোনো কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য। এই দাগগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মানে এবার তোমার এখান থেকে যাওয়ার সময় হয়েছে।”

রবিকাকার কাল রাতের কান্নাটা মনে পড়ে গেল অভীর। সে বলল, “আমি রবিকাকাকে ছেড়ে মোটেই যাচ্ছি না কোথাও।”

মেঘবর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা; বলল, “রবি, তুমি মানুষটাই এমন যে তোমাকে ভালো না বেসে পারা যায় না। অভীর আর কী দোষ? কিন্তু নিয়তির ডাক যে এড়ানো যায় না। সমরগরিমায় ওকে যেতেই হবে, রবি; তুমি বোঝাও ওকে।”

‘সমরগরিমা’ শব্দটা শুনে রবিকাকা অবাক হয়ে তাকাল মেঘবর্ণের দিকে। সে হেসে বলল, “চেনা লাগল নামটা, তাই না? খুবই স্বাভাবিক।”

রবিকাকা বলল, “হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন একসময় গিয়েছিলাম ওখানে, কিন্তু

আর কিছু মনে করতে পারছি না।”

মেঘবর্ণ বলল, “রাক্ষসদের কথা ভোলেনি নিশ্চয়ই?”

“না। ভুলতে ওরা দিচ্ছে কই? সর্বক্ষণ শয়তানি বুদ্ধি আটছে ব্যাটার।”

“‘শর্বর’ নামটা চেনা চেনা ঠেকছে?”

অভী লক্ষ করল, নামটা শোনামাত্র কেঁপে উঠল রবিকাকা; মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার। সে বলল, “আমি... আমি আমার স্বপ্নে দেখেছি তাকে! কী ভয়ংকর! আমি মাঝে মাঝেই স্বপ্নে দেখি, বিশাল চেহারার ওই রাক্ষসটা দাঁড়িয়ে আছে আগুনের বর্শা নিয়ে, তার চারপাশে জমে উঠেছে মরা মানুষের পাহাড়। সেই মৃতের স্কূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দানবটা হাসছে হা-হা করে। আমার স্বপ্নেই আমি জানি, ওর নাম ‘শর্বর’। এ স্বপ্ন আমি প্রায়ই দেখি আর আমার ঘুম ভেঙে যায় ভোররাতে। কিন্তু আমি স্বপ্নে যাকে দেখি, তুমি তার নাম জানলে কোথা থেকে?”

মেঘবর্ণ ম্লান হাসল। “জানলাম, কারণ তুমি যা দেখো, তা যে শুধু স্বপ্ন নয়, বন্ধু। অনেক কিছু ভুলে গেছ তুমি, তাই অনেকটা শাস্তিতেও আছ। কিন্তু পরিপূর্ণ শাস্তি নিয়তি আমাদের ভাগ্যে লেখেননি। তাই ওই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে তোমার রেহাই নেই। তোমার বামকাঁধের দাগটা কখনও দেখিয়েছ অভীকে?”

অভী বলল, “কী দাগ?”

রবিকাকা নিঃশব্দে জামাটা খুলে ফেলল। অভী দেখল, কাকার কাঁধেও একটা নীলচে জড়ুল- তার হাতের তালুতে যেমন আছে, ঠিক সেইরকম।

আগেও অনেকবার দেখেছে সে দাগটা, কিন্তু ওটার যে বিশেষ কোনো মানে থাকতে পারে, সে-কথা কখনও মনে হয়নি।

এবার মেঘবর্ণ হাত বাড়াল। তার ডানহাতের কবজির ওপর ঠিক একই চিহ্ন! অভী হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

মেঘবর্ণ বলল, “আমাদের যখন নিয়তির ডাক এসেছিল, তখন আমরাও সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, অভী – তোমার রবিকাকা, আমি, আরও অনেকে। আমরাও গিয়েছিলাম সমরগরিমায়। আজ তোমার কাকার সেসব কথা পুরোপুরি মনে নেই – তার যুক্তিসংগত কারণও আছে। কিন্তু এইটুকু তার অবশ্যই মনে আছে, নিয়তিলাঞ্ছন যার হাতে থাকে, তাকে আটকে রাখা যায় না। আমি ঠিক বলছি তো, রবি?”

রবিকাকা ওপর-নীচে মাথা নাড়ল।

মেঘবর্ণ আবার বলল, “শর্বরকে যে তুমি স্বপ্নে দেখেছ, তার সঙ্গেও সমরগরিমার যোগ আছে, রবি। তুমি তো স্বর্ণখেচরের পালকের ব্যবসা করো। ইদানীং ওই পালকের চাহিদা রাক্ষসদের মধ্যে খুব বেড়ে গেছে, খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই?”

রবিকাকা অবাক হয়ে বলল, “এটা তো একদম ঠিক বলেছ! এইসব

ব্যাপারের ওপরেও তুমি নজরদারি চালাও নাকি?”

“চালাতেই হয়। রাক্ষসদের ব্যাপারে সতর্ক না থাকলে চলে না। চারদিকের অবস্থা ভালো নয়। রাক্ষসরা কেন এত পালক কিনছে জানো? শুধু ওষুধ তৈরির জন্য নয় অবশ্যই।”

“তাহলে?”

“স্বর্ণখেচরের পালক লাগানো তীর নিশানায় অভ্রান্ত হয়। বহুদূর থেকে ছুঁড়লেও নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তু বিদ্ধ করতে পারে।”

“তার মানে...”

“তার মানে যা ভাবছ, ঠিক তাই। তলে তলে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। এই অবস্থায় অভীর হাতে নিয়তিলাঞ্ছন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানেটা বুঝতে পারছ তো?”

রবিকাকা একবার জড়িয়ে ধরল অভীকে। চোখে তার জল নেই, কিন্তু মুখ শুকনো। “আমি জানতাম তোকে বেশিদিন আমার কাছে রাখতে পারব না।”

অভীর চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে। “আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, রবিকাকা।”

রবিকাকা তাকে ছেড়ে দিল, মেঘবর্ণ হাত রাখল তার কাঁধে। অভী বুঝতে পারছে, যেতে তাকে হবেই।

রবিকাকা বলল, “যা তুই। কাজ শেষ হলে আবার আসবি আমার কাছে।”

মেঘবর্ণ বলল, “হ্যাঁ, নিয়তির ডাক উপেক্ষা করলে ফল ভালো হয় না। অভী, তৈরি হয়ে নাও। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।”

ঘরের বাইরে তার ঘোড়াটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে গিয়ে মেঘবর্ণ হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার গায়ে, মাথায়। রবিকাকা বলল, “অভী, তোকে তো আগেও বলেছি, পুরোনো কথা আমার সব মনে পড়ে না। কিন্তু এইটুকু আমি বলতেই পারি, মেঘবর্ণ লোক খারাপ নয়। আমি বোধহয় ওকে একসময় ভালো করেই চিনতাম, কিন্তু মাথাটায় যে কী হয়েছে, সব কিছু মনে করতেই পারি না।”

অভী বলল, “তুমি সাবধানে থেকো। আমি ফিরে আসি, তারপর দু’জনে মিলে আবার স্বর্ণখেচর ধরতে যাব।”

রবিকাকা হাসল। “হ্যাঁ। আপাতত এটাকে আজ দুপুরে ছেড়ে দিয়ে আসব বৈকালির জঙ্গলে।”

অল্প কিছু খেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল অভী। ওদের আসতে দেখে মেঘবর্ণ বলল, “তৈরি?”

“হ্যাঁ।”

“তাহলে এসো, উঠে পড়ো আমার ঘোড়ায়।”

“সমরগরিমা কত দূর এখান থেকে? ঘোড়ার পিঠে যেতে কতক্ষণ লাগে?”

মেঘবর্ণ রহস্যময় হাসি হাসল। “পুরো পথ আমরা ঘোড়ায় যাব না। অন্য

ব্যবস্থা আছে।”

“কী ব্যবস্থা?”

“হঁ হঁ, চলো না। দেখতেই পাবে।”

মেঘবর্ণের পেছনে উঠে পড়ল অভী। ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস তার নেই; বুকের ভেতর একটু ধুকপুক করতে লাগল।

চলতে শুরু করল ঘোড়া। মেঘবর্ণ পেছন ফিরে হাত নাড়ল। “চললাম, বন্ধু। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।”

অভীও তাকাল মাথা ফিরিয়ে। রবিকাকা দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো। চোখদুটো কি ছলছল করছে একটু? বুঝতে পারার আগেই ছুটতে শুরু করল ঘোড়া।

রণিতের দলবল আজও বসেছিল বুড়ো বটের তলায়। এইরকম এক যোদ্ধার পোশাক পরা লোকের সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চেপে তাকে যেতে দেখে ওরা হাঁ করে চেয়ে রইল।

ঘোড়া এসে ঢুকল বৈকালির জঙ্গলে। অভী বলল, “এই জঙ্গলের পথ দিয়ে আমরা যাব?”

“না, আমরা যাব আকাশপথে।”

মুচকি হাসল অভী। “এ পক্ষীরাজ ঘোড়া নাকি?”

মেঘবর্ণও হাসল। “পক্ষীরাজ ঘোড়া বলে কিছু হয় না। আমাদের ওড়ার বাহন অন্য। ...ওই যে, একজন আসছে দেখতে পাচ্ছ?”

গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে, দেখতে পেল অভী। ওরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আর একটু কাছে আসার পর লোকটাকে চিনতে পারল অভী। মারীচ!

মেঘবর্ণ বলল, “মারীচ রান্ধস বটে, তবে আমার বিশ্বস্ত। ঘোড়াটাকে আপাতত ওর হাতেই দিয়ে যেতে হবে। আকাশপথে ছাড়া সমরগরিমায় ঢুকতেই পারব না আমরা।”

আকাশপথের ব্যাপারটা শোনার পর থেকেই অভীর মনটা উত্তেজনায় ছটফট করছে। তাও সে ধৈর্য ধরে রইল।

মারীচের হাতে একটা থলি। যেভাবে তার হাঁটার সঙ্গে জিনিসটা দুলছে, তাতে বোঝা যায়, ওর মধ্যে ভারী কোনো বস্তু আছে।

সেদিকে জ্র কুঁচকে তাকিয়ে রইল মেঘবর্ণ; স্বগতোক্তির মতো বলল, “মারীচের তো কিছু সঙ্গে আনার কথা নয়!”

ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল ওরা দু'জন। মারীচ এসে থলিটা নামিয়ে রাখল ওদের সামনে।

মেঘবর্ণ বলল, “ঘোড়া ধরো, মারীচ। এ বস্তুটি কী এনেছ?”

অভী উঁকি মেরে দেখছিল থলির ভেতর। মনে হচ্ছে, ভেতরে কাঠের বাক্সজাতীয় কিছু একটা আছে।

মারীচ বলল, “সমরোত্তম মেঘবর্ণ, এটা আজ আমার দোকানের সামনে কেউ রেখে গেছে। সকালে দোকান খুলেই দেখি, এটা পড়ে আছে। তার সঙ্গে ছিল এই চিঠিটা।”

গোটা গোটা অক্ষরে তিনটে শব্দ লেখা আছে মারীচের বাড়িয়ে দেওয়া কাগজটায়। “মেঘবর্ণের জন্য উপহার।”

অভী বলে উঠল, “কাঠের বাক্সে আম-কাঁঠাল নাকি? মাছি ঘুরছে দেখছি এর চারপাশে।”

মেঘবর্ণের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। সে বলল, “পেছনে সরে যাও, অভী। সময় ভালো যাচ্ছে না এখন। সাবধান হওয়াই ভালো।”

কোমরের তলোয়ার খুলে এনে বাক্সের কানায় ঢুকিয়ে চাপ দিতেই ডালাটা খুলে গেল। ভেতরে রাখা কাটা মাথাটা দেখেই গা গুলিয়ে উঠল অভীর।

মারীচ হাঁ করে তাকিয়ে আছে মাথাটার দিকে। তারপর সে তাকাল অভীর দিকে।

অভীও চিনতে পেরেছে লোকটাকে। সে ফিশফিশ করে বলল, “বৈদূর্য!”

মেঘবর্ণ বলল, “ব্যাপার কী, মারীচ?”

মারীচ শুকনো মুখে বলল, “বুঝতে পারছি না। কাল এ ব্যাটাই রবি আর অভীকে মারতে লোক পাঠিয়েছিল। আমি অনেক বারণ করেছিলাম; শোনেনি। বোধহয় ওপরমহল অসন্তুষ্ট হয়েছে। তাই এই শাস্তি।”

মেঘবর্ণ বলল, “কিন্তু তোমার দোকানে আমার জন্য এই উপহার রেখে যাওয়ার মানেটা বুঝতে পারছ তো?”

মারীচের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। “পারছি। কেউ জেনে গেছে, আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে।”

মেঘবর্ণ বলল, “কানাঘুসো চলছে শর্বরকে নাকি তার বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে মাল্যপর্বতের রাক্ষসরা দল পাকাচ্ছে। তেমনটা যদি হয়, তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে রেখো। ওরা স্বর্ণখেচরের পালকের প্রচুর তির বানাচ্ছে, খবরটা সত্যি তো?”

“একদম সত্যি। এই বৈদূর্যই ফলাও করে বলেছে আমাকে কতবার! সমরোত্তম মেঘবর্ণ, আমি শুধু ভাবছি, বৈদূর্য তো নিজে ভয়ংকর যোদ্ধা ছিল। তার মতো রাক্ষসকে যে এভাবে মেরেছে, সে তাহলে কত ভয়ংকর! আপনি ঠিকই বলেছেন। সময়টা ভালো যাচ্ছে না।”

অভী চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না ছিন্নমুণ্ডটার দিকে। সে কোনোক্রমে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, “রবিকাকাও তো স্বর্ণখেচরের পালকের ব্যবসা করে। তার কোনো বিপদ হবে না তো?”

মেঘবর্ণ একটু হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, “তোমার রবিকাকা অন্যদের রক্ষা করে। ওকে বিপদে ফেলবে, এমন বীরপুরুষ পৃথিবীতে বেশি জন্মায়নি।”

হঠাৎ একটা কথা মনে হতে অতী বলল, “আচ্ছা মারীচ, কাল বৈদূর্যর পাশে মুখ ঢেকে যে লোকটা বসে ছিল, ও কে? ও-ই মারেনি তো একে?”

মারীচ বলল, “ও যে কে, আমিও জানি না, অতী। বৈদূর্যর সঙ্গেই ও এসেছিল, তার সঙ্গেই ও চলে গেছে তোমরা বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরে। আশ্চর্য ব্যাপার হল, লোকটা একটা কথাও বলেনি কারও সঙ্গে। বোবা কিনা কে জানে! ও মানুষ, না রাক্ষস – তাও বুঝতে পারিনি।”

অতীর মনে পড়ে গেল কাল রাতে বৈদূর্যর পাশে বসে কেমন স্থিরচোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল লোকটা। ভাবতেই এই সকালের আলোতেও তার গা শিউরে উঠল। সে দেখল, কাটা মাথার গায়ে জমে থাকা রক্তের ওপরে মাছি উড়ছে।

মেঘবর্ণ বলল, “এবার এই উপহারটিকে নিয়ে কী করা যায়?”

মারীচ বলল, “পুঁতে ফেলা ছাড়া উপায় নেই।”

জঙ্গলের মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে মাথাটা রেখে আবার মাটিচাপা দিয়ে দিল ওরা। অতী ভাবছিল, কাল রাতেই এই বৈদূর্য কত শাসানি দিচ্ছিল তাদের, আর আজ...!

কে মারল ওকে? মারীচের কাছে ‘উপহার’টা পৌঁছে দিয়ে গেলই বা কে? বন্ধু, না শত্রু?

সকালের জঙ্গলে পাখি ডাকছে, কিন্তু অতীর যেন চোখ টেনে নিচ্ছে ওই সদ্য চাপা দেওয়া গর্তের খয়েরি রঙের মাটি। ওর ভেতরে যে জিনিসটা চাপা দেওয়া আছে, সেটার কথা মনে পড়তেই আবার বমি পেল তার।

মেঘবর্ণ বলল, “আমাদের এবার যেতে হবে, মারীচ। সাবধানে থেকো।”

মারীচ বলল, “সাবধানে থাকতেই হবে আমাদের, সমরোস্তম মেঘবর্ণ। বৈদূর্যর মতো উগ্র লোকের তো অভাব নেই আমাদের মধ্যে। একবার যদি কেউ জানতে পারে আমি আপনাকে দু’চারটে কথা বলেছি, তাহলে নিজের জাতের লোকেরাই আমার গলা কাটতে দু’বার ভাববে না।”

মারীচের মুখে এমন একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে, যেটা দেখে অতীর নিজেরই খারাপ লাগল। মারীচ আবার বলল, “একটা অনুরোধ করব আপনাকে?”

মেঘবর্ণ তাকাল ওর দিকে – তার মুখে দৃষ্টিভ্রম। সে বলল, “বলো।”

মারীচ বলল, “খুব শক্তিশালী কেউ জেনে গেছে আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, এ তো বুঝতেই পারছেন। বৈদূর্যকে মেরে মাথা কেটে ফেলা তো আর সাধারণ লোকের কর্ম নয় – মাল্যপর্বতের বড়োকর্তাদের সঙ্গে ওঠাবসা ছিল ওর। তাই বলছি, আমার যদি ভালোমন্দ কিছু হয়ে যায়...”

থেমে গেল সে মাঝপথে। মেঘবর্ণ তাকিয়ে রইল।

মারীচ বলল, “তাহলে বউটাকে আর বাচ্চাদুটোকে একটু দেখবেন।”

মেঘবর্ণ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, “তাহলে তোমারও

ধারণা, শর্বরকে মুক্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে? এছাড়া তোমার এত ভয়ের তো কোনো কারণ দেখি না।”

মারীচ বলল, “শর্বর মুক্তি পেলে শুধু মানুষদের সর্বনাশ হবে, তা কিন্তু নয়। আমাদের মতো রাক্ষস, যারা শান্তি চায়, তাদেরকেও কচুকাটা করা হবে, আমি জানি। আর সে কাজ করবে আমাদের নিজেদের লোকেরাই। একটা নাম কানে আসছে মাঝেমধ্যে, দেখবেন যদি কোনো খবর পান। ‘উর্গায়ু’। একে এখন শর্বরের চেয়েও বেশি ভয় করে আমার।”

“এটি আবার কে?”

“শর্বর তো বন্দি। সে যতবড়ো শয়তানই হোক, এই অবস্থায় রাক্ষসদের তাতানোর কাজটা তো আর সে করছে না। এই উর্গায়ু করছে সেই বারুদের পাহাড় জমানোর কাজ, যাতে শর্বর যদি একবার ছাড়া পায়, তাহলে যেন সমরগরিমা আত্মরক্ষার কোনো সুযোগ না পায়।”

“দেখতে কেমন রাক্ষসটা? সে আদৌ রাক্ষস তো?”

“আমি জানি না। কেউই জানে না। সে যে কেমন দেখতে, তাও জানে না কেউ। এইটুকু শুধু জানি, শর্বরের ডানহাত সে। কিন্তু তার কাজকারবার সব চলে ভীষণ গোপনে। কেউ জানে না, তার কোন্ কাজের পেছনে কী উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে। আমি আপনাকে বলে রাখছি, সমরোত্তম মেঘবর্ণ, শর্বর ভয়ংকর হতে পারে, কিন্তু এই উর্গায়ু ভীষণ রহস্যময়, আর সেইজন্যই তাকে আমার আরও ভয়ংকর মনে হয়।”

অভীর হঠাৎ মনে হল, কাল রাতে বৈদূর্যর পাশে মুখ ঢেকে বসে থাকা লোকটাই সেই উর্গায়ু নয় তো? ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল তার। এত সামনে থেকে...!

মারীচের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় মেঘবর্ণ বলল, “এইটুকু তোমাকে শুধু ভরসা দিতে পারি মারীচ, আমি যতদিন বেঁচে আছি, তোমার পরিবারের ওপর কোনো আঁচ আমি আসতে দেব না।”

ঘোড়া ছুটিয়ে মারীচ চলে যাওয়ার পর অভী বলল, “এবার আমরা যাব কী করে?”

মেঘবর্ণ হাসল। “কেন? উড়ে।”

অভী দেখল, হাতে একটা ধূসর রঙের শাঁখ ধরে আছে মেঘবর্ণ। “সমরগরিমায় এদের আমরা বলি ‘জটায়ুবাহিনী’। ভয় পেয়ো না যেন। চেহারাটা খুব একটা সুশ্রী না হলেও এদের স্বভাবটি বেশ শান্ত।”

শাঁখটা মুখে লাগিয়ে বাজাল সে; তীক্ষ্ণ, জান্তব চিৎকারের মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এল।

“আসছে সে। চোখ রাখো আকাশে।”

মুখ তুলল অভী। গাছের পাতাভরা ডালগুলো ঢেকে রেখেছে আকাশের বেশিরভাগ; তবু ওর-ই মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে টুকরো টুকরো নীল। মেঘবর্ণ

বলল, “উড়তে ভয় করবে না তো তোমার?”

“জানি না।”

ডানা ঝটপটের শব্দ পাওয়া গেল একটু পরেই। অবাক বিস্ময়ে নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইল অভী। জটায়ুবাহিনীর এই জীবটি যাই হোক না কেন, আকারে যে বিরাট তা বোঝা যাচ্ছে তার ডানার আওয়াজ শুনেই।

আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে সঞ্চরমান আকৃতিটা। সূর্য আছে ঠিক তার পেছনেই, তাই কালো ছায়ার মতো লাগছে বিরাটকায় পাখিটাকে। ওদের মাথার ওপরে আকাশে ধীরে ধীরে বড়ো হচ্ছে সে; নেমে আসছে মাটির দিকে।

তার বিশাল ডানার ঝাপটে দুলছে গাছের মাথা; ডালগুলো থেকে হাওয়ার ধাক্কায় ঝরে পড়া পাতাগুলো এসে পড়ছে ওদের মাথায়। ধুলো উড়ছে, পাখিটা নামছে।

“কঁ-অ-অ” শব্দ করে নেমে এসে সে বসল ওদের সামনে। অভী বুঝতে পারল, এটা একটা দানবাকৃতির শকুন – সাধারণ শকুনের প্রায় সাত-আট গুণ হবে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পাখিটা দেখছে তাকে। মেঘবর্ণ এগিয়ে এসে হাত বুলিয়ে দিল মাথায়; আদরের সুরে বলল, “আহুদি, একে চিনে রাখ। এ আমার বন্ধু – অভী।”

আহুদি! এই বিকটদর্শন দানব শকুনটার নাম আহুদি! অভী ঢোক গিলল।

আহুদি তখন ঘাড় বাঁকিয়ে তীক্ষ্ণচোখে দেখে নিচ্ছে তাকে। অভী ভাবল, “এটার পিঠে চেপে উড়তে হবে আমাদের! সর্বনাশ!”

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মেঘবর্ণ, আঙুল চালিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে দিচ্ছে ডানার পালকে, আর চোখ বন্ধ করে দিব্যি আদর খাচ্ছে আহুদি। শকুনটার মুখের গদগদভাব দেখে হাসি পেল অভীর।

তারপর আহুদি ঝুঁকে পড়ল ওদের সামনে, আর চট করে তার পিঠে উঠে পড়ল মেঘবর্ণ। অভী ইতস্তত করছিল; কীভাবে উঠবে বুঝতে পারছিল না।

মেঘবর্ণ বসেছে দিব্যি দু’দিকে পা বুলিয়ে। হাত বাড়িয়ে দিল সে। “কোনো ভয় নেই, অভী। উঠে পড়ো।”

তার হাত ধরে অভী বসল পাখিটার পিঠে। আহুদি মৃদু ‘ক্যাঁক ক্যাঁক’ শব্দ করে জানিয়ে দিল, সওয়ারিকে তার পছন্দ হয়েছে।

মেঘবর্ণ বলল, “ভয়ের কিছু নেই। আমরা অনেক উঁচুতে উঠব, কিন্তু পড়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। জটায়ুবাহিনীর এই বাহকরা তোমার ওই স্বর্ণখেচরের মতোই মায়াজগতের জীব। এরা যাত্রীকে আটকে রাখে নিজেদের পিঠের সঙ্গে – পড়তে দেয় না। তাই যত ওপরেই আমরা উঠি না কেন, ভয় পেয়ো না। তবে চাইলে আমাকে পেছন থেকে ধরে রাখতে পারো।”

মাটি থেকে শূন্যে উঠে পড়ল আহুদি। অভীর মুখে লাগছে জংলা গাছের পাতা; এত উঁচুতে সে কোনোদিন ওঠেনি। গাছের মাথা ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে

উঠছে ওরা; নীচে রয়ে যাচ্ছে বৈকালির জঙ্গল, মাঠ, বাড়িগুলো। পাখিরা তাহলে এইভাবে দেখতে পায় পায়ের নিচের পৃথিবীকে?

ওই যে, ওই তাদের বাড়িটা। রবিকাকা হয়তো এখনও মনখারাপ করে বসে আছে ওর মধ্যে। ওই মাঠের বুড়ো বটতলায় হয়তো রণিতের দলটা এখনও বসে বসে আড্ডা দিচ্ছে – বটগাছের ছড়ানো ডালের তলায় ওদের দেখা যাচ্ছে না এই ওপর থেকে। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে নদীটা – লম্বা একটা ঝলমলে ফিতের মতো সে বয়ে যাচ্ছে পূর্বদিক থেকে। ছোটো হয়ে আসছে বাড়িঘরগুলো; এমন সব জায়গা দেখা যাচ্ছে, যেগুলো সে আগে কখনও দেখেনি। এত উঁচু, মাথা ঘুরছে। মেঘবর্ণের কোমরটা জড়িয়ে ধরল অভী।

“কোনো ভয় নেই,” আশ্বাস দিল মেঘবর্ণ।

দ্রুতগতিতে ডানা ঝাপটে উড়ে চলল আত্মাদি। অভীর মুখে এসে লাগছে দুরন্ত হাওয়া; চোখের পাতা শিরশির করছে, চুলের ফাঁক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শব্দশব্দে বাতাস। আর ভয় করছে না, মজা লাগছে। এই বিশাল শূন্যতা, এই নীল আকাশ, সাদা মেঘের রাশি – আঃ! জীবনে যেন এই ওড়ার আনন্দ না পেলে কিছু পাওয়াই হত না।

মুখ ফিরিয়ে চোঁচিয়ে মেঘবর্ণ বলল, “কী অভী, মজা লাগছে?”

বাতাস আর ডানার শব্দে তার কথাগুলো যেন কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। অভী চিৎকার করে বলল, “দারুণ মজা!”

তারপর হঠাৎ করেই চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। যেন সূর্যটা হঠাৎ নিভে গেল। হাওয়াও আর লাগছে না সেইভাবে। চারপাশটা কেমন নিঃশব্দ হয়ে গেল। অভী ভয় পেয়ে বলে উঠল, “মেঘবর্ণ! এ কী হচ্ছে?”

আত্মাদি উড়ে চলেছে অন্ধকারের মধ্য দিয়েই। কীভাবে যে সে পথ চিনে উড়ছে, সে-ই জানে। মেঘবর্ণ বলল, “সমরগরিমার সুড়ঙ্গে ঢুকেছি আমরা। এইরকম বেশ কয়েকটা শূন্যপথের সুড়ঙ্গ আছে তোমাদের দেশের সঙ্গে সমরগরিমার। আর দেরি নেই, এইবার পৌঁছে যাব আমরা।”

কয়েক মিনিট পরেই আবার চোখের সামনে দপ্ করে যেন জ্বলে উঠল আলো। কিছুক্ষণের জন্য যেন চোখ ধাঁধিয়ে গেল অভীর সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থেকে দিনের আলোর মাঝখানে এসে। সে দেখল, তাদের অনেক নীচে বিরাট পর্বতশ্রেণি; তাদের খাড়াই চূড়া আর গভীর খাদ দেখে কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল তার।

মেঘবর্ণ বলল, “মাল্যপর্বতের বাসযোগ্য অঞ্চল এটা। বহু রাক্ষস থাকে এখানে। ওরা আমাদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলে, আমরাও তাই করি। আর এই পর্বতশ্রেণীর একটা প্রায় অগম্য জায়গা আছে; সেখানে...” – বলতে বলতে থেমে গেল সে।

অভী বলল, “সেখানে? কী আছে সেখানে?”

“কিছু না। পরে হবে ওসব কথা। এই দেখো, নীচে এবার নদী দেখা

যাচ্ছে।”

অভী দেখল, বাস্তবিকই তাদের নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী - কী ভীষণ স্রোত তার! আরও আশ্চর্য, এ নদীর জলের রং হলদেটে-সোনালি। এরকম নদী সে আগে কখনও দেখেনি। মাল্যপর্বতের পাদদেশ থেকে বয়ে চলার নদীর খরস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একবার যেন মাথাটা ঘুরে উঠল তার।

“এর নাম ‘মৃত দেবতার নদী’,” বলল মেঘবর্ণ।

“এরকম অদ্ভুত নাম কেন?”

“অনেক গল্প আছে, পরে শুনবে। আপাতত এইটুকু তোমার জেনে রাখা দরকার, এই নদীর জল কখনও খাওয়া তো দূরের কথা, ছোঁবে না পর্যন্ত। ছুঁলে সারা গায়ে ফোসকা পড়ে যাবে, গা পুড়ে যাবে। আর, খেলে তোমাকে বাঁচাতে পারে, এতবড়ো বৈদ্য এখনও জন্মায়নি।”

সোনালি নদী পেরিয়ে গভীর বনের ওপর দিয়ে উড়ে চলল ওরা। মেঘবর্ণ বলল, “এই বনের এ প্রান্ত থেকেই সমরগরিমা শুরু। আর তার ঠিক মাঝখানে আছে আমাদের আয়তন।”

“আয়তন?”

“যেখানে আমাদের অপেক্ষায় আছেন সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর এবং আরও অনেকে। যেখানে তোমার মতো নিয়তিলাঞ্ছিত ছেলেমেয়েদের অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হয়। যেখানে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত দিব্য অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার। এবং যেখানে শেখানো হয়, একজন যোদ্ধার সবচেয়ে দামি সম্পদ তার প্রাণ নয়, তার ‘সমরগরিমা’ - যোদ্ধা হিসেবে তার অহংকার।”

কিছুই বুঝতে না পেরে অভী হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আহুদি বনের উঁচু উঁচু গাছ পেরিয়ে এসে নামল একটা ফাঁকা মাঠে।

“নেমে পড়ো এবার।”

শকুনটার মাথায় আবার হাত বুলিয়ে আদর করে দিল মেঘবর্ণ। “ধন্যবাদ, বন্ধু। এবার তুমি ফিরে যাও।”

বনের ওপর ডানা মেলে উড়ে গেল আহুদি। বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামছে তখন। অভী দেখল, আহুদির ডানার পালকে চকচক করে উঠল সূর্যাস্তের লাল আলো।

মাঠের মাঝখানে ছাউনি দেওয়া বিরাট প্রাঙ্গণ। মেঘবর্ণ বলল, “এইসব জায়গায় নতুন যোদ্ধাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, অস্ত্রবিদ্যা অনুশীলন করা হয়।”

চারপাশ দেখতে দেখতে চলেছিল অভী। কী এক বিচিত্র জায়গায় এসে পড়েছে সে! এইটুকু খালি তার মাথায় ঢুকেছে, এই ছোট্টো জনপদটার নাম ‘সমরগরিমা’, আর তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে বা আয়তনে, যেখানে তাকে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি করা হবে।

কিন্তু কেন?

একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল সে। মেঘবর্ণ ডেকে বলল, “অভী, সামনে দেখো।”

সমরগরিমা আয়তনের সামনে এসে পড়েছে ওরা। সেই সুবিশাল অটালিকা দেখে অভী বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

মাথার ওপরে উড়ছে বাদুড়জাতীয় কয়েকটা প্রাণী। অভীর সেদিকে খেয়াল নেই। সে হাঁ করে শুধু তাকিয়ে আছে এই বিরাট প্রাসাদের দিকে।

সিংহদরজা বস্তুটাই সে দেখেনি কখনও আগে। এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মশাল জ্বলছে দরজার সামনে। সিংহদুটোর চোখ যেন জ্বলছে সেই আলোতে।

পুরোটাই পাথর দিয়ে তৈরি সমরগরিমা আয়তন। কয়েক মানুষ উঁচু প্রাকারের ওপর জানালা দেওয়া ছোটো ঘরের মতো করা আছে। ওখানে প্রহরী থাকে। পাথরের দেয়ালে ছোটো ছোটো চৌকোনা খুপরি কাটা আছে। মেঘবর্ণ বলল, শত্রুর আক্রমণ হলে ওগুলোর মধ্য দিয়ে তির ছোড়া হবে।

সিংহদরজা পেরিয়ে বিরাট বড়ো অঙ্গন। মেঝেতে বসানো আছে বড়ো বড়ো বর্গাকার মসৃণ পাথর। অঙ্গন পেরিয়ে শুরু হচ্ছে সিঁড়ির ধাপ। তারপর মূল অটালিকার প্রবেশদ্বার।

দ্বারের সামনেই মশাল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল একজন লোক। ওদের আসতে দেখে এগিয়ে এল সে। “সমরোত্তম মেঘবর্ণ?”

মেঘবর্ণ বলল, “আরে, শ্রীমান নারদ যে! মুখ শুকনো কেন?”

অভীর দিকে ফিরে সে পরিচয় করিয়ে দিল। “ইনি আমাদের সমরগরিমার সহকারী নিয়ামক। সরকারি লোক, বুঝতেই পারছ। ...আর এই ছেলেটি অভী। নতুন শিক্ষানবিশ যোদ্ধা; সদ্য নিয়তিলাঞ্ছন স্পষ্ট হয়েছে। একে আনতেই বাইরে গিয়েছিলাম।”

সহকারী নিয়ামক নারদ তার দিকে ফিরে নমস্কার করলেন হাতজোড় করে। অভী একটু অবাক হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু প্রতিনমস্কার করতে তার ভুল হল না।

নারদ বললেন, “অধিনায়ক বজ্রধর অনেকক্ষণ খুঁজছেন আপনাকে। আমাকে বললেন এখানে থাকতে, আপনাকে দেখতে পেলেই যেন সম্মেলন কক্ষে যেতে বলতে পারি। সমরোত্তম শ্যামশ্রী, যোদ্ধানায়কেরা সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। জরুরি ব্যাপার।”

মেঘবর্ণ বলল, “ব্যাপারটা কী বলুন তো, নারদ? এই অসময়ে সম্মেলন কক্ষে সবাই এসে জুটলেন কেন?”

মশালের আলোয় অভী দেখল, সহকারী নিয়ামকের ঠোঁট কাঁপছে। তিনি ফিশফিশ করে উচ্চারণ করলেন, “শর্বর!”

মেঘবর্ণ মাথা নাড়ল। “সেইরকমটাই ভেবেছিলাম। খুবই খারাপ খবর তাহলে।”

নারদ শুকনো মুখে বললেন, “খুবই খারাপ খবর।”



।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

সমরগরিমা

সমরগরিমা আয়তনকে বাইরে থেকে যতটা বড়ো মনে হয়, ভেতরটা আসলে তার চেয়েও অনেক বড়ো। এতগুলো কক্ষ, এত আঁকারাকা পথ, এত দরজা - অতীত যেন মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক দেয়ালে আটকানো আছে মশাল; তার আলোয় গলিপথগুলো দেখা যায় বটে, কিন্তু গা-ছমছমও করে। মেঘবর্ণ আর নারদের পেছনে পেছনে চলতে চলতে অতী দেখছিল, দেয়ালের গায়ে তাদের অসমান ছায়াগুলো কেমন নড়ছে। এক জায়গায় একটা জানালার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে দেখতে পেল, কয়েকজন প্রহরী খোলা তলোয়ার হাতে পাহারা দিচ্ছে বাইরের অঙ্গনে।

নিরেট পাথরের তৈরি দেয়াল, তার গায়ে লাগানো আছে সমরগরিমা আয়তনের চিহ্ন - একটা সোজা তলোয়ার, তার হাতলের জায়গায় জ্বলন্ত সূর্য। মেঘবর্ণ বলে দিল, “ওই সূর্য হচ্ছে যোদ্ধার প্রাণ, আর ওই তলোয়ার তার গরিমা। এই চিহ্নের মানে, এক যোদ্ধার কাছে তার যোদ্ধা হিসেবে গরিমার চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই। এই আয়তনের আত্মা বলতে পারো এই বিশ্বাসকে।”

সহকারী নিয়ামক নারদ বললেন, “এই যে আমরা এসে গেছি।”

ওরা এসে দাঁড়িয়েছিল একটা বন্ধ দরজার সামনে। ভারী কাঠের দরজা, তার ওপর সোনালি ধাতব পাতে তৈরি সমরগরিমা আয়তনের প্রতীক তরবারি আর সূর্য আটকানো আছে। ভেতর থেকে কোনো শব্দ আসছে না। অতী বুঝল, এটাই সম্মেলন কক্ষ।

নারদ দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে ঘোষণা করলেন, “সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর, সমরোত্তম মেঘবর্ণ উপস্থিত হয়েছেন।”

একটা গম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশ এল, “ভেতরে আসুন আপনারা।”

নারদ তাকালেন মেঘবর্ণের দিকে। সে বলল, “আপনি আগে ঢুকুন, তারপর আমি যাচ্ছি। ...অভী, আপাতত মুখ বন্ধ রেখো। অধিনায়ক বজ্রধর তোমার সামনে এই আলোচনা করতে নাও রাজি হতে পারেন।”

অভী বলল, “তাহলে আমি কী করব?”

মেঘবর্ণ হাসল। “আমার ওপর ছেড়ে দাও ব্যাপারটা। চলো, এবার যাওয়া যাক। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন ওঁরা।”

নারদ দরজা খুলে ঢুকলেন কক্ষের মধ্যে, তাঁর পেছনে মেঘবর্ণের সঙ্গে অভী।

কক্ষের ভেতরটা যে এত বড়ো, অভী বাইরে থেকে বুঝতেই পারেনি। দরজার পাশেই দেয়ালের গায়ে রাখা আছে সাতটি উঁচু কাষ্ঠাসন – যদিও বর্তমানে মাত্র দু’টিতে বসে আছেন দু’জন। তাঁদের সামনে একটা লম্বা টেবিল। তারপর তাঁদের মুখোমুখি বসে আছে অনেকগুলি লোক – বয়স তাদের কারও খুব বেশি নয়। অনেকগুলি মেয়েও বসে আছে তাদের মধ্যে। মেঘবর্ণ ও নারদ ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সমস্বরে নমস্কার জানাল।

তারা দু’জনও সবার উদ্দেশে প্রতিনমস্কার করল। কী করবে বুঝতে না পেরে অভীও একবার নমস্কার করে ফেলল সবার দিকে তাকিয়ে।

যিনি কথা বললেন, তাঁকে দেখেই অভীর মনে হল, ইনিই নিশ্চয়ই সমরোত্তমদের অধিনায়ক বজ্রধর হবেন। ঈষৎ লালচে বর্মপরা মানুষটিকে দেখে প্রথমেই যে শব্দটা মনে আসে, তা হল ‘কঠোর’। চৌকোনা গড়নের মুখ, উচ্চতায় মেঘবর্ণের তুলনায় হয়তো একটু খাটো, কিন্তু ভীষণই বলশালী চেহারা। চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর লালচে দাড়ি মিলে মুখটাতে এমন একটা প্রভুত্বব্যঞ্জক কাঠিন্য এনে দিয়েছে যে এঁর দিকে তাকিয়ে এঁর বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারও কখনও হবে বলে অভীর মনে হল না। হাতে তাঁর ধরা আছে মাঝারি আকারের একটা ধাতব দণ্ড – দেখে মনে হল, এটি সম্ভবত উনি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু ওইটুকু লাঠি কীভাবে যুদ্ধ করার সময় কাজে লাগে, কে জানে! রবিকাকাও ভালো লাঠি খেলে, সে দেখেছে। কিন্তু সে লাঠি বাঁশের তৈরি, আর আকারেও এর চেয়ে অনেক বড়ো।

সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, “সহকারী নিয়ামক নারদ, সমরোত্তম মেঘবর্ণ, আপনারা দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। মেঘবর্ণ, এই ছেলেটিকে তো চিনতে পারলাম না।”

মেঘবর্ণ বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর, এর নাম অভী; নতুন শিক্ষার্থী।”

বজ্রধর মেঘবর্ণের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অভীর মনে হল, দু’জনের চোখে চোখে মুহূর্তের জন্য কী কথা হল। তারপর বজ্রধর বললেন, “তুমি তো নিয়ম জানো, মেঘবর্ণ। কোনো নতুন শিক্ষার্থী আয়তনের জরুরি সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারবে না।”

অভীর লজ্জা লাগল। কেন যে মেঘবর্ণ নিয়ে এল তাকে এখানে!

মেঘবর্ণ মৃদু হেসে বলল, “আমি নিয়ম জানি, অধিনায়ক। এই নিয়মের মধ্যে ছোট্টো একটি ‘যদি’ও আছে। কোনো নতুন শিক্ষার্থী আয়তনের জরুরি সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারবে না, যদি না কোনো সমরোত্তম তাকে আমন্ত্রণ করেন।”

অভীর দিকে ফিরে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, “নতুন শিক্ষার্থী, আমি সমরোত্তম মেঘবর্ণ তোমাকে আজকের সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ করছি।”

সভায় বাকিদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠেই মিলিয়ে গেল। অনেকেরই এটা পছন্দ হল না বোঝা গেল, কিন্তু একজন সমরোত্তমের কথার বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলল না।

অধিনায়ক বজ্রধর ড্র কুঁচকে বললেন, “হুম, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না। কিন্তু নিয়ম নিয়মই। অভী, তোমাকে সম্মেলন কক্ষে স্বাগত জানাচ্ছি। অনেকগুলি ফাঁকা আসন আছে। যে-কোনো একটায় গিয়ে বসে পড়ো।”

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অভী। একদম পেছনের দিকে গিয়ে বসতে বসতে সে অনুভব করল, বাকি ছেলেমেয়েরা তাকে একবার করে মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছে।

সহকারী নিয়ামক নারদ বললেন, “এবার সম্মেলন শুরু করা যাক। সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর, আপনাকে অনুরোধ করছি এই জরুরি সম্মেলন আহ্বানের কারণটি সবাইকে বুঝিয়ে বলতে।”

বজ্রধর উঠে দাঁড়ালেন। কক্ষের মধ্যে যেটুকু গুনগুন কথাবার্তা চলছিল, স্তব্ধ হয়ে গেল।

গমগমে কণ্ঠে বজ্রধর বললেন, “সমরগরিমা আয়তনের এক সংকটমুহূর্তে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসার জন্যই আজ সবাইকে ডেকেছি এখানে আমরা। সাধারণত কোনো সমস্যা উপস্থিত হলে আমরা সমরোত্তমরা এবং সহকারী নিয়ামক মহাশয় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। কিন্তু এ ব্যাপারটি একটু আলাদা। আমার মতে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই এ-বিষয়ে তাদের ওয়াকিবহাল থাকা উচিত। তাতে বর্তমানে যে বিপজ্জনক সময়ের মাঝে আমরা বাস করছি, তারা সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে পারবে এবং নিজেদের প্রস্তুত রাখতে পারবে।”

মেঘবর্ণ বলে উঠল, “গতকাল থেকে আমি আয়তনের বাইরে আছি। অধিনায়ক বজ্রধর, কী হয়েছে বিস্তারিত বলুন দয়া করে।”

বজ্রধর বললেন, “ঐশিকশ্রেষ্ঠ আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের এক সাথির মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে আজ সকালে।”

সভাকক্ষে ফিশফাশ শুরু হল। বজ্রধর আবার বললেন, “এবং সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল, এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। খুন।”

মেঘবর্ণ দাঁড়িয়েই ছিল, বসেনি। সে চমকে উঠে বলল, “কে খুন হল?”

বজ্রধর বললেন, “কল্পনাথ। থাকত মানবমন্দির এলাকায়। কেউ নিশ্চয়ই

জানতে পেরে গিয়েছিল, আমাদের আয়তনের হয়ে রাক্ষসদের খবর সংগ্রহ করত ও।”

সহকারী নিয়ামক নারদ বললেন, “এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কল্পনাথের মৃত্যুর সঙ্গে শর্বরের কোনো না কোনো যোগাযোগ আছে।”

‘শর্বর’ নামটা উচ্চারিত হতেই কক্ষের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। কয়েকটি ছেলেমেয়ে আতঙ্কে নিজেদের মুখে হাত চাপা দিল।

মেঘবর্ণ বলল, “সহকারী নিয়ামক, আপনার এই বিশ্বাসের কারণ?”

নারদ কিছু বলার আগে বজ্রধরই বললেন, “কারণ, এ কাজ রাক্ষসদের, প্রমাণিত হয়েছে। রাক্ষস-মায়াবিদ্যা প্রয়োগ করে ওকে মেরেছে ওরা। সমরোত্তম শ্যামশ্রী আছেন মায়াঅস্ত্র-বিশেষজ্ঞ। দয়া করে সবাইকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলো, সমরোত্তম শ্যামশ্রী।”

গোলমতো মুখের একটা ছেলে বসে ছিল অভীর সামনে। অযাচিতভাবেই মুখ ফিরিয়ে সে অভীকে বলল, “একমাত্র মহিলা সমরোত্তম। কিন্তু উনি কখনও মুখোশ খোলেন না।”

অভী একটু হাসল। ছেলেটা একটুখানি পেছন ফিরে নমস্কার করল। “আমি সন্দীপ।” – ফিশফিশিয়ে বলল সে।

অভীও পালটা নমস্কার করে বলল, “আমি অভী।”

মাথা নেড়ে আবার সোজা হয়ে বসল সন্দীপ। সমরোত্তম শ্যামশ্রী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

কবজি থেকে দু’হাতের তালু বাদ দিলে তাঁর গোটা শরীর ঢাকা আছে যোদ্ধার ধাতব জালের বর্মে; মাথায় শিরস্ত্রাণ, মুখও আবৃত। চোখদুটি দেখা যাচ্ছে কেবল আবরণের ফাঁক দিয়ে। তাঁর কণ্ঠস্বর অতি গম্ভীর, পুরুষালি। সন্দীপ আবার মাথা ঘুরিয়ে নীচু গলায় বলল, “লোকে বলে, ওঁর মুখের আবরণের মধ্যে একটা মায়াযন্ত্র বসানো আছে। উনি নিজের আসল কণ্ঠস্বর কাউকে শোনাতে চান না। নিজের চেহারাও কাউকে দেখাতে চান না।”

অভীর মনে হল, ঠিক যেন মারীচের দোকানের সেই রহস্যময় লোকটার মতো!

সমরোত্তম শ্যামশ্রী বললেন, “মানুষ, রাক্ষস এবং দেবতা বা ঐশিকদের নানারকম মায়াযুদ্ধ সম্পর্কে আমার অল্পস্বল্প জ্ঞান আছে, তোমরা জানো। কিন্তু কল্পনাথকে মারতে যে আসলে রাক্ষসমায়া ব্যবহার করা হয়েছে, সে-কথা বুঝতে আমার অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল। তারপর ওর মৃতদেহের পাশে ছোটো ছোটো টুকরোয় কালচে রঙের ভাঙা ডিমের খোলা পড়ে থাকতে দেখে বুঝলাম, ওকে মারা হয়েছে সুপ্তসর্প ব্যবহার করে। এই অস্ত্রে মরলে মৃতের শরীরে কোনো আঘাতচিহ্ন থাকে না।”

মেঘবর্ণ বলল, “শ্যামশ্রী, ব্যাপারটা সবাইকে বুঝিয়ে দাও।”

শ্যামশ্রী বললেন, “রাক্ষসদের মধ্যেই এই মায়াঅস্ত্রের প্রচলন আছে। খুব দক্ষ মায়াধর ছাড়া এ জিনিস কেউ তৈরি করতেই পারে না; এমনকি রাক্ষসদের মধ্যেও এত উঁচুদের মায়াধর কমই আছে। মায়া দিয়ে তৈরি বিষধর সাপকে

নকল ডিমের খোলায় ভরে রেখে যাওয়া হয়েছিল কল্পনাথের উদ্দেশে - তার চমার পথে। কল্পনাথ কাছে আসতেই মায়াসর্প বুঝতে পারে, তার শিকার এসে গেছে। ডিম ভেঙে বেরিয়ে এসে কল্পনাথকে কামড়ে দিয়েই তার কাজ শেষ হয়; সে ধুলোয় মিশে যায় ধুলো হয়ে। এই অস্ত্র ব্যবহারের সুবিধা হচ্ছে, হত্যাকারী অনেক দূর থেকেই কার্যসমাপ্ত করতে পারে। এর আর একটা সুবিধা হল, সুগুসর্প কখনও শিকার চিনতে ভুল করে না। তাই বোঝাই যাচ্ছে, রাক্ষসদের মধ্যেও খুব শক্তিশালী কেউই কল্পনাথকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। ডিমের খোলাগুলো খুঁজে না পেলে ও যে কীভাবে মারা গেল, কেউ বুঝতেই পারত না।”

মেঘবর্ণ বলল, “তার মানে, ওর কাছে এমন কোনো খবর ছিল, যা আমরা জানতে পেরে যাই, এটা ওরা চায়নি।”

শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন হাত তুলল। বজ্রধর বললেন, “বলো অরিত্র, তোমার কী প্রশ্ন আছে?”

অরিত্র ছেলেটি বেশ লম্বা, মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা। সে বলল, “কল্পনাথের এই মৃত্যুর সঙ্গে যে শর্বরের যোগাযোগ আছে, সেটা আপনারা অনুমান করছেন কী করে?”

সহকারী নিয়ামক নারদ অনেকক্ষণ পরে মুখ খুললেন। “কারণ কয়েকদিন আগেই কল্পনাথ আমার কাছে এসেছিল। তখনই দেখেছিলাম, ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে ও। আমাকে বলল, ‘সমরোত্তমদের তৈরি থাকতে বলুন। শর্বরকে মুক্ত করার ফন্দি আঁটছে মাল্যপর্বতের রাক্ষসরা। আর তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আমাদের সমরগরিমারই কিছু লোকজন।’ শুনে আমি প্রথমটা বিশ্বাস করতে চাইনি। কিন্তু তারপর মনে হল, বিশ্বাস করাই উচিত, কারণ সাবধানের মার নেই। সে-কথা তখনই সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধরকে জানিয়েছিলাম আমি। তারপর তো আজ সকালে এই কাণ্ড!”

অরিত্র বলল, “তার মানে বলতে চাইছেন, আমাদের মধ্যেই এক বা একাধিক বিশ্বাসঘাতক আছে?”

অধিনায়ক বজ্রধর হাত তুলে প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিলেন। “একটা কথা সবাই মনে রাখো। এখন কিন্তু বিশ্বাস হারানোর সময় নয়। নিজেদের মধ্যে সন্দেহ ঢুকলে আয়তনকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তবে এ-কথাও ঠিক, সতর্ক আমাদের সবাইকে থাকতে হবে। সাবধানের মার নেই, এই একটি বড়ো দামি কথা বলেছেন আমাদের সহকারী নিয়ামক নারদ। কল্পনাথ আমাদের গোপনে খবরাখবর এনে দিত বলেই তাকে মরতে হল, এ-কথা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। রাক্ষসমায়া ছাড়া তো সুগুসর্প প্রস্তুত করাই সম্ভব নয়।”

অভী পেছনে বসে দেখতে পাচ্ছিল মেঘবর্ণের জ্র কুঁচকে রয়েছে। হাত তুলে মেঘবর্ণ বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর, এমনটাও কি হতে পারে, কেউ চাইছে সবাই এমন ভাবুক যে কল্পনাথ মারা গেছে রাক্ষসদের আক্রমণে? না, মানে বলতে চাইছি, কল্পনাথ মানবমন্দির এলাকার একজন গরিব মানুষ ছিল - বড়ো কোনো যোদ্ধা ছিল না, সমরোত্তম ছিল না, বা উঁচুপদের রাজনীতিকও ছিল না।

ওকে মারতে চাইলে দূর থেকে তির ছুড়ে বা তরবারির এক আঘাতে মেরে ফেলাটা কোনো রাক্ষসের কাছে কঠিন কাজ ছিল না মোটেই। এদিকে সুপ্তসর্প অস্ত্র প্রস্তুত করা বেশ কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ কাজ। সমরোত্তম শ্যামশ্রীও বললেন যে রাক্ষসদের মধ্যেও ও জিনিস তৈরি করার মতো দক্ষ মায়াধর কমই আছে। কল্পনাথের মতো একজন নিরস্ত্র, সাধারণ অসামরিক মানুষকে মারার জন্য ওরা একটু বেশিই পরিশ্রম করে ফেলল, এরকম কি মনে হচ্ছে না?”

বজ্রধর কিছুক্ষণ গম্ভীরমুখে চুপ করে রইলেন; তারপর বললেন, “তুমি কী বলতে চাইছ, খুলে বলো, মেঘবর্ণ।”

মেঘবর্ণ বলল, “আমি বলতে চাইছি একটা সম্ভাবনার কথা। কল্পনাথ আমাদের বন্ধু ছিল, সমরগরিমা আয়তনের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল। তার হত্যাকারী উচিত শাস্তি পাক, এই আমি চাই। কিন্তু ভেবে দেখুন, কেউ যেন আমাদের ভাবতে বাধ্য করতে চাইছে, এ হত্যাকাণ্ড রাক্ষসরা ঘটিয়েছে। ইতিমধ্যেই নানা জায়গা থেকে সমরোত্তমদের কানে শব্দর সম্বন্ধে নানা ধরনের খবর আসছে। নিঃসন্দেহে তার অধিকাংশটাই গুজব, কিন্তু এসব গুজব ছড়াচ্ছে কে? এই সময় আমরা যদি অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিই, তাহলে তার ফল ভালো হবে না বলেই আমার ধারণা।”

উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা রাগত গুনগুন শুরু হল। বজ্রধর বললেন, “তোমাদের কিছু বলার আছে মনে হচ্ছে, শিক্ষার্থীগণ। এক এক করে মতামত ব্যক্ত করো।”

একটি ছেলে উঠে দাঁড়াল। “আমি শিক্ষার্থী যোদ্ধােনায়ক মৃগেন্দ্র। আমার বক্তব্য খুব সামান্য। আমি জানতে চাই, রাক্ষসরা আমাদের এক সাথিকে আয়তনের এত কাছে হত্যা করে গেল – এর প্রতিশোধ আমরা কীভাবে নিচ্ছি।”

স্বতঃস্ফূর্ত হাততালি দিয়ে বাকি শিক্ষার্থীরাও তাদের সমর্থন জানিয়ে দিল।

এবার উঠল একটি মেয়ে। “আমি শিক্ষার্থী উষসী। এই আয়তনে আসার প্রথম দিন থেকে আমাদের শেখানো হয়েছে – আপনারাই শিখিয়েছেন – এক যোদ্ধার প্রাণের চেয়েও বড়ো সম্পদ তার সমরগরিমা। কল্পনাথ রাক্ষসদের খবর এনে আপনাদের দিত। অর্থাৎ আয়তনের কাজ করতে গিয়েই সে প্রাণ হারিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের সমরগরিমা রক্ষার জন্য কি কিছুই করব না?”

মেঘবর্ণ কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অধিনায়ক বজ্রধর তাকে থামিয়ে দিলেন; বললেন, “আর কেউ কিছু বলবে?”

একটি লম্বা চওড়া ছেলে উঠে দাঁড়াল – মুখের ভাব একটু নিষ্ঠুর ধরনের। সে বলল, “আমি শিক্ষার্থী তরুণ। আমি একটি সহজ কথা বুঝি – দাঁতের বদলে দাঁত। রাক্ষসরা যখন এখানে এসে রক্তপাতের ঘটনা ঘটিয়েছে, তখন পালটা রক্ত দেখানোর দায়িত্ব আমাদের।”

শ্যামশ্রী বিরক্তভাবে বলে উঠলেন, “তাহলেই চমৎকার হবে। যে বা যারা চাইছে যুদ্ধটা লেগে যাক, তাদের খুব সুবিধা হবে।”

আবার হাত তুলে তাঁকে নিরস্ত করে বজ্রধর বললেন, “হুম, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না। কিন্তু শিক্ষার্থীদের একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো। অসিযুদ্ধে পারদর্শী এখানে অনেকেই আছ, আর অসিযুদ্ধের প্রাথমিক জ্ঞান তো সকলেরই আছে। (একবার চট করে অভীর দিকে দেখে নিলেন তিনি।) এখন এখানে যে সাধারণ শিক্ষার্থী বা যোদ্ধা নাগরিক পদে উন্নীত শিক্ষার্থী আছ, তোমরা অসিযুদ্ধ করতে যদি যাও, ঢাল ছাড়া যাবে কি?”

শিক্ষার্থীরা চুপ করে আছে। বজ্রধর বললেন, “ঢাল ছাড়াও অসিযুদ্ধ করা যায়, কিন্তু এই আয়তনে আমরা শিক্ষার্থীদের সবসময় উৎসাহ দিই ঢালসহ অনুশীলন করার জন্য। যে-কোনো যুদ্ধের দুটি অংশ - আক্রমণ আর আত্মরক্ষা। ঢাল দিয়ে যদি বিপক্ষের আঘাত আটকাতে না পারো, তাহলে তোমার হাতে অসি থেকেও লাভ নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে ন্যায্যযুদ্ধ হবে, এ আশা না করাই ভালো। তুমি যখন একজনের সাথে অসিযুদ্ধে বাস্তু, সেইসময় তোমাকে লক্ষ্য করে কেউ তির বা বর্শা নিক্ষেপ করলে ঠেকাবে কী করে? আত্মরক্ষার জন্য ঢাল তাই দরকার।”

একটু থেমে তিনি শিক্ষার্থীদের মুখগুলো একবার দেখে নিলেন। কেউ কোনো কথা বলল না।

তিনি বলে চললেন, “আর আত্মরক্ষা তখনই করতে পারবে, যদি সতর্ক থাকো। শত্রু তোমার জন্য ফাঁদ পাতবে, সেই ফাঁদে পা না দেওয়াই বুদ্ধিমান যোদ্ধার লক্ষণ। সমরগরিমা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না একটুও। কল্পনাথ আমাদের কাছের মানুষ ছিল। তার হত্যাকারী শাস্তি পাবে, এই ভরসা আমি তোমাদের দিচ্ছি। তার স্ত্রী আর মেয়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিচ্ছে সমরগরিমা আয়তন। কিন্তু একটা কথা স্পষ্টভাবে সকলের জেনে রাখা দরকার। হাতে নিয়তিলাঞ্ছন আছে বলেই আজ তোমরা সবাই এখানে আসতে পেরেছ। অর্থাৎ এই আয়তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ একসময় তোমরা সকলেই করবে। সর্বোপরি আকাশলোকে ঐশিকশ্রেষ্ঠ আছেন, তাঁর দৈব আশীর্বাদ তোমাদের মাথার ওপর আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে যুদ্ধঘোষণা করার মতো অবস্থায় আমরা আছি কি? আমাদের রাজনীতির যিনি নিয়ামক... থাক, তাঁর কথা আমি আর নতুন করে কিছু বলতে চাই না।”

মৃদু হাসির রোল উঠল সম্মেলন কক্ষে। সন্দীপ নামের ছেলেটা আবার একটু মাথা ঘুরিয়ে অভীকে চাপা গলায় বলল, “নিয়ামক বিনীতেশ। এক নম্বরের ইয়ে একটা!”

তার বলার ভঙ্গিতে হাসি পেয়ে গেল অভীর। ওদিকে বজ্রধর আবার বলতে শুরু করেছেন। “যুদ্ধ যদি এই মুহূর্তে লাগে, তাহলে আমাদের আয়তনের অনেকগুলি অমূল্য প্রাণ যাবে, এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিকে রটনা কানে আসছে, শব্দরকে নাকি রাক্ষসরা তার বন্দিশালা থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় আছে। এই মুহূর্তে একটা যুদ্ধে আমরা যদি আমাদের মূল্যবান যোদ্ধাদের হারাই, তাহলে রাক্ষসদের কতটা সুবিধা হবে, বুঝতে পারছ?”

মেঘবর্ণ হাত তুলল। এবার বজ্রধর তাকে বলতে অনুমতি দিলেন। সে

বলল, “রাক্ষসরা মায়াযুদ্ধে আমাদের থেকে অনেক দক্ষ, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। এদিকে আমাদের মধ্যে সমরোত্তম শ্যামশ্রী ছাড়া এইধরনের যুদ্ধবিদ্যায় পটু খুব বেশি যোদ্ধা আছে বলে আমার তো জানা নেই। কাজেই সেধে একটা যুদ্ধ ডেকে আনাকে আমি অন্তত বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি না। আর প্রতিশোধ? সে ব্যাপারটা আমার মনে হয় অধিনায়ক বজ্রধর তোমাদের আরও স্পষ্ট করে বোঝাতে পারবেন।”

মেঘবর্ণ তাকাল বজ্রধরের দিকে। তিনি বললেন, “এই কথাটা তোমাদের সবাইকে মাথায় রাখতে হবে যে, প্রতিশোধ কখনও এই আয়তনের লক্ষ্য হতে পারে না। সমরগরিমা আয়তন রক্ষা করে – তার ছায়ায় যে-ই আসুক, সে জাতে মানুষ – রাক্ষস যাই হোক না কেন – অশ্রিতকে সে চিরদিন রক্ষা করবে। প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে এই মুহূর্তে, যারা এরকম ভাবছে, তারা ঠিক ভাবছে না। এতে নিজেদের মধ্যেই সন্দেহ-অসন্তোষ বাড়বে। তবে হ্যাঁ, কল্পনাথের মৃত্যু আমরা ভুলব না। অনুসন্ধান করে হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়া হবেই। কিন্তু সন্দেহের বশে হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে আমি রাজি নই।”

বেশ কয়েকজন ছাত্র মাথা নীচু করল। যুদ্ধের এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় তারা যে বেশ হতাশ, বোঝা গেল।

শ্যামশ্রী হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, “আমাদের মাননীয় নিয়ামক শুনেছেন কল্পনাথের ব্যাপারটা?”

বজ্রধর গম্ভীরমুখে বললেন, “এখনও না। জানতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে দোষারোপের পালা শুরু করবেন উনি। বলবেন, আমরা সমরোত্তমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ এবং আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।”

মেঘবর্ণ একটা মুখভঙ্গি করে বলল, “হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমাদের সব গুপ্তধনও ওঁর হাতে তুলে দেওয়া উচিত।”

কক্ষের সবাই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। অভী ফিশফিশ করে সন্দীপকে জিজ্ঞেস করল, “গুপ্তধনটা কী?”

সন্দীপ হাসতে হাসতেই বলল, “কিছুই নেই। কিন্তু নিয়ামক মশাই মনে করেন, আমাদের আয়তনে অনেক সোনাদানা গোপনে লুকিয়ে রেখেছেন সমরোত্তমরা।”

মেঘবর্ণ হাসিমুখে বলল, “দেখবেন সহকারী নিয়ামক নারদ, এসব কথা আবার আপনার নিয়ামক প্রভুকে বলতে যাবেন না যেন।”

সহকারী নিয়ামক নারদ একটু আহত কণ্ঠে বললেন, “আচ্ছা সমরোত্তমগণ, আপনারাই বলুন, কখনও কি আমি আপনাদের বা আয়তনের বিরুদ্ধে কোনো কথা আমার ওপরওয়ালাকে লাগিয়েছি?”

সমরোত্তমরা সবাই একযোগে ‘না’ বললেন। মেঘবর্ণ বলল, “আরে, দুঃখ পেলেন নাকি? মজা করছিলাম আমি।”

এবার নারদও হাসলেন। “বুঝতে পেরেছি, সমরোত্তম মেঘবর্ণ।”

শ্যামশ্রী বললেন, “একটা কথা আমার হঠাৎ মনে পড়ল। কল্পনাথ একটা নাম আমাকে বলেছিল। সম্ভবত কোনো উচ্চপদস্থ রাক্ষসের নাম। কিন্তু এ নাম

আমি আগে কখনও শুনিনি; মাল্যপর্বতের বড়ো বড়ো রাক্ষসদের ইতিহাসেও এই নাম কখনও সামনে আসেনি। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম; আজ হঠাৎ মনে পড়ল। ‘উর্গায়ু’। কারও কানে কখনও এসেছে এ নাম?”

সঙ্গে সঙ্গে অভী আর মেঘবর্ণের চোখাচোখি হল। অভী বুঝতে পারল, চোখের ইশারায় মেঘবর্ণ তাকে চুপ করে থাকতে বলছে।

বজ্রধর বললেন, “আমি তো শুনিনি। তোমরা কেউ শুনেছ?”

সকলেই মাথা নাড়ল। শ্যামশ্রী বললেন, “কল্পনাথ বলেছিল, উর্গায়ু সম্বন্ধে পাকা খবর এনে আবার আমার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু তার আগেই...”

কেউ কিছু বলল না। অভী-র বারবার মনে পড়তে লাগল মারীচের দোকানের সেই অদ্ভুত মুখঢাকা লোকটার কথা। উর্গায়ুকে নিয়ে মারীচও তো তাদের সাবধান করে দিল আজ!

আচ্ছা, উর্গায়ু সম্বন্ধে কিছু জেনে ফেলেছিল বলেই কি কল্পনাথকে মরতে হল?

সহকারী নিয়ামক নারদ বললেন, “শর্বরের এরকম অসংখ্য অনুরাগী অনুচর ছিল, যারা হঠাৎ করেই খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই লোকটাও সম্ভবত সেরকমই কেউ হবে।”

অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, “পরে আবার এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। আপাতত আর একটি ছোটো অনুষ্ঠানের পরেই আজকের সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করব। আমাদের নতুন শিক্ষার্থীর পরিচয়পর্ব।”

বুকটা ধড়াস করে উঠল অভীর। বজ্রধর হাত বাড়িয়ে আছেন তার দিকে। তাকিয়ে আছে কক্ষের সকলে।

মেঘবর্ণ বলল, “অভী, উঠে এসো।”

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে অভীর মনে হল তার পা টলছে। সন্দীপ নীচুগলায় বলল, “আরে যাও, যাও। প্রথমবার ওরকম ভয় সবারই লাগে। আমি তো প্যান্টেই...”

সবাই দেখছে তাকে। কাল রাতে রাক্ষসগুলো যখন জঙ্গলে আক্রমণ করেছিল, তখনও তার এত ভয় লাগেনি।

কী পরিচয় দেবে সে?

গলা শুকিয়ে গেছে তার। মনে হচ্ছে, কিছু বলতে গেলেই সবাই হাসবে।

মেঘবর্ণ চোখের ইশারা করল, “ভয়ের কিছু নেই।”

দুর্বল পায়ে সমরোত্তমদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। বজ্রধর ওর কাঁধে হাত রাখলেন; বললেন, “অভী, তোমার বংশপরিচয় জানাও আমাদের।”

“ব্... বংশপরিচয়?”

সবাই তাকে দেখছে – মেঘবর্ণ, শ্যামশ্রী, নারদ, এতজন শিক্ষার্থী। এত লোকের সামনে কিছু বলার থেকে যেন রণিতের দলবলের হাতে মার খাওয়া অনেক ভালো ছিল। অভীর মনে হল, তার জিভটা শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে।

শ্যামশ্রীর বোধহয় একটু করুণা হল। পেছন থেকে তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, “তোমার নিয়তিলাঞ্ছন স্পষ্ট হওয়ার আগের জীবন

সম্বন্ধে দু'এক কথা বলো শুধু। ওতেই হবে।”

অভী নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। সবাই দেখছে তাকে। দেখুক; সে কারও দিকে তাকাবে না। সবার পেছনের পাথুরে দেয়ালটার গায়ে চোখ রেখে সে বলতে লাগল, “আমি শিক্ষার্থী অভী। আমার জন্মের সময় আমার মা মারা যান। বাবা মারা গেছেন যখন আমার বয়স দু'বছর। ছোটো থেকেই কাকার কাছে আমি মানুষ। শুনেছি, বাবা চাষবাস করতেন।”

চাপাগলায় মেঘবর্ণ বলল, “এই কাকাটি জ্যান্ত স্বর্ণখেচর দেখতে পায় এবং ধরতে পারে, অধিনায়ক বজ্রধর।”

আর কেউ শুনতে পায়নি কথাটা। বজ্রধর ইঙ্গিতপূর্ণভাবে অল্প মাথা নেড়ে অভীকে বললেন, “চমৎকার, অভী। আর কিছু বলবে?”

“আর কিছু বলার নেই আমার।”

“অতি উত্তম।” বজ্রধর তাঁর হাতের ধাতব দণ্ডটি একবার ঝাঁকালেন; কক্ষের মধ্যে মেঘগর্জনের শব্দ হল। - “আমি, সমরগরিমা আয়তনের সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর, স্বাগত জানাচ্ছি শিক্ষার্থী অভীকে।”

কক্ষ মুখরিত হয়ে উঠল করতালির শব্দে। সহকারী নিয়ামক নারদ সূর্য আর তরবারি আঁকার ধাতব প্রতীক পিন দিয়ে আটকে দিলেন ওর জামায়। সন্দীপ উঠে এসে আলিঙ্গন করল তাকে। - “আমি তোমার প্রথম বন্ধু।”

নারদ পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, “অভী, এখানে ‘প্রথম বন্ধু’ মানে যে সবার আগে এসে তোমাকে গ্রহণ করবে বন্ধু হিসেবে। আমাদের সন্দীপ সমরোত্তম শ্যামশ্রীর প্রিয় ছাত্র। ওর গুনের অনেক পরিচয় তুমি পরে পাবে।”

বাকি ছেলেমেয়েরাও একে একে অভীকে স্বাগত জানিয়ে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। তবে কয়েকজনের মুখের তাচ্ছিল্যের হাসি তার নজর এড়াল না।

তাচ্ছিল্য করাই স্বাভাবিক, অভী জানে। তার বংশপরিচয় নিশ্চয়ই আহামরি কিছু নয় বাকিদের তুলনায়।

সামনে এসে যে ছেলেটা তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, অভী চিনতে পারল তাকে। কী যেন নাম - তরুণ! দাঁতের বদলে দাঁত, পালটা রক্ত - এইসব বলছিল সে।

নিষ্ঠুর মুখের ছেলেটা একবার ঘৃণাভরে তার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল। “আর একটা অপদার্থ আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা এসে পড়ল আয়তনে।”

খুবই নীচুগলায় মন্তব্যটা করেছিল সে, কিন্তু সহকারী নিয়ামক নারদ শুনে ফেলেছেন কথাটা। কড়াগলায় তিনি বললেন, “এই আয়তনে যদি বন্ধুত্বকে সম্মান করতে না শেখো তরুণ, তাহলে তোমার চেয়ে অপদার্থ আর কেউ এখানে নেই। বেরিয়ে যাও এখান থেকে, দুর্বিনীত।”

সহকারী নিয়ামকের মুখের ওপর আর কিছু বলার সাহস তরুণের হল না। অভীর হাতটা এক ঝাঁকুনি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে সে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

অধিনায়ক বজ্রধর চুপ করে ব্যাপারটা দেখছিলেন। তিনি বললেন, “অভী,

আমরা বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করি বটে, কিন্তু বাস্তবিক ওতে আমাদের কিছু যায় আসে না। এই আয়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঐশিকশ্রেষ্ঠ - মানে একজন দেবতা। তিনি কিছু রীতি চালু করেছিলেন, যেগুলো তাঁর প্রতি সম্মান জানাতেই আমরা এখনও মেনে চলি। বংশপরিচয় জানতে চাওয়াটা সেই রেওয়াজগুলোর মধ্যে একটা - এইমাত্র। ও দিয়ে কিছু যায় আসে না, অতী। আমি নিজে মুচির ছেলে, আর শর্বর - খুনি, লোভী, হিংস্র শর্বর - রাজপুত্র!

অতী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর তার খেয়াল হল, মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রী দু'জনে একটু দূরে কীসব যেন শলাপরামর্শ করছেন। মেঘবর্ণ একবার আড়চোখে তাকে দেখে নেওয়ায় তার মনে হল, ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্ভবত সে-ই।

একটা মোটা খাতা ইতিমধ্যে কোথা থেকে যেন টেনে বার করেছেন অধিনায়ক বজ্রধর। পাতা উলটে কীসব দেখতে দেখতে তিনি বললেন, “তোমাকে কোথায় রাখা যায়, সেটাই ভাবছি, অতী। দেখি কোথায় জায়গা ফাঁকা আছে।”

খাতার পাতা উলটে কীসব দেখতে লাগলেন বজ্রধর। নারদ অতীকে বললেন, “পরীক্ষা না করে যদিও আগাম কিছুই বলা যায় না, তাও আমার ধারণা, অসিযুদ্ধেই তোমার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা বেশি। আমাদের সমরোত্তম মেঘবর্ণ নিজে একজন অসামান্য অসিযোদ্ধা তো। ওঁর আনা শিক্ষার্থীরাও বেশিরভাগই অসিযুদ্ধে পটু হয়। হেঃ হেঃ।”

কী বলবে বুঝতে না পেরে অতী কাষ্ঠহাসি হাসল। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা সবাই এতক্ষণে বেরিয়ে গেছে সম্মেলন কক্ষ থেকে, রয়ে গেছে শুধু তিনজন সমরোত্তম, সহকারী নিয়ামক নারদ আর সে নিজে। পরামর্শ শেষ করে মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রী তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

বজ্রধর বললেন, “এই যে পেয়েছি। মিত্রদের গৃহে একটি, না না, দুটি জায়গা ফাঁকা আছে। ...ঠিক, অতী। ওখানেই তোমার থাকার বন্দোবস্ত করছি। শ্রীমতী মিত্রের কাছে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি যে তুমি তাঁর তৃতীয় অতিথি হতে চলেছ।”

“তৃতীয়?”

“হুম, আরও দুটি মেয়ে আছে ওখানে। আমাদের আয়তনেরই ছাত্রী।”

অতীর আবার ভয় লাগছে। মেয়েদের সঙ্গে সে কোনোদিন ভালো করে কথাই বলেনি! দু'দুটো মেয়ের সঙ্গে থাকতে হবে তাকে!

বজ্রধর আবার বললেন, “একটি আছে মানুষ, তার নাম লীনা। আর আছে নিধি - একজন অর্ধরাক্ষস। ...সহকারী নিয়ামক নারদ, আশা করি আপনি বরাবরের মতো এই নতুন শিক্ষার্থীকেও আয়তনটি একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে একে এর বাসগৃহে পৌঁছে দেবেন।”

নারদ বললেন, “সানন্দে। এসো অতী।”

মেঘবর্ণ বলল, “একটু দাঁড়ান। আমার একটা বিষয় বলার ছিল। সবাই ছিল বলে এতক্ষণ বলিনি।”

বজ্রধর বললেন, “বলো।”

গতরাতের ঘটনা সংক্ষেপে জানিয়ে দিল মেঘবর্ণ। আজ সকালে যে বৈদূর্যর কাটা মাথা তাদেরকে উপহার দেওয়া হয়েছে, সে-কথাও বলতে ভুলল না। তবে তার গোপন সংবাদদাতা হিসেবে মারীচের নামটা সে গোপন করে গেল। অতী খেয়াল করল, উর্গায়ুর প্রসঙ্গটাও সে বাদ দিয়ে গেল।

সব শুনে বজ্রধর বললেন, “তার মানে, তুমি যে আয়তনে নেই, ওখানে গেছ, এটা কেউ জানত। তোমার, শুধু তোমার কেন, আমাদের সকলের গতিবিধির ওপরেই সম্ভবত নজর রাখা হচ্ছে। সবার সামনে আমি এ-প্রসঙ্গ বাড়তে দিইনি মেঘবর্ণ, কিন্তু আমি নিশ্চিত, রাক্ষসদের চর আমাদের মধ্যে অবশ্যই আছে। নয়তো আমাদের গোপন কথা বাইরে যাচ্ছে কী করে?”

সবাই চুপ করে রইল। বজ্রধর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “এ আলোচনা আজকের মতো থাক। সহকারী নিয়ামক নারদ, যদি অনুগ্রহ করে...” – দরজার দিকে হাত দেখালেন তিনি।

নারদ বললেন, “অবশ্যই, অবশ্যই। অতী, এসো।”

তাঁর আগেই বাইরে এল অতী। এসে দেখল, তরুণ তখনও দাঁড়িয়ে আছে। চাপা গলায় দাঁত চেপে সে বলল, “তোকে আমি পরে দেখে নেব, মনে রাখিস।”

আর একটুও না দাঁড়িয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল তরুণ। অতী হাসল। নাঃ, ভয় তার করছে না। একা একা কতবার রণিতদের হুমকির মুখোমুখি হয়েছে সে। এ তো কিছুই না।

নারদ বেরিয়ে এসে বললেন, “এই ডানদিকে এসো, অতী। আয়তনের কয়েকটা দ্রষ্টব্য জিনিস দেখিয়ে তোমাকে মিত্রভাবে পৌঁছে দিলে তবে আমার ছুটি।”

অতী মৃদু হেসে তাঁর পেছনে চলল। কিন্তু একটু আগে বজ্রধরের বলা একটা শব্দ ভীষণ অস্বস্তিকরভাবে তার মাথার মধ্যে গুনগুন করেই চলেছে।

‘অর্ধরাক্ষস’!

অ্যাঁ?



।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

পর্বত

মশালের আলোয় অলিন্দপথে সে হাঁটছিল নারদের সঙ্গে। সমরোত্তমরা সম্মেলন কক্ষেই রয়ে গেছেন, কীসব কথাবার্তা বলছেন। একটা জানালা দিয়ে সে আবার বাইরেটা একটুখানি দেখতে পেল। রাতের ঠান্ডা হাওয়া এসে মুখে লাগতে ভেতরটা যেন জুড়িয়ে গেল।

একটা দরজার ওপর হাত রাখলেন নারদ – নিজে থেকেই খুলে গেল দরজাটা। অতীত চোখের অবাক দৃষ্টি দেখে তিনি ব্যাখ্যা করে দিলেন, “এই দরজাগুলো স্পর্শ চেনে। বিশেষ কয়েকজন ছাড়া আর কারও ছোঁয়ায় এই বিশেষ কয়েকটা ঘরের দরজা কোনোমতেই খোলা যায় না। ভেতরে এসো – এটা অস্ত্রাগার।”

ভেতরে মশাল জ্বলছে। ঘরের অস্ত্রসম্ভার দেখে অতীত মুখ হাঁ হয়ে গেল। অসংখ্য তরবারি – বিচিত্র তাদের চেহারা সব। কোনোটার মুখ ছুঁচের মতো, কোনোটা তীক্ষ্ণ পাতার মতো, কোনোটা ভোঁতা মুখ, আবার কোনোটা বাজপাখির নখের মতো বাঁকানো। সেইরকম আছে নানা ধরনের, নানা আকারের ধনুক আর তির-ঠাসা তুণীর। এক কোণে রাখা আছে সারি সারি বর্শা। বেশ কিছু মুষলও রাখা আছে জড়ো করে। আরও কত কী যে আছে, অতীত সেসব জীবনে দেখেওনি, চেনেও না।

নারদ বললেন, “এগুলো শুধু আয়তনের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য। আমাদের নিয়ামক প্রভু বিনীতেশের রক্ষীবাহিনীর অস্ত্রাগার আলাদা। তার দেখভাল সমরোত্তমরা করেন না।”

বাপ রে! এইগুলো শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করে!

একটা বাঁকা তলোয়ারের ফলায় আঙুল বুলিয়ে দেখছিল সে, নারদ নিষেধ করলেন। “ভুলেও ও কাজ করতে যেয়ো না অভী। প্রচণ্ড ধারালো জিনিস – তুমি বুঝতে পারার আগেই আঙুলের মাংস কেটে হাড় ছুঁয়ে ফেলবে।”

অভী হাত সরিয়ে নিল। নারদ বললেন, “এসো, পরেরটায় যাওয়া যাক। এসব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপার ব্যাখ্যা করার জন্য আমার চেয়ে অনেক যোগ্য লোক আছেন এই আয়তনে।”

অভীর লোকটিকে ভালো লাগল। এত উচ্চপদস্থ একজন মানুষ, কিন্তু সেজন্য কোনো অহংকার নেই।

আবার অলিন্দপথে হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছু কক্ষ পেরিয়ে ওরা এল গ্রন্থাগারে। নারদের হাতের স্পর্শে খুলে গেল এই দরজাটাও।

ভেতরে ঢুকে অভী চমকে গেল। এই ঘরটাও যে এত বড়ো, বাইরে থেকে মোটেই বোঝা যায়নি। অজস্র তাক ভরতি গোটা ঘরে, আর সেগুলো ভরতি শুধু বই আর বই। এই ঘরে আলোটাও যেন অন্য জায়গার তুলনায় বেশি উজ্জ্বল।

বই পড়তে ভালোবাসে অভী। কিন্তু ওই জঙ্গলে কোথায় আর পাবে বেশি বই? রবিকাকা শহরে গেলে মাঝেমধ্যে কিছু বই এনে দিত – পড়া হয়ে গেলে আবার নতুন বই আনত।

শুধু বই নয়, কাঠের পাটা দিয়ে বাঁধানো প্রচুর পুথিও নজরে পড়ল তার। পুথি চেনে অভী; রবিকাকার কাছেও একটা আছে, যদিও কোনোদিন খুলে পড়ার কৌতূহল তার হয়নি।

ঘরের মেঝে থেকে প্রায় ছাদ পর্যন্ত লম্বা বইয়ের তাক দেখতে দেখতে অভীর মনে হচ্ছিল সে যেন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে। একটা তাকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটিকে দেখতে পেল সে।

একমনে বই পড়ছেন তিনি, যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। না, বই নয়, পুথি। মুখে তাঁর অযত্নাললিত দাড়িগোঁফ, উশকোখুশকো চুল, মুখের ভাব অতি প্রশান্ত। নারদ বললেন, “রক্ষোবৈদ্য মহাশয়, প্রণাম।”

মুখ তুলে ওদের দিকে তাকালেন তিনি। চোখদুটি উজ্জ্বল, ঠোঁটের কোণে হাসি। হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে প্রৌঢ় বললেন, “আরোগ্য। সব কুশল তো, সহকারী নিয়ামক মহোদয়?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। এই ছেলেটি আমাদের নতুন শিক্ষার্থী – অভী।”

অভী হাতজোড় করে নমস্কার করল। রক্ষোবৈদ্য হাসলেন; বললেন, “দেখি বৎস তোমার হাতের নিয়তিলাঙ্ঘনটি।”

অভী দু’হাত বাড়িয়ে দিল। রক্ষোবৈদ্য একটু চমকিত হয়ে বললেন, “দু’হাত নয়; যে হাতে চিহ্নটি আছে, সেইটি দেখতে দাও।”

অভীও বিস্মিতসুরে বলল, “আমার তো দু’হাতেই ওইরকম চিহ্ন আছে!”

“সে কী? দেখি, দেখি।”

তার দু’হাতের তালুর নীলচে গোল ছাপদুটো মন দিয়ে দেখলেন তিনি; তারপর নারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “কে এনেছে একে এই আয়তনে?”

সহকারী নিয়ামক নারদ একটু অবাক হয়ে বললেন, “সমরোত্তম মেঘবর্ণ। কেন বলুন তো, রক্ষোবৈদ্য? কোনো গোলমাল দেখছেন নাকি?”

রক্ষোবৈদ্য একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। সেই দেখে অভী-র বুক দূরদূর করতে লাগল। সে বলল, “আমি কি কিছু অন্যায় করে ফেলেছি, রক্ষোবৈদ্য মহোদয়?”

এবার তিনি হাসলেন। “না অভী, কোনো অন্যায় তুমি করেনি। আমি শুধু তোমার হাতের নিয়তিলাঞ্ছন দেখে অবাক হলাম। এ চিহ্ন সবার হাতে একটাই থাকে। কিন্তু তোমার হাতেই কেবল দেখছি দু’খানা। কিন্তু কেন, আমি জানি না। আর তোমার হাতের চিহ্নদুটি ভীষণ স্পষ্টও বটে।”

নারদ বললেন, “এর মানে কী?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “এত স্পষ্ট চিহ্ন সমরোত্তমদের হাত ছাড়া আর কোথাও দেখিনি, সহকারী নিয়ামক মহোদয়। আমার বুদ্ধিবিদ্যা যেটুকু, তার বলে আমি বলতে পারি, এই ছেলেটির দ্বারা আয়তন কোনো এক সময় দারুণভাবে প্রভাবিত হবে; আয়তনের ইতিহাসে অত্যন্ত স্মরণীয় কোনো কাজ এ করবে। তবে সে কাজ অতি ভালোও হতে পারে, বা অতি মন্দও হতে পারে। জানি না কেন, সেই প্রলয়যোদ্ধার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণীর কথাও মনে পড়ছে আমার। মেঘবর্ণ আজ সমরগরিমা আয়তনে সম্ভবত অজাস্তেই এক অদ্ভুত কাজ করে ফেলল একে নিয়ে এসে।”

অভীর কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। সবার মনোযোগের কেন্দ্রে এসে পড়া ব্যাপারটা তার মোটেই সহ্য হয় না। কাতরভাবে নারদের দিকে তাকাল সে।

নারদ বুঝতে পারলেন তার অবস্থা। মাথা নেড়ে তিনি বললেন, “স্বয়ং নিয়তির চিহ্ন যখন ওর হাতে এত স্পষ্টভাবে আছে, বড়ো কাজ তো ও করবেই। আমরা আশা করব, আমাদের আয়তনের শিক্ষার্থী হয়ে ও খুব ভালো কিছুই করবে। ...আচ্ছা, এবার আমরা বিদায় নেব, রক্ষোবৈদ্য। অভী পথশ্রমে ক্লান্ত। ওর বাসগৃহও প্রস্তুত।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “সমরগরিমা – যার নামে এই আয়তনের নাম, যার নামে এই জনপদের নাম – সেটি বড়ো বিচিত্র বস্তু, অভী। একদিন তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে। এসো আজ তোমরা। আরোগ্য।”

নমস্কার করে ওরা বেরিয়ে এল গ্রন্থাগার থেকে। নারদ বললেন, “উনি হলেন আমাদের চিকিৎসক – হেন কোনো রোগব্যাধি নেই, যার সম্বন্ধে উনি জানেন না, যা উনি নিরাময় করতে পারেন না।”

অভী বলল, “আমার প্রথমদিকে ওঁকে বেশ ভালোই লাগছিল, কিন্তু শেষে ওসব কী যে বললেন!”

হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেলেন নারদ; বললেন, “অভী, উনি মানুষ নন কিন্তু।”

“অ্যাঁ? মানুষ নন! তবে উনি কী?”

“রাক্ষস। তাও আবার সাধারণ কোনো রাক্ষস নন। উনি রাজপরিবারের

ছেলে ছিলেন। মাল্যপর্বতের বাসিন্দা ছিলেন একসময়।”

“কিন্তু তাহলে এখানে...?”

“সব রাক্ষস খারাপ হয় না অভী, যেমন সব মানুষ ভালো হয় না। মাল্যপর্বতে দুটো অভিজাত রাক্ষসজাতি আছে – পত্রতিলক আর বিমোহক। বিমোহকরা আমাদের মোটেই সহ্য করতে পারে না, সর্বদা যুদ্ধ করার সুযোগ খোঁজে। শর্বরের সবচেয়ে বড়ো সমর্থক ওরাই। পত্রতিলকরা ওখানে সংখ্যায় কম, কিন্তু তারা মারামারি চায় না – যদিও দরকার পড়লে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে তারাও ভালোই পারে। আমাদের রক্ষাবৈদ্য এই পত্রতিলক রাজবংশের সন্তান।”

হাঁটতে হাঁটতে মশালের আলোয় আরও অনেকগুলো বন্ধ দরজা পেরিয়ে যাচ্ছিল ওরা। অভী বলল, “উনি তাহলে এখানে এলেন কেন?”

“যে কারণে জ্ঞানতপস্বীরা এক দেশ থেকে যায় অন্য দেশে। রাক্ষসরা ওঁর অগাধ জ্ঞানকে ভয় পেত, ওঁকে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে বাধা দিত, কারণ অসুস্থের জাত দেখতেন না উনি; মানুষ হোক, রাক্ষস হোক, তার চিকিৎসা করতে চাইতেন। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ায়, বিমোহকরা ওঁর ওপর এমন খেপে যায় যে ওঁকে প্রাণের দায়েই চলে আসতে হয়েছে এখানে। আমাদের বড়ো উপকার হয়েছে উনি আসায়। রাক্ষসদের তুলনায় মানুষের শরীরে রোগজ্বালা বেশি হয়, জানো তো?”

অভী জানত না, তাও সে মাথা নাড়ল। তারপর কথাটা মনে পড়তে জিজ্ঞাসা করল, “সহকারী নিয়ামক মহাশয়, ‘অর্ধরাক্ষস’ বস্তুটা কী, একটু বলবেন?”

নারদ একটু হেসে বললেন, “কোথায় শুনলে কথাটা? ও, একটু আগে অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, না? ওরাও একরকম রাক্ষসই বটে, তবে মাল্যপর্বতের রাক্ষসরা ওদের বেশ নীচু নজরে দেখে – বলে, ‘মানুষের সঙ্গে থাকে, ওরা আবার রাক্ষস নাকি?’ পুরোপুরি রাক্ষস ওরা নয়; আচার-ব্যবহারে ফারাক আছে; আবার মানুষও ঠিক নয়।”

“তাহলে ওরা কী?”

“ওরা অর্ধরাক্ষস, এটাই ওদের পরিচয়। ওদের মধ্যে অনেকেই এই আয়তনের শিক্ষার্থী আছে; তাদের হাতে নিয়তিলাঞ্ছন ফুটে ওঠে। আবার অনেকে লুকিয়ে লুকিয়ে শর্বরকে সমর্থন করে, সে খবরও পাই আমরা। এই আয়তনের বাইরে সুদক্ষিণসারি বলে একটা জায়গা আছে, সেখানেই ওরা থাকে। আমার ব্যক্তিগতভাবে ওদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই, কিন্তু আমাদের এই সমরগরিমা আয়তনের নিয়ামক – আমার প্রভু – বিনীতেশ ওদের মোটেই সহ্য করতে পারেন না।”

নিয়ামক বিনীতেশ সম্বন্ধে সন্দীপের বলা কথাটা মনে পড়ে গেল অভীর; ঠোঁটের কোণে তার ফুটে উঠল একটু হাসি।

সম্ভবত সেটা লক্ষ করেই নারদ বললেন, “তুমি হয়তো এরই মধ্যে ওঁর নামে কিছু গুনে থাকবে। শিক্ষার্থীমহলে উনি মোটেই জনপ্রিয় নন। শুধু শিক্ষার্থী

কেন, এখানে মানুষ-রাক্ষস নির্বিশেষে কেউই ওঁকে পছন্দ করে বলে শুনি। হয়তো এসব কথা তোমাকে বলা আমার উচিত হচ্ছে না, তাও বলে রাখছি, ওঁর প্রিয় হতে না পারো, অপ্রিয় হয়ো না। অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ আমাদের নিয়ামক মহোদয়। যদিও সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধরের মুখের ওপর কিছু বলার সাহস উনি খুব একটা দেখান না, তাও সাবধান করে রাখছি।”

অভী বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর ওঁর ব্যাপারে সম্মেলন কক্ষে একটু আভাস দিয়েছিলেন তখন।”

নারদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “অযোগ্যের হাতে শাসনভার যে কী বিষম বস্তু, সে আর কী বলি তোমায়! জেনে রেখো অভী, দুষ্টের শাসন তবু ভালো, কিন্তু মূর্খের শাসন ভালো না। ...যাক, এসব কথা কাউকে বোলো না। এসো, এই ঘরটা তোমাকে দেখাই।”

আর একটা দরজার সামনে ওরা এসে থামল। নারদ বললেন, “এটায় আমরা ভেতরে ঢুকব না, শুধু দরজার সামনে থেকে দেখে চলে যাব। এটা সংগ্রহশালা – এই আয়তনের সবচেয়ে মূল্যবান জায়গা। পরে সমরোত্তমরা তোমাদের নিয়ে আবার আসবেন এখানে। সমরগরিমা আয়তনের প্রাণ বলতে পারো এই ঘরটিকে।” – একটা চাবি দিয়ে দরজা খুললেন তিনি। অভী খেয়াল করে দেখল, শুধু হাতের স্পর্শে এই দরজাটা খোলে না।

ঘরের মধ্যে ঠিক কী আছে, অভী বুঝতে পারল না। দেয়ালে বেশ কিছু বাঁধানো ছবি ঝুলছে। ঘরের মাঝখানে সারি সারি রাখা আছে বিশাল আকারের সব কাচের বাক্স। এই ঘরটা গ্রন্থাগারের চেয়েও বড়ো, তবে আলো বেশি নেই এখানে। দ্বারের সামনে একটি মাত্র মশাল জ্বলছে, তার আলোয় এত বড়ো কক্ষের ভেতরটা ভালো করে দেখাই যায় না। বড়ো বড়ো থাম ভেতরে। এত বড়ো জায়গাটা যে শেষ কোথায় বোঝা যাচ্ছে না অল্প আলোয়।

অভী বলল, “কীসের সংগ্রহশালা এটা? ওই বাক্সগুলোয় কী আছে?”

নারদ বললেন, “আয়তন যখন যুদ্ধবিদ্যা শেখায়, তখন যোদ্ধাদের ব্যবহার করা জিনিসই থাকবে নিশ্চয়ই। কিন্তু কারা এই যোদ্ধা, আর জিনিসগুলি কী, সেসব পরে জানবে। আপাতত চলো, তোমাকে তোমার থাকার জায়গায় পৌঁছে দিই।”

অভী মাথা নেড়ে দরজার সামনে থেকে সরে এল। দরজা বন্ধ করে ওরা বেরিয়ে এল খোলা মাঠে। নারদ বললেন, “মিত্রভবনের কর্ত্তী শ্রীমতী লতিকা মিত্র মানুষ হিসেবে খুবই ভালো। তোমার সুবিধাই হল এইরকম গৃহকর্ত্তী পেয়ে।”

অভী ভয়ে ভয়ে বলল, “আরও দুটো মেয়ে আছে না ওখানে?”

নারদ হেসে বললেন, “হ্যাঁ, লীনা আছে ওখানে – মানুষের মেয়ে। ভালো অসিযোদ্ধা একজন; ধনুর্বেদেও দক্ষতা আছে। সমরোত্তম শ্যামশ্রী এনেছিলেন ওকে। আর আছে একটি অর্ধরাক্ষস মেয়ে – নিধি। ওকে এনেছিলেন সমরোত্তম মেঘবর্ণ। মায়াযুদ্ধে মেয়েটার ভালো জ্ঞান আছে। অর্ধরাক্ষস ও – মায়াযুদ্ধ ব্যাপারটা ওদের সহজেই আসে। আমাদের নিয়ামক ওকে পছন্দ করেন না

খুব একটা – কোনো অর্ধরাক্ষসকেই করেন না। কিন্তু সমরোত্তম মেঘবর্ণ যাকে আয়তনে আনবেন, তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস নিয়ামক বিনীতেশের নেই। সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধরও কথায় পেরে ওঠেন না সমরোত্তম মেঘবর্ণের সঙ্গে।”

অভীর মনে পড়ে গেল, কিছুক্ষণ আগেই দিব্যি একটা নিয়মের ফাঁক দেখিয়ে মেঘবর্ণ কীভাবে তার সম্মেলন কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সে বলল, “সমরোত্তম মেঘবর্ণ খুব বুদ্ধিমান লোক।”

নারদ আবার হাসলেন। “বুদ্ধিমান এখানে সবাই, অভী। শুধু কে কার বুদ্ধিকে টেক্কা দিতে পারল, সেটাই আসল কথা। তবে হ্যাঁ, সমরোত্তম মেঘবর্ণ অর্ধরাক্ষসদের কাছেও খুবই জনপ্রিয়। এই আয়তনের অন্যান্যদের তুলনায় সুদক্ষিণসারিতে ওঁর খাতির একটু বেশিই।”

প্রায়াক্ষকার মাঠের মধ্য দিয়ে আনমনে চলছিল অভী। আজ শুক্লা ত্রয়োদশী – চাঁদটাকে লাগছে একটা রূপালি থালার মতো। মৃদুমন্দ হাওয়ায় শরীরের ক্লান্তি যেন অনেকটাই কেটে যাচ্ছে।

কিন্তু ওটা কী আসছে এদিকে? কী বিশাল, ছুটন্ত একটা...

“সাবধান, অভী!” – সহকারী নিয়ামক নারদের সাবধানবাণীটার মর্মার্থ বুঝে ওঠার আগেই সেই বিশাল জিনিসটার সঙ্গে ধাক্কা খেল অভী। বা, জিনিসটা ইচ্ছা করে এসে তাকে ধাক্কা মারল বলাই ভালো। ছিটকে পড়ল সে একহাত দূরে।

দানবাকৃতি লোকটা গর্জন করে বলে উঠল, “অন্ধ নাকি রে তুই, হতভাগা? নাকি নিজেকে এত বড়ো মনে করিস যে সামনে কে আসছে তার পরোয়া করিস না?”

চট্ করে মাথাটা গরম হয়ে গেল অভীর। একে তো দানবটা ইচ্ছে করেই তাকে ধাক্কা দিয়েছে, তার ওপর আবার উলটোপালটা কথা বলছে। ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, “নিজেকে বড়ো আমি মনে করি না, তুমি করো। তাই সামনে কে আসছে, দেখতে পাও না। রক্ষাবৈদ্যের কাছে চোখটা একবার দেখিয়ে নিয়ো বরং।”

সহকারী নিয়ামক নারদ পরিস্থিতি ঠান্ডা করতে ব্যস্তভাবে বললেন, “আরে আরে, তোমরা রেগে যাচ্ছ কেন? পর্বত, শান্ত হও। ছেলেটা আজই একটু আগে আয়তনে এসেছে। নতুন তো, তাই তোমাকে চেনে না এখনও।”

দানবটার নাম পর্বত! অভীর হাসি পেল। খাসা নাম বটে!

পর্বত একগাল হেসে বলল, “অ, তাই বুঝি? আগে বললেই হত। তাহলে আলাপ করা যাক। খোকা, আমার নাম পর্বত, কিন্তু লোকে আদর করে বলে ‘কচি পর্বত’। ঝগড়াঝাঁটি ভুলে যাও; আমরা সবাই সমরগরিমার লোক। বন্ধু-বন্ধু, ঠিক আছে? এসো, হাত মেলাও।”

অভী হাত বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে শূন্যে তুলে ফেলল পর্বত। নারদ চিৎকার করে বললেন, “ওকে ছেড়ে দাও, পর্বত! এঙ্কুনি! সমরোত্তম মেঘবর্ণ ওকে এনেছেন।”

“মেঘবর্ণ? ও তো আমার বন্ধুলোক। ছেড়ে দেব তো নিশ্চয়ই। খোকা, আগে বলো ‘দয়া করো’।”

তার পা ধরে উলটো করে ঝুলিয়ে দিল পর্বত। অন্তত দশ ফুট তো হবেই দানবটার উচ্চতা। অভীর মাথা ঘুরতে লাগল।

তার চোখের সামনে চাঁদ, গাছপালা, নারদ, সমরগরিমা আয়তন – সব উলটো লাগছে। সে বুঝতে পারল, তার হাতের তালু ঠান্ডা হয়ে আসছে। রাগে যেন সর্বাঙ্গ ফেটে পড়তে চাইছে।

নারদ আবেদনের সুরে বললেন, “অভী, একবার ‘দয়া করো’ বলে দাও। পর্বত ভালো লোক, শুধু রসবোধটা একটু অন্যরকম ওর। অনেক নতুন শিক্ষার্থীর সঙ্গেই ও এইরকম মজা করে। একবার শুধু ‘দয়া করো’ বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও।”

উলটো হয়ে ঝুলতে ঝুলতেই অভী গর্জন করে বলল, “চুলোয় যাক ‘দয়া করো’। তোমাকে আমি খুন করব, পর্বত!”

হা হা করে হাসতে লাগল পর্বত। “আমাকে খুন করবে তুমি? সত্যি?”

সাবধানে তাকে আবার মাটিতে নামিয়ে দিল সে। এবার তার চোখে প্রশংসার দৃষ্টি। “তোমার সাহসের তারিফ না করে পারছি না খোকা। এর আগে যতজনের সঙ্গে এই মজাটা করেছি, সবাই ‘দয়া করো’ বলেছে। আজ থেকে আমরা সত্যিকারের বন্ধু, কেমন? সহকারী নিয়ামক নারদ, এবার সমরোত্তম মেঘবর্ণ সত্যিই উত্তম একজন শিক্ষার্থীকে আয়তনে এনেছে। এ ছেলের ভেতর খাঁটি সমরগরিমা আছে। সমরোত্তমরা তো এই জিনিসই অর্জন করতে শেখায়। আমি খুব খুশি হলাম, খোকা। আমাকে ‘পর্বতদা’ বলে ডাকতে পারো। সব শিক্ষার্থী তাই বলে।”

অভী এবার লজ্জা পেল। হাতের ঠান্ডাভাবটা কেটে গেছে। সে আবার হাত বাড়িয়ে দিল। “আমিও খুশি হলাম, পর্বতদা। আমার নাম অভী।” – দুজনে করমর্দন করল।

চাঁদের আলোয় পর্বত তার মুখটা খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল, “আমরা রাক্ষসরা কোনো মানুষকে দেখলে তার সম্বন্ধে দু’একটা কথা বুঝতে পারি। আমি দেখতে পাচ্ছি, জীবনে খুব বড়ো কোনো কাজ করবে তুমি, অভী। অনেক বিপদও অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্য। তবে বড়ো কাজ তোমার দ্বারা হবেই, আমি নিশ্চিত।”

অবাক হয়ে নারদের দিকে তাকাল সে। দেখল, উনিও তাকিয়ে আছেন তার দিকে – মুখে বিস্ময়ের ছাপ স্পষ্ট।

একটু আগেই রক্ষোবৈদ্যও এইরকমই একটা কথা বলছিলেন না?

পর্বত বলে চলল, “আমি আরও দেখতে পাচ্ছি, আকাশলোকের ঐশিকদের সঙ্গে একদিন তোমার মুখোমুখি দেখা হবে। তোমার কপালে সেই দেবসাক্ষাতের চিহ্ন আছে। যখন তোমার সঙ্গে ওঁদের কারও দেখা হবে, আমার হয়ে ওঁদের একটা অনুরোধ করবে?”

অভী অবাক হল। ঐশিক কারা, সে জানেই না। আভাসে শুধু এইটুকু

বুঝেছে, তাঁরা দেবতা-টোবতা জাতীয় কিছু একটা হবেন। তাঁদের কাছে আবার কী অনুরোধ করবে সে?

তবু সে বলল, “বলো।”

“তুমি একটু আগে বললে না, আমাকে তুমি খুন করবে? শুধু ওইটুকু অনুরোধই কোরো ওঁদের। বোলো, আমি মরতে চাই; ওঁরা যেন এবার আমাকে মৃত্যু দেন। ...চলি, পরে কথা হবে আবার।”

বিশালদেহী রাক্ষস পর্বত ধীরগতিতে চলে গেল আয়তনের দিকে। অভী নারদকে বলল, “এটা কীরকম কথা হল?”

নারদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “পর্বত বিমোহকজাতির রাক্ষস ছিল। একদিন ও এমন কিছু একটা অপরাধ করে বসল, যার জন্য মাল্যপর্বতের এক শক্তিশালী মায়াধর ক্রুদ্ধ হয়ে ওকে অমরত্বের অভিশাপ দিয়েছিলেন। নিজের জীবনের প্রতি ওর কোনো মায়া নেই। অনেকবার আত্মহত্যাও করতে চেয়েছে ও, কিন্তু মরতে পারেনি ওই অভিশাপের কারণে। নিজেদের সমাজ থেকেও ও বিতাড়িত। সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর ওকে আশ্রয় দিয়েছেন এই আয়তনে। মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি – এইসব ও শেখায় আগ্রহী ছাত্রদের। তবে নিযুদ্ধ শিখতে কেউই খুব একটা চায় না – এখানের ছেলেমেয়েদের বেশি ঝোঁক অসিযুদ্ধ আর ধনুর্বাণ চালনায়।”

হঠাৎ করেই পর্বতের জন্য মনখারাপ লাগল অভীর। কত যন্ত্রণা পেলে একজন এত ব্যাকুলভাবে মরতে চায়?

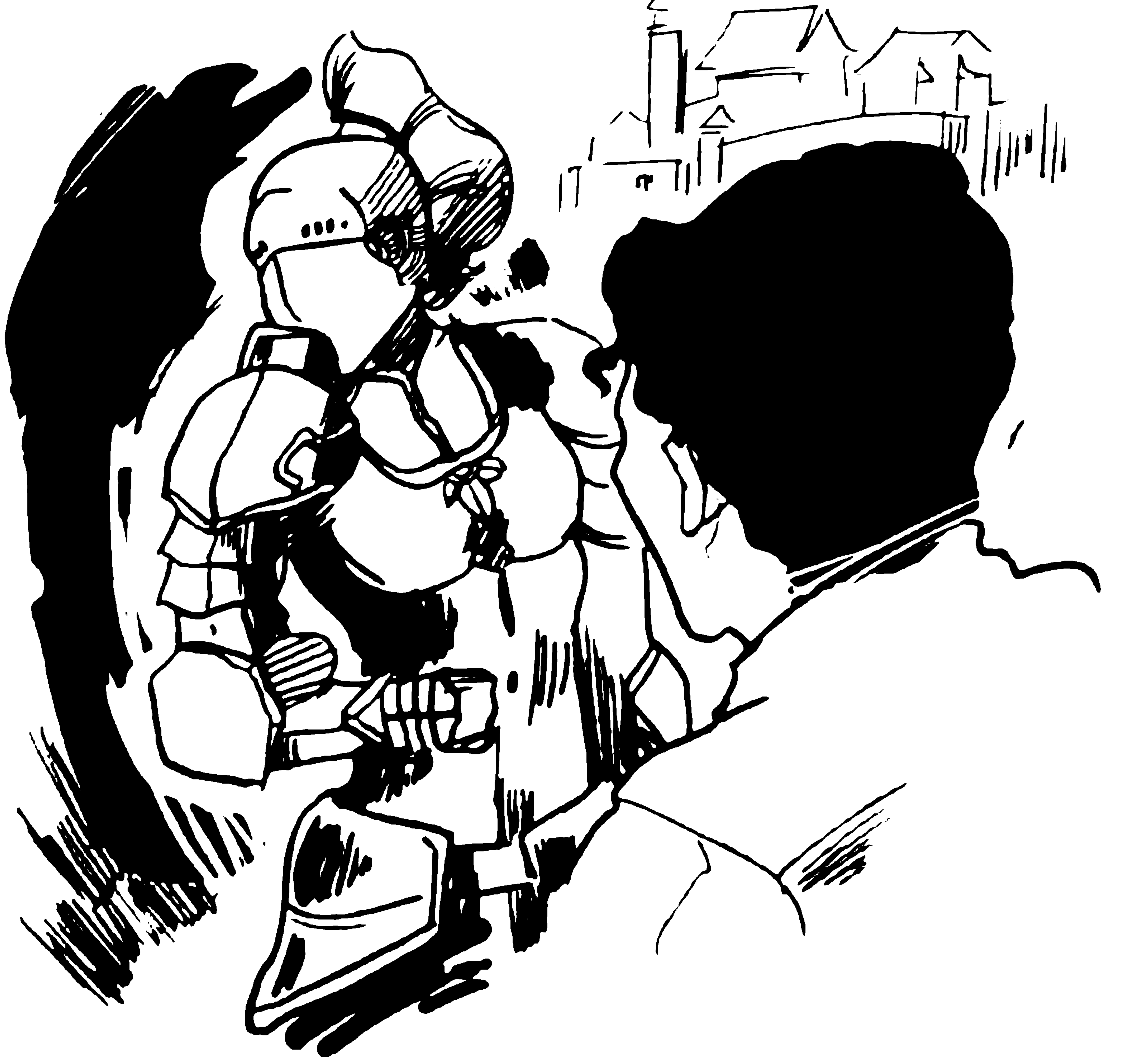
সে বলল, “কী করেছিল ও?”

“আমি জানি না, অভী। সম্ভবত শুধু সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধরই জানেন সে-কথা। কিন্তু ওসব থাক। রাত হয়ে যাচ্ছে, চলো তোমাকে মিত্রভবনে নিয়ে যাই। গৃহস্থামিনী অপেক্ষা করছেন।”

তারপর একটু থেমে মুচকি হেসে বললেন, “আর নতুন বান্ধবীরাও নিশ্চয়ই তোমার অপেক্ষাতেই আছে।”

অভী হাসল। চাঁদ উঠে এসেছে অনেকটা ওপরে। হঠাৎ তার মনে হল, “আচ্ছা, রবিকাকা এখন কী করছে? আমার কথা ভাবছে নিশ্চয়ই।”

তার খুব মনকেমন করে উঠল।



।। পঞ্চম অধ্যায় ।।

বান্ধবী

মিত্রভবনের কতী শ্রীমতী মিত্র ওদের জন্য গৃহদ্বারে অপেক্ষা করছিলেন।
অভীকে দেখেই চিবুকে আঙুল ছুঁয়ে চুমু খেলেন তিনি।

“তোমার নাম অভী তো? এসো বাবা, এসো।”

মাতৃসমা কারও আদর পাওয়ার সৌভাগ্য অভী-র এ-জীবনে হয়নি কখনও।
এই অপরিচিতা প্রৌড়ার এই আন্তরিকতাটি অতি সুমিষ্ট লাগল তার। পায়ে হাত
দিয়ে তাঁকে প্রণাম করল সে।

“আহা, থাক থাক। লক্ষ্মী ছেলে। ...সহকারী নিয়ামক মহোদয়, আপনিও
দয়া করে পদধূলি দিন দীনকুটিরে।”

নারদ হাসলেন। “শ্রীমতী মিত্র, আপনি ‘দীন’?”

শ্রীমতী মিত্র-ও হাসলেন। “আপনাদের তুলনায় আমি দীন বইকি। আসুন।”

অভীর পেছন পেছন নারদও ঢুকলেন ভেতরে। “হ্যাঁ, অভীকে তার নতুন
বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব।”

মিত্রভবনের কক্ষগুলি রীতিমতো বড়ো এবং উন্মুক্ত জানালাগুলি দিয়ে
বেশ ভালোরকম টাটকা হাওয়া আসছে। আশা করা যায়, দিনের বেলা এইসব
জানালা দিয়ে পর্যাপ্ত আলোও আসবে। কক্ষের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে।
সেই আলোয় শ্রীমতী মিত্রকে একবার দেখে নিল অভী।

পঞ্চাশ-পঞ্চাশ বয়স তো হবেই মহিলার। একটু মোটাসোটা চেহারা, মুখে
হাসিটি লেগেই আছে। ঠোঁটের ওপরে কিছু লোম এতটাই বড়ো যে হঠাৎ

দেখলে গোঁফ বলে মনে হয়। গলায় এই মোটা সোনার হার, হাতে সোনার বালা, দু'হাত মিলে গোটা পাঁচেক আংটি।

তিনি বললেন, “এসো অভী, এদিকের ঘরটা তোমার।”

পাশাপাশি দুটো দরজা, তাদের সামনে একটা প্রশস্ত বারান্দা, সেখানে বসার ব্যবস্থা আছে। একদম বামদিকের কক্ষটি অভীর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল সে।

এত বড়ো ঘর – তার একার জন্য!

তার অবাক চোখের দৃষ্টি দেখে শ্রীমতী মিত্র বললেন, “হ্যাঁ, আপাতত এখানেই থাকবে তুমি। একাই থাকবে, যদি না সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর আর কাউকে পাঠান এ-ঘরে থাকার জন্য। এই পাশের ঘরটাতে থাকে দুটি মেয়ে – নিধি আর লীনা। তুমি তোমার ঘর দেখে নাও, তারপর ওদের সঙ্গে আলাপ হবে।”

জানালার পাশেই তার বিছানা; কক্ষের এক কোণে একটি ছোটো বই রাখার তাক। নারদ বললেন, “গ্রন্থাগার থেকে বই এনে পড়তে পারো। এক সপ্তাহে পাঁচটির বেশি পাবে না অবশ্য।”

শ্রীমতী মিত্র অভীর দিকে ফিরে বললেন, “কেমন লাগছে সমরগরিমা, অভী?”

অভী বলল, “মাথা ঘুরে যাচ্ছে।”

নারদ আর শ্রীমতী মিত্র দু'জনেই হাসলেন। নারদ বললেন, “সে অস্বাভাবিক নয়। সব কিছুই নতুন নতুন দেখছ তো। দু'দিনেই সয়ে যাবে।”

শ্রীমতী মিত্র বললেন, “সমরোত্তমদের তো দেখলে। কাকে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগল?”

এ আবার কী অদ্ভুত প্রশ্ন! অস্বস্তি লাগল, কিন্তু অভী সত্যি কথাই বলল। “সমরোত্তম শ্যামশ্রীর সঙ্গে বেশি কথা তো হয়নি, তাই উনি কেমন মানুষ, বুঝতে পারিনি। আর অধিনায়ক বজ্রধরকে বেশ কড়াধরনের লোক বলেই মনে হল। কেমন যেন ভয় ভয় লাগছিল ওঁকে দেখে। তবে সমরোত্তম মেঘবর্ণ খুব ভালো – খুব সহজে মিশতে পারেন উনি।”

শ্রীমতী মিত্র বললেন, “এই আয়তনের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী এই কথাই বলে। সমরোত্তম মেঘবর্ণ যেমন ভালো যোদ্ধা, তেমনই ভালো মানুষ। ওঁকে ভালোবাসে না, এমন লোক এখানে পাওয়া ভার।”

নারদ বললেন, “এমন লোক আছে তো। আমাদের নিয়ামক প্রভু বিনীতেশকে বলে দেখবেন মেঘবর্ণের নাম, আর তারপর শুধু মজাটা দেখবেন।”

শ্রীমতী মিত্র কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, “আঃ সহকারী নিয়ামক মহোদয়, কতবার বলেছি, আমার সামনে ওসব বিপজ্জনক রাজনৈতিক কথা বলবেন না! আর অভী নতুন এসেছে – ও কী ভাববে?”

“ওকে তো এখানেই থাকতে হবে, শ্রীমতী মিত্র। ও তো সব কিছুই জানবে। আগাম সাবধান থাকতে ক্ষতি কী?”

শ্রীমতী মিত্র বললেন, “থাক এখন এসব কথা। হাজার হোক, এই

সমরগরিমার নিয়ামক তো তিনিই। আর দোষে-গুনে মিলেই তো মানুষ হয়। আমাদের নিজেদের মধ্যেও কি আর দোষ কিছু নেই? ...দাঁড়াও অতী, লীনা কে ডাকি।”

পাশের বন্ধ দরজায় টোকা দেওয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দরজা খুলে উঁকি মারল একটি মেয়ে – বয়সে অতীর মতোই, রোগাপাতলা গড়ন। শ্রীমতী মিত্র বললেন, “লীনা, ভেতরে আসব?”

“আসুন, আসুন।” লীনা দরজা খুলে দিল পুরোপুরি। “ও, সহকারী নিয়ামক মহোদয়ও আছেন! আসুন আপনারা।”

তারপর তার চোখ পড়ল অতীর ওপর – জুদুটো একবার ওপরের দিকে উঠে গেল তার। “নতুন শিক্ষার্থী?”

অতী ঢোক গিলে মাথা নাড়ল। লীনা হেসে বলল, “এসো।”

এই কক্ষটি অতীর কক্ষের চেয়েও কিছুটা বড়ো – এখানেও বইয়ের তাক আছে, তাতে বেশ কিছু বইও রাখা আছে। জানালার পাশেই একটি শয্যা আর তার থেকে কয়েক হাত দূরে আর একটি শয্যা পাতা আছে খাটের ওপর। দেয়ালে টাঙানো আছে আছে তিরপূর্ণ তূণীর এবং চর্মকোষে তলোয়ার। পাশে ঢালও ঝুলছে। আর আছে একটি বিশাল আয়না। তাকে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লীনা মুচকি হেসে বলল, “দু’দুটো মেয়ে থাকে এ-ঘরে, বুঝলে নতুন ছেলে? একটা ভালো আয়না ছাড়া চলে কখনও?”

শ্রীমতী মিত্র বললেন, “আঃ লীনা! এই এসেছে বেচারি; এখনই পেছনে লেগো না ওর। ...নিধি কোথায়?”

অতীও মনে মনে দেখতে চাইছিল তাকে। ‘অর্ধরাক্ষস’ বস্তুটি যে ঠিক কীরকম, স্বচক্ষে না দেখা অবধি শাস্তি হচ্ছে না যেন।

লীনা বলল, “সে তো বেরিয়েছে সেই বিকেলে। ...এই তো, সহকারী নিয়ামক নারদ মহোদয় – আপনার কাছেই যাবে বলে বেরিয়েছে সে অনেকক্ষণ হল। দেখা হয়নি ওর সঙ্গে?”

নারদ কপাল চাপড়ে বললেন, “হায় হায়! ও বলেছিল আমার কার্যালয়ে দেখা করতে আসবে – আমি একদম ভুলে গেছি সে-কথা। সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর জরুরি সম্মেলনে সবাইকে ডাকলেন, মেঘবর্ণের দেরি হচ্ছে দেখে ওঁর খোঁজে সিংহদরজার কাছে গেলাম, তারপর সম্মেলন, তারপর অতীকে এখানে আনা – উফ্! দেখেছ? এতসব কাণ্ডকারখানার মাঝে ভুলেই গেছি, ও আসবে বলেছিল। কী জেদি মেয়ে! এখনও ফেরেনি মানে কার্যালয়েই বসে আছে নির্ঘাৎ। না না, তোমরা গল্প করো। আমি যাই, দেখা করি ওর সঙ্গে। নিশ্চয়ই জরুরি কোনো দরকার আছে।”

নারদ তাড়াহড়ো করে বেরিয়ে গেলেন।

সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে শ্রীমতী মিত্র বললেন, “এত ওপরতলার লোকের সঙ্গে আমাদের নিধির আবার কী এমন জরুরি দরকার পড়ল? লীনা, কিছু জানো?”

লীনা মাথা নেড়ে বলল, “না, মিত্রমাসি। নিধি একটু অন্যরকম, জানেনই

তো। সব কথা ও আমাকেও বলে না।”

শ্রীমতী মিত্র বললেন, “অভী, আমাকে শিক্ষার্থীরা সবাই ‘মিত্রমাসি’ বলে; তুমিও তাই বোলো। লীনা, তোমরা গল্প করো; আমি দেখি ওরা রান্নাবান্না কতদূর করল।”

তিনি বেরিয়ে গেলেন। অভী বলল, “‘ওরা’ মানে কারা?”

লীনা বলল, “রাঁধুনিরা। মিত্রমাসি এত বড়োলোক, নিজের কোনো কাজ ওঁকে করতে হয় না। চারজন রাঁধুনি আছে এ-বাড়িতে, সাতজন কাজের লোক।”

অভী হাঁ করে রইল। এরকম বিলাসবহুল জীবনযাপনের কথা সে কল্পনাও করেনি কোনোদিন।

লীনা বলল, “দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো এখানে।”

তার বিছানার ওপর হাত রেখে বসতে ইশারা করল সে।

অভী সসংকোচে বসল। লীনা বলল, “চাইলে পা তুলে বসতে পারো। আমার কোনো আপত্তি নেই।”

অভী বলল, “না না, ঠিক আছে।”

লীনা হাসল। “আরে, এত লজ্জা পেলে তো তোমার জন্য ঘোমটার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে যুদ্ধ করবে কী করে?”

অভী বলল, “তুমি যুদ্ধ করেছ কখনও?”

লীনা মাথা নাড়ল। “আসল যুদ্ধ? নাঃ, সে সৌভাগ্য হয়নি কখনও। তবে অনুশীলন করতে হয় রোজ। সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর আমার ধনুর্বিদ্যার প্রশংসা করেছিলেন একবার, জানো?”

“তাই?” অভী দেখল, বজ্রধরের প্রশংসার কথা বলতে গিয়ে মেয়েটার চোখ যেন জ্বলজ্বল করছে।

“হ্যাঁ। ভাবতে পারো, স্বয়ং অধিনায়ক – যিনি আবার ছিলেন স্বয়ং ঐশিকশ্রেষ্ঠের ছাত্র – দেবতাদের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন যিনি- সেই মানুষ আমার শরনিষ্ক্ষেপের প্রশংসা করছেন! সেদিন মনে হয়েছিল, আমার সমরগরিমা আয়তনে আসা সার্থক হয়েছে।”

“দেবতাদের কাছে মানে?”

“মানে ঐশিকদের কাছে। সাধারণ মানুষ যেসব দেবতার পূজা করে, এঁরা কিন্তু তাঁরা নন। আমাদের পূর্বপুরুষরা যাঁদের উপাসনা করতেন, সেইসব দেবতাদের যুগ কেটে গেছে। এখন যাঁরা আছেন, তাঁরা ঐশিক নামে পরিচিত। সেই আদিযুগের পৌরাণিক দেবতাদের মতো অত শক্তিশালী তাঁরা নন, কিন্তু আমাদের তুলনায় তাঁরা বিশাল তো বটেই। তাঁরা থাকেন আকাশলোকে। তাঁদের মধ্যে আমরা যাঁকে শ্রেষ্ঠ মানি, তিনি ছিলেন এই নতুন দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধের দেবতা। এই সমরগরিমা আয়তন তাঁরই প্রতিষ্ঠা করা। অধিনায়ক বজ্রধর ছিলেন তাঁর প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী।”

“আর বাকিরা? মানে অন্য দু’জন সমরোত্তম?”

“শ্যামশ্রী সম্ভবত বজ্রধরের ছাত্রী ছিলেন – একমাত্র মহিলা সমরোত্তম

উনি। তবে মেঘবর্ণও শিক্ষা নিয়েছেন ঐশিকশ্রেষ্ঠের কাছে। আরও দু'জন সমরোস্তুম নাকি একসময় ছিলেন এই আয়তনে; আজ আর তাঁরা নেই। তাঁদের একজনের গল্প সবাই খুব গর্ব করে বলে, আর অন্যজনের..."

“অন্যজনের?”

“তাঁর কথা কেউ বলতে চায় না।”

“কেন?”

“জানি না। যাক গে, বাদ দাও ওসব। ইতিহাসচর্চার অনেক সময় তুমি পরে পাবে। ...বলি, মেয়েদের এত ভয় পাও কেন শুনি?”

“আঁ? কই, না তো!”

“একদম এড়ানোর চেষ্টা করবে না। এসে পর্যন্ত বারবার ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে, কেমন একটা জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে! বলি, ব্যাপারটা কী? বাড়িতে মায়ের কাছেও এইরকম ক্যাবলাকাস্ত হয়েই থাকতে?”

“আমার মা নেই।”

লীনার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। শুকনো মুখে সে বলল, “কিছু মনে কোরো না। আমি...”

অভী হেসে বলল, “ঠিক আছে। মাকে আমার মনে পড়ে না। বাবাকেও না। দু'জনেই চলে গেছে আমার ছোটবেলাতেই। আছে শুধু কাকা - খুব ভালোবাসে আমাকে। সে-ই আমার সব।”

লীনা বলল, “বাবা আমারও নেই; আমার যখন দু'বছর বয়স, তখনই মারা গেছে সে। আমাদের বাড়ি কাছেই - মানবমন্দির এলাকায়। এর পর যেদিন বাড়ি যাওয়ার ছুটি পাব, নিয়ে যাব তোমাকে। মা আছে বাড়িতে - তোমাকে দেখলে খুশি হবে। তবে হ্যাঁ, ভালোমন্দ কিছু খাওয়াতে পারব না, এখন থেকেই বলে রাখছি। আমরা খুব গরিব, জানো?”

অভী বলল, “গরিব তো আমরাও। আজ তরুণ বলে একটা ছেলে তো সম্মেলন কক্ষে আমাকে আবর্জনা-টাবর্জনাও বলে দিল।”

লীনা বলল, “হ্যাঁ, কয়েকটা আছে এখানে ওরকম। ওরা আমাকে নিয়েও প্রথম প্রথম আজোবাজে কথা বলত। এখন আমার অঙ্গচালনা দেখার পর কেউ আর কিছু বলতে সাহস পায় না। তুমিও তোমার অঙ্গদক্ষতা সবার সামনে প্রমাণ করে দাও। সবকটার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।”

অভী চুপ করে রইল। অঙ্গদক্ষতা কী করে দেখাবে সে? রবিকাকার লাঠিটার চেয়ে বড়ো কোনো অস্ত্র তো আজ পর্যন্ত সে হাতে নিয়েই দেখেনি।

লীনা আবার বলল, “মায়ের থেকে মেয়ে দূরে গেলে মায়েরা কাঁদে। আমার হাতে নিয়তিলাঞ্ছন স্পষ্ট হওয়ার পর সমরোস্তুম শ্যামশ্রী যখন আমাকে নিতে গেলেন, আমার মা-ও কেঁদেছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে মা খুশিও হয়েছিল; সমরোস্তুম শ্যামশ্রীর হাত ধরে মা বলেছিল, ‘ও যে আপনাদের ওখানে পেটভরে দুটো খেতে পাবে, এতেই আমি খুশি।’ প্রথম প্রথম মিত্রমাসির বাড়ির ভালো ভালো খাবার আমার গলা দিয়ে নামতে চাইত না, জানো? খালি মনে হত, মা হয়তো আজ রান্নাও করেনি। এখন অবশ্য অভ্যাস হয়ে গেছে। খেতেই হয়; না খেলে

যুদ্ধ করার মতো জোর পাব কোথায়?”

অভী কিছু বলল না, কিন্তু মেয়েটির এই হার না-মানা, অকপট মনোভাব তার ভালো লাগল।

সে বলল, “আর একজন – যে এখানে থাকে তোমার সঙ্গে – সেই মেয়েটি কেমন?”

“নিধি? খুব ভালো মেয়ে, তবে একটু খাপাটে গোছের আচরণ করে ও মাঝেমধ্যে। অর্ধরাক্ষস তো ও; তাই কিছু কিছু অভ্যাস আমার সঙ্গে মেলে না। একদিন ওকে টিকটিকি ধরে খেতে দেখে আমার গা গুলিয়ে উঠেছিল।”

চক্ষু বিস্ফারিত করে অভী বলল, “আঁ? বলো কী? টিকটিকি?”

“হ্যাঁ। বললাম না, ওদের সব অভ্যাস, সব রীতিনীতি আমরা মানুষরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। টিকটিকি খেয়ে তার হাড়গুলো জানালার পাশে রাখাটা নাকি ওদের সমাজে খুব শুভ মনে করে। প্রথম প্রথম এই নিয়ে ওর সঙ্গে আমার একটু-আধটু তর্কাতর্কি হয়নি, তা নয়। একই ঘরে থাকি – একটু গা-ঘিনঘিন করত। কিন্তু শেষপর্যন্ত মানিয়ে নিয়েছি। যতই ‘অন্যরকম’ হোক, মেয়েটার মনটা ভালো।”

অভী মাথা নাড়ল। ভালো হলেই ভালো। এই অর্ধরাক্ষস মেয়েটির সঙ্গে তাকেও কাটাতে হবে এক ছাদের তলায়। সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়াই মঙ্গল।

লীনা বলল, “খুব ভালো রূপান্তর জানে ও। অর্ধরাক্ষস বা রাক্ষসদের অনেকেই এ বিদ্যায় দক্ষ হয়, জানো নিশ্চয়ই।”

অভী বলল, “না, জানি না। জিনিসটা কী?”

“অন্যের রূপধারণ। আমাদের ঐশিকশ্রেষ্ঠও অসাধারণ রূপান্তর করতে পারেন, শুনেছি। তবে রূপান্তরিত মানুষ বা রাক্ষসকে চেনার উপায়ও আছে। সে বিষয়গুলো জানতে হলে মন দিয়ে সমরোত্তম শ্যামশ্রীর কথা শুনতে হবে।”

দরজা খোলাই ছিল – নিধি এসে ঢুকল ভেতরে।

তার চেহারা বেশ শক্তপোক্ত – লম্বায় লীনার চেয়ে অনেকটাই বেশি – প্রায় অভীর সমানই হবে। মাথার পেছনে লালচে চুলগুলো বাঁধা আছে খোঁপা করে। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে রাগ-বিরক্তি। কক্ষে এসেই তার নজর পড়ল অভীর দিকে – জুঁকুঁচকে গেল তার।

লীনা বলল, “নিধি, এ আমাদের নতুন শিক্ষার্থী, অভী। সমরোত্তম মেঘবর্ণ এনেছেন একে – তোমারই মতো।”

নিধি গম্ভীর গলায় বলল, “হুঁ। মিত্রমাসির কাছে শুনলাম।”

‘অর্ধরাক্ষস’ দেখে অভী একটু হতাশ হয়েছিল। এ তো দেখতে শুনতে একেবারেই মানুষের মতো – কোনো তফাত নেই।

লীনা বলল, “ব্যাপার কী বলো তো? এতক্ষণ ছিলে কোথায়?”

নিধি বলল, “আমি সহকারী নিয়ামককে বলে রেখেছিলাম, বিকেলে আমি তাঁর কার্যালয়ে যাব। গিয়ে দেখি, উনি নেই। ওঁর সহকারী বলল, উনি জরুরি সম্মেলনে গেছেন – ফিরতে দেরি হবে। আমারও রোখ চেপে গেল। দেরি হয়

তো হোক - কথাটা ওঁকে না বলে ফিরব না। সেই তখন থেকে বসে আছি তো বসেই আছি। এই এতক্ষণে ফিরলেন উনি।”

লীনা বলল, “কী এমন জরুরি কথা তোমার যে ওঁকে না জানালেই নয়?”

নিধি মিটিমিটি হাসল। “হঁ হঁ, সেসব বলা বারণ। সমরগরিমার সুরক্ষাসংক্রান্ত গোপন ব্যাপার।”

বোঝাই গেল, সে এ-বিষয়ে আর মুখ খুলবে না। লীনা বলল, “না বললে ব্যেই গেল! যাক গে, এসো, আমাদের নতুন বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এ নিধি, আমার বন্ধু - খুব ভালো শিক্ষার্থী মায়াধর - সমরোত্তম শ্যামশ্রীর প্রিয় ছাত্রী। আর এ...”

“অভী। আমি জানি। সহকারী নিয়ামকের কাছে এরই ঝড়িভরতি প্রশংসা শুনে এলাম। ...তোমার নাকি দু’হাতেই নিয়তিলাঞ্ছন আছে?”

কথা না বলে হাতদুটো ওদের সামনে মেলে দিল অভী। অবাক হয়ে ওরা দেখতে লাগল নীলচে গোল চিহ্নদুটোকে।

তারপর নিধি এসে বসল তার সামনে; একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। অভীর অস্বস্তি হতে লাগল।

মেয়েটার হাবভাব ঠিক যেন রক্ষোবৈদ্যের মতো।

তারপর নিধি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকাল লীনার দিকে। “লীনা, এ ছেলেটার গা থেকে আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।”

লীনা ফিক ফিক করে হেসে বলল, “তাই নাকি? তোমার নাক অবশ্য বরাবরই খুব ভালো। আমি তো ওর গা থেকে বগলের ঘামের গন্ধ ছাড়া আর কিছু পাচ্ছি না।”

অভীর কান লাল হয়ে গেল লজ্জায়। স্নান করতে হবে এক্ষুনি, মনে মনে ঠিক করে নিল সে। সারাদিন কম পরিশ্রম তো আর হয়নি।

নিধি বলল, “লীনা, এই মানুষ-ছেলেটার জন্য কিন্তু অনেক বিপদ, অনেক ঝামেলা অপেক্ষা করে আছে - এ আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি।”

অভী বলল, “কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, সবাই আমাকে এই একই কথা বলছে কেন? একটু আগে পর্বতদাও আমাকে এইরকমই কিছু একটা বলছিল।”

ওরা একটু অবাক হয়ে বলল, “পর্বতদা মানে আমাদের ‘কচি পর্বত’?”

অভী ‘হ্যাঁ’ বলতে নিধি বলল, “ওর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই? আয়তনের অনেক ছেলের সঙ্গেই ও খুব বাজে ধরনের একটা মজা করে। তোমার সঙ্গেও কি...?”

কোনো সংকোচ না করেই অভী পুরো ঘটনাটা ওদের বলে গেল; বাদ রাখল শুধু তার হাতের তালু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা। ওটা যে কেন হয়, সে নিজেই জানে না।

সব শুনে দুটি মেয়ের মুখেই বিস্ময়মিশ্রিত প্রশংসা ফুটে উঠল। নিধি বলল, “আয়তনে এসে প্রথম দিনেই কচি পর্বতের সঙ্গে টক্কর নেওয়া, আর তারপরেও সমরগরিমা বজায় রেখে ফিরে আসা - এ জিনিস কোনো পুরুষ শিক্ষার্থীর সঙ্গে

আগে হয়নি - অন্তত আমার জানা নেই।”

লীনাও প্রশংসার সুরে বলল, “দারুণ কাজ করেছে, অভী। ‘প্রথম বন্ধু’ হয়েছে তোমার?”

অভী বলল, “হ্যাঁ। সন্দীপ।”

লীনা আক্ষেপের সুরে বলল, “ইশ। না হলে আমি তোমার ‘প্রথম বন্ধু’ হতে পারতাম। তবে সন্দীপ খুব ভালো ছেলে।”

নিধি বলল, “হ্যাঁ। আমার সঙ্গেই সমরোত্তম শ্যামশ্রীর কাছে প্রশিক্ষণ নেয় ও। শরীরে ওর রাস্কসরক্ত নেই, কিন্তু মায়াবিদ্যায় তুখোড় জ্ঞান। সমরোত্তম শ্যামশ্রী ওকে খুব পছন্দ করেন।”

অভী বুঝতে পারল, নতুন বন্ধুদের শ্রদ্ধা সে ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে। ভালো লাগছিল তার। মেয়েদুটো খারাপ নয় - বেশ বন্ধুর মতো মিশছে তার সঙ্গে।

কেমন মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিল সে এতক্ষণ, ভাবতেই তার হাসি পেয়ে গেল।

“অভী!” পেছন থেকে শ্রীমতী মিত্র, না, মিত্রমাসি ডাকলেন।

ওরা ফিরে তাকাল একসঙ্গে। মিত্রমাসি বললেন, “তোমার সঙ্গে দেখা করতে একজন এসেছেন।”

“কে?”

“সমরোত্তম শ্যামশ্রী। তোমার ঘরে অপেক্ষা করছেন উনি।”

এরা তিনজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। লীনা ফিশফিশ করে বলল, “সমরোত্তম শ্যামশ্রী তো কখনও কারও সঙ্গে দেখা করতে আসেন না! ব্যাপারখানা কী?”

নিধিও বেশ অবাক। সে বলল, “উনি আজ পর্যন্ত এই মিত্রভবনে কোনোদিন আসেননি। আজ হঠাৎ হল কী?”

অভী উঠে পড়ল। একজন সমরোত্তমকে বসিয়ে রাখাটা ঠিক নয়। তার একটু একটু ভয় করতে লাগল।

কী বলতে এসেছেন উনি তাকে?

তার কক্ষে বসে ছিলেন সমরোত্তম শ্যামশ্রী। তাকে দ্বারের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে তিনি মাথা নেড়ে ওকে ভেতরে আসতে ইশারা করলেন।

অভী পায়ে পায়ে এসে ঢুকল ভেতরে। শ্যামশ্রীর মুখ ঢাকা, অঙ্গে বর্ম। হাতের কবজি থেকে তালু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে শুধু, আর দেখা যাচ্ছে দুটো চোখ। সে চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি অভীকে দেখছে - যেন আপাদমস্তক মেপে নিচ্ছে।

“বোসো এখানে।” তাঁর গলার স্বর গম্ভীর, যান্ত্রিক।

বসল সে। শ্যামশ্রী বললেন, “মেঘবর্ণের কাছে শুনলাম, তুমি আর তোমার কাকা - দু'জনেই নাকি স্বর্ণখেচর ধরতে পারো?”

অভী আমতা-আমতা করে বলল, “মানে, ইয়ে, কাকাই ধরে। আমি শুধু একবার সঙ্গে ছিলাম।”

শ্যামশ্রী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “এটা একটা বিরল প্রতিভা, তুমি জানো?”

“কোনটা?”

“স্বর্ণখেচর দেখতে পাওয়া। বিশেষ কিছু মানুষ ছাড়া ও পাখি জঙ্গলের মধ্যে কেউ দেখতে পায় না। যারা পায়, তারা অন্যদের থেকে একটু আলাদা হয়। ...তোমার কাকা কেমন আছেন?”

অভী অবাক হয়ে ভাবল, “তাহলে কি সমরোত্তম শ্যামশ্রীও চিনতেন রবিকাকাকে?” – মুখে বলল, “ভালো আছেন।”

“তোমার বাবা? চাষবাস করতেন, না?”

“হ্যাঁ। কিন্তু বাবাকে আমার মনে নেই।”

“হুঁ। কেমন লাগছে এখানে?”

অভী বলল, “ভালো লাগছে। একটা প্রশ্ন করব?”

সমরোত্তম শ্যামশ্রী আবার ওকে দেখলেন ভালো করে; তারপর বললেন, “বলো।”

“অস্ত্রপরীক্ষায় আমি কী করব? আমি তো কোনো অস্ত্রই চালাতে জানি না!”

মুখোশের আড়ালে শ্যামশ্রী একটু হাসলেন মনে হল। তিনি বললেন, “এখানে প্রায় কেউই যুদ্ধবিদ্যা শিখে আসে না। ও জিনিসটা আমরা তাদের শেখাই। কাজেই আগামীকালের ওই অস্ত্রপরীক্ষা নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা কোরো না।”

অভী আঁতকে উঠল। “অ্যাঁ? আগামীকাল?”

শ্যামশ্রী একটু অবাক হয়ে বললেন, “সহকারী নিয়ামক নারদের ওপর দায়িত্ব ছিল বিষয়টা তোমাকে জানানোর। কিছু বলেননি উনি?”

“না তো!”

“ভুলে গেছেন তাহলে। মনে মনে প্রস্তুতি নাও, অভী। কাল সকালেই...”

অভী ঘামতে লাগল। সেদিকে লক্ষ করে শ্যামশ্রী বললেন, “আবার বলছি, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। শুধু খেয়াল রেখো, সমরগরিমা যেন না হারায়। পরিস্থিতি যাই হোক, প্রাণ থাকুক আর যাক – না না, কাল অতটা বাড়াবাড়ি হবে না, নিশ্চিন্ত থাকো – যাই ঘটনা ঘটুক, সমরগরিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। তোমার ওপর সমরোত্তম মেঘবর্ণের অনেক ভরসা, আমারও। দেখো, আমাদের সেই ভরসার মর্যাদা যেন দিতে পারো।”

অভী বলল, “আমি চেষ্টা করব আপ্রাণ, সমরোত্তম শ্যামশ্রী।”

উঠে দাঁড়ালেন তিনি; বললেন, “তুমি পারবে। পর্বতের মুখে তোমার আজকের গল্প শুনেছি একটু আগে। সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন। আমি আর মেঘবর্ণও খুব খুশি। কাল তোমার ‘অস্ত্রপরীক্ষা’ শুধু নয়; চরিত্রের দৃঢ়তারও পরীক্ষা – সবাই দেখবে, তুমি শেষপর্যন্ত নিজের সমরগরিমা বজায় রাখতে পারলে কিনা।”

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অভীর মাথার চুলগুলো আঙুল দিয়ে ঘেঁটে দিলেন তিনি; বললেন, “চললাম। কাল সকালে দেখা হবে। মনে রেখো, সমরগরিমাই এক

যোদ্ধার আত্মা - তাকে যেন কখনও হারাতে দিয়ো না। এ আমার আদেশ। মনে থাকবে?”

অভী বলল, “থাকবে।”

আর কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন সমরোত্তম শ্যামশ্রী। কেন যে তিনি এসেছিলেন, অভী কিছুই বুঝতে পারল না।

শ্যামশ্রী একটা দৃষ্টিভঙ্গি ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন তার মাথায়।

কাল অস্ত্রপরীক্ষা! তার চরিত্রের দৃঢ়তার পরীক্ষা! আয়তনের সবার সামনে! নারদ এই কথাটাই জানাতে ভুলে গেলেন!

লীনা আর নিধির কৌতূহলী মুখদুটো সে দেখতে পাচ্ছে তার দ্বারের সামনে। নিশ্চয়ই নজর রেখেছিল ওরা; শ্যামশ্রী চলে যেতেই তাই হানা দিয়েছে এ-ঘরে।

তার কাছে সব শুনে ওরা তো লাফিয়ে উঠল। “সমরোত্তমরা সবাই তোমার ওপর প্রসন্ন যখন, তখন কালকের অস্ত্রপরীক্ষা নিয়ে অত মাথা না ঘামালেও চলে। ও পরীক্ষায় তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। যাবেই যাবে।”

অভীর নিজের অতটা আত্মবিশ্বাস জাগছিল না।

বান্ধবীরা বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর সে অনেকক্ষণ বসে রইল খোলা জানালার পাশে।

কী অদ্ভুত জীবন! কাল রাতে এই সময় ও কোথায় ছিল, আর আজ কোথায়!

রবিকাকা কি ঘুমিয়ে পড়েছে এখনই? স্বর্ণখেচরটাকে কি ছেড়ে দিয়ে এসেছে বৈকালির জঙ্গলে?

বাইরে নিঃশব্দ রাত্রি। তার ঘুম পাচ্ছে না; কতগুলো নাম পাক খাচ্ছে মাথার মধ্যে - কল্পনাথ, উর্গায়া, শর্বর!

বৈদূর্যর কাটা মুণ্ডুর কথাটা হঠাৎ মনে পড়তেই সে চমকে উঠল। অত বড়ো রাক্ষসটাকে যে মেরেছে, সে না জানি কত ভয়ংকর!

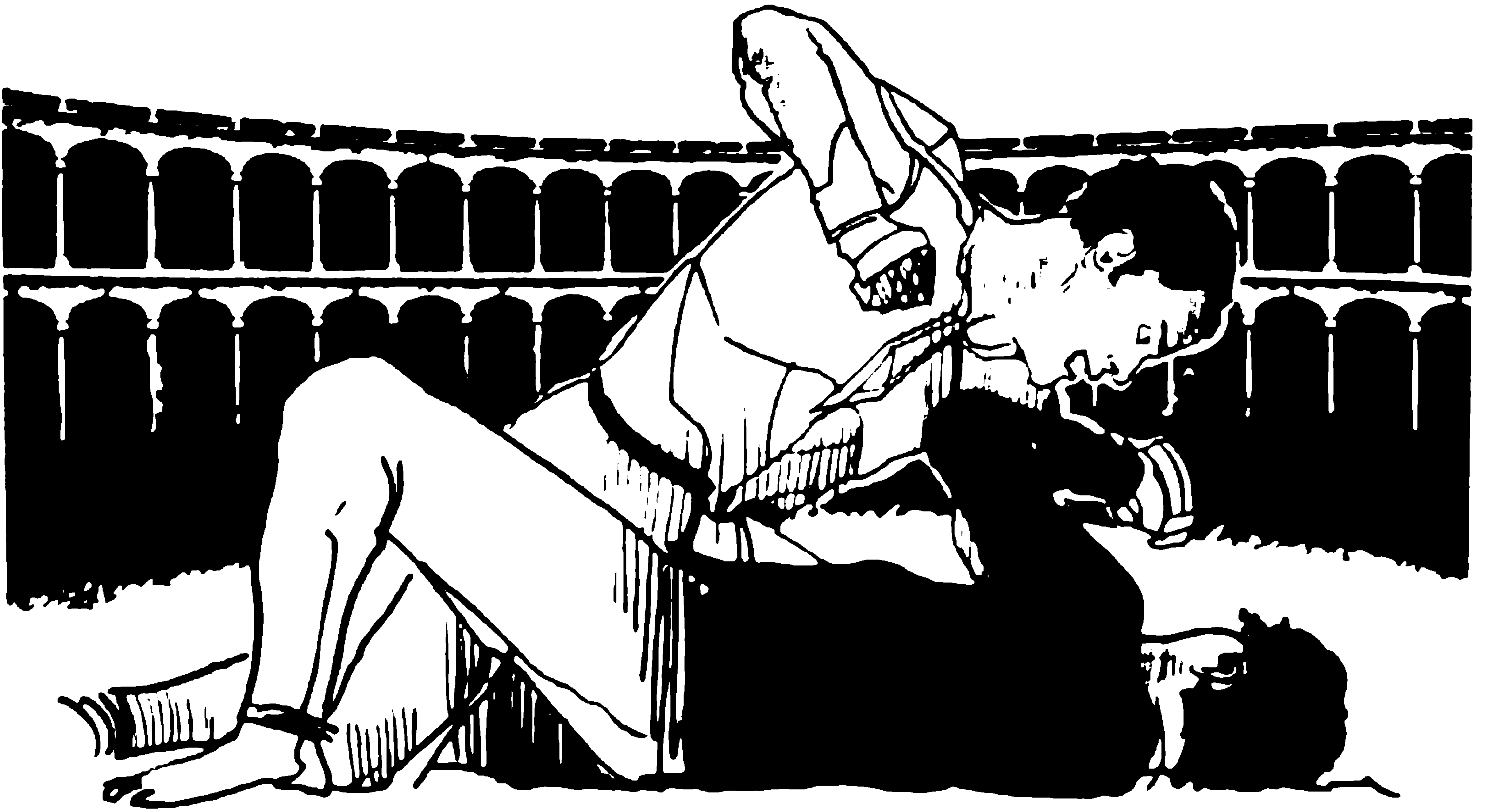
ক্লান্ত ছিল সে, তাও ভালো ঘুম হল না। স্বপ্নে দেখল, সেই আত্মাদি শকুনটা তার মাথায় ঠুকরে দিচ্ছে আর বলছে, “স্বর্ণখেচর দেখতে পাও তুমি? তাহলে তুমি তো ঠিক সবার মতো নও। তুমি একটা কিস্তৃত!”

বিরক্ত হয়ে পাখিটাকে হাত দিয়ে উড়িয়ে দিতে গেল সে, আর তখনই দৃশ্যটা বদলে গেল। রণিতের দলবল তাকে ঘিরে ধরে বলছে, “আবর্জনা! আবর্জনা!” আর তার হাতের তালু ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে অভী দেখল, ভোর হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত থম্ মেরে বসে রইল সে - নতুন জায়গায় ঘুমটা ঠিকমত হয়নি।

তারপরেই তার মনে পড়ে গেল, আজ সকালে সবার সামনে তার অস্ত্রপরীক্ষা।

হুড়মুড় করে বিছানা থেকে নেমে স্নানাগারের দিকে ছুটল সে।



।। ষষ্ঠ অধ্যায় ।।

হিমকুশল

প্রাতরাশ সবাই একসঙ্গে বসে করবে, এটাই মিত্রভবনের রেওয়াজ। সবার সঙ্গে এই সুযোগে একটু গল্প করে নেন মিত্রমাসি।

এই সময়েই তিনি কথাটা বলবেন, ঠিক করে রেখেছিলেন। তিন আবাসিকের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ নাটকীয়ভাবে তিনি ঘোষণা করলেন, “খুনিটাকে ধরেছে ওরা!”

এরা তিনজন চমকে উঠল। লীনা বলল, “ওরে বাবা! এত জলদি! কে লোকটা?”

নিধি বলল, “আপনি এর মধ্যেই এ খবর পেলেন কোথায়, মিত্রমাসি?”

যে ভৃত্যটি পরিবেশন করা হয়ে যাওয়ার পরেও সম্ভবত নতুন ছেলে অডীকে আর একটু ভালো করে দেখার আশায় কাছেই ঘুরঘুর করছিল, তাকে দেখিয়ে মিত্রমাসি বললেন, “এই মনোহরের কাছে। একটা অর্ধরাক্ষস করেছে খুনিটা। কী মনোহর, তোমার চোখের সামনেই ঘটেছে না ঘটনাটা?”

কথাটা বলার সুযোগ পেয়ে মনোহর স্পষ্টতই খুশি হল। সে বলল, “হ্যাঁ, মিত্রমাসি। সুদক্ষিণসারিতে থাকে খুনিটা। আজ নিয়ামক প্রভু বিনীতেশের রক্ষীরা ওকে পীতপত্রবনের মাঝখান থেকে ধরে এনেছে। কয়েকদিন আগে কল্পনাথের সঙ্গে ওর জোর তর্কাতর্কি হচ্ছিল, আমরা অনেকেই শুনেছি।”

নিধি বলল, “সে-ই খুনি? তুমি নিশ্চিত, মনোহরদা?”

মনোহরের আগে মিত্রমাসিই বললেন, “হ্যাঁ। কিছু মনে কোরো না নিধি, কিন্তু তোমাদের জাতের লোকজনের মাথাটা বড্ড গরম হয় – সবার আগে হাত চালিয়ে বসো তোমরা। ...ও কী, খাওয়া খামালে কেন? আচ্ছা, আচ্ছা, ভুল হয়ে গেছে। আর বলব না। লক্ষ্মীটি, খেয়ে নাও।”

নিধি শুকনো মুখে বলল, “বলবেন না কেন? নিশ্চয়ই বলবেন। আমার জাতের নিন্দে গুনতে গুনতে এখন সব অভ্যাস হয়ে গেছে, আর গায়ে লাগে না খুব একটা।”

মিত্রমাসি অপরাধীর মতো মুখ করে বসে রইলেন। অভীরও অপ্রস্তুত লাগছে; কী বলা উচিত, ভেবে পাচ্ছে না।

লীনা বলল, “কিন্তু লোকটা কি স্বীকার করেছে যে সে-ই করেছে খুনটা? আমাদের নিয়ামক মহোদয়ের ওপর আমার কিন্তু খুব একটা ভরসা নেই।”

মনোহর বলল, “না গো লীনাদিদি, অর্ধরাক্ষসদের সঙ্গে আমাদের মানবমন্দির এলাকার মানুষদের ঝুটঝামেলা মাঝেমধ্যে হয় না, তা নয়। কিন্তু সেসবের সমাধান করতে আমাদের নিয়ামক মহোদয়ের রক্ষীবাহিনী যায়ই না কখনও। আজ নেহাত আয়তনে কাজ করত কল্পনাখ, তাই উনি এত ব্যস্ত খুনিকে ধরতে। নয়তো আমাদের মিত্রমাসির মতো অভিজাতরা গুঁর ওপর রেগে আগুন হয়ে যাবেন না? ঠিক বলছি তো, মিত্রমাসি?”

মিত্রমাসি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, “ঠিক বলছ, তবে একটু বেশিই বলছ, মনোহর।”

মনোহর লজ্জা পেয়ে সরে গেল। লীনা বলল, “জানো অভী, আমাদের নিয়ামক মহোদয় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য করতে পারেন না, এমন কাজ নেই। সমরগরিমা আয়তনের এক কর্মী খুন হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব খুনিকে ধরতে না পারলে নিয়ামক হিসেবে গুঁর মান থাকে না। তাই এক নিরীহ অর্ধরাক্ষসকে ধরে এনে সবার সামনে তাকে ‘খুনি’ বলে চালিয়ে দিতে পারলে উনিও নিশ্চিত হন। অর্ধরাক্ষসদের উনি পছন্দ করেন না, এ-কথা আর কার অজানা?”

নিধি বলল, “অর্ধরাক্ষসদের শুধু উনি কেন, বেশির ভাগ মানুষই পছন্দ করে না। যত মুশকিল আমাদেরই। মানুষেরা ভাবে, আমরা হিংস্র জাত – আমরা শর্বরের সমর্থক। আর ওদিকে মাল্যপর্বতের অভিজাত রাক্ষসরা ভাবে, আমরা মানুষের কাছাকাছি থাকি – আমরা ছোটোজাত। মানুষে-রাক্ষসে হাজার শত্রুতা থাক, একটা ব্যাপারে দু’জনেই একমত – এই অর্ধরাক্ষসগুলো হচ্ছে একদম অখাদ্য জীব; এদের বিশ্বাস করা যায় না।”

অভীর খারাপ লাগছিল, কিন্তু লীনা পরিবেশটা সহজ করে নিল। নিধির মাথায় এক চাঁটি মেরে সে বলল, “আবার শুরু করেছ ঘ্যানঘ্যানানি? এদিকে অভীর আজকে অস্ত্রপরীক্ষা আছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, সে খেয়াল আছে?”

সবাই চটপট খাওয়া সেরে উঠে পড়ল। আর একবারই শুধু নিধি বলেছিল, “যাকে ধরেছে, সে নির্দোষ, আমি জানি।”

অভী অবাক হয়ে বলেছিল, “তুমি কী করে জানলে?”

নিধি গতকালের মতোই হেসে বলেছিল, “আমি জানি, কিন্তু বলা বারণ।”

লীনা বলেছিল মুখ বাঁকিয়ে, “না বললে বয়েই গেল।”

মিত্রমাসি বললেন, “চলো, চলো; অস্ত্রপরীক্ষা হয়ে গেলে বিচারসভা বসবে আয়তনে – সেটাও দেখতে হবে।”

অভীর অস্ত্রপরীক্ষা হবে অনুশীলন ক্ষেত্রে। বিরাট মাঠ, ছাউনি ঘেরা আছে তার মধ্যে কিছুটা জায়গা। সেখানে লম্বা চওড়া উঁচু মঞ্চ করা আছে পাথর দিয়ে। মেঘবর্ণ ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল সেখানে। ওদের আসতে দেখে এগিয়ে এল সে।

“অভী, তৈরি তো?”

অভী বলল, “জানি না। কীসের জন্য যে তৈরি হব, তাই তো বুঝতে পারছি না।”

মেঘবর্ণ বলল, “বিশেষ কিছু না। আজ এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য দুটো – এক, প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীর কোনো না কোনো অস্ত্রে সহজাত দক্ষতা থাকে। নানা রকম অস্ত্রচালনা করতে দিয়ে এই পরীক্ষায় দেখে নেওয়া হবে, তোমার স্বাভাবিক দক্ষতা কোন দিকে – কোন্ অস্ত্র তুমি ভালো নিয়ন্ত্রণ করতে পারছ। তারপর সেই অস্ত্র নিয়ে তোমাকে আরও ভালো করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আর দুই, তোমার সমরগরিমা অটুট রাখার মতো মনের জোর তোমার আছে কিনা, সেইটুকু দেখে নেওয়া হবে।”

অভী শুকনো মুখে মাথা নাড়ল। মিত্রমাসি বললেন, “সমরোত্তম মেঘবর্ণ, আমরা তাহলে দর্শকাসনে গিয়ে বসি?”

মেঘবর্ণ বলল, “হ্যাঁ, বসে পড়ুন। অধিনায়ক বজ্রধর, সমরোত্তম শ্যামশ্রী, সহকারী নিয়ামক নারদ – সবাই আসছেন। আরও আশ্চর্য ব্যাপার, রক্ষোবৈদ্যও আসবেন বলেছেন। আর আসছেন স্বয়ং নিয়ামক মহোদয়। তবে অভীর অস্ত্রপরীক্ষায় ওঁর বিশেষ আগ্রহ নেই। অস্ত্রপরীক্ষা হয়ে গেলে এখানেই কল্পনাথের হত্যাকারীর বিচারসভা বসবে। প্রচুর লোক আসবে। তাই এখন থেকেই দর্শকাসনে বসে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে, শ্রীমতী মিত্র।”

লীনা ফিশফিশ করে নিধিকে বলছে, অভী শুনতে পেল, “বাব্বা! বড়োকর্তারা সবাই আসছেন যে! এ ছেলের কপাল ভালো না মন্দ, তাই তো বুঝতে পারছি না।”

নিধিও ফিকফিক করে হাসল। মিত্রমাসি বললেন, “অভী, খুব ভালো হবে পরীক্ষা। চিন্তা কোরো না, আমরা ওই দর্শকের আসনে আছি। ওখান থেকেই তোমাকে উৎসাহ দেব আমরা।”

অভী শুকনো হাসি হাসল। মিত্রমাসির উৎসাহে কতটা কাজের কাজ হবে, সে-বিষয়ে তার নিজেরই সন্দেহ আছে।

লম্বা-চওড়া চেহারাটা এগিয়ে এসে অভীর কাঁধে এক থাপ্পড় বসাল। ‘উল্’ করে পেছনে ঘুরতেই সে দেখল, পর্বত হাসছে দাঁত বার করে। হি হি করে হেসে পর্বত বলল, “আমিও দেখতে এলাম তোমার কেলামতি।” – বলে

মিত্রমাসির পেছনে গিয়ে বসল সে।

অভীর এবার বেশ ভয় লাগছে। এত লোক দেখতে আসছে তাকে! আজ নিশ্চয়ই সব গড়বড় করে ফেলবে সে!

ওই যে আসছেন দণ্ড হাতে অধিনায়ক বজ্রধর, সঙ্গে সমরোত্তম শ্যামশ্রী। তাঁর পেছনে যিনি আসছেন, তাঁর দু'পাশে চারজন বর্ষাধারী রক্ষী। অভী অনুমান করল, ইনিই নিয়ামক বিনীতেশ।

লোকটির চেহারা আদৌ মনে প্রসন্নতা জাগায় না। মধ্যম উচ্চতার মানুষটির মুখে সরু গোঁফ, চোখদুটি বিড়ালের মতো সতর্ক ও ধূর্ত। অভীর দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, সমরগরিমা আয়তনের এসব রীতির প্রতি তাঁর খুব একটা ভক্তি নেই। এসে দর্শকাসনে সবার সামনে বসলেন তিনি। রক্ষীরা দাঁড়িয়ে রইল।

তাঁর পেছনে আসছিলেন নারদ এবং রক্ষোবৈদ্য। নারদ হাসলেন অভীকে দেখে; রক্ষোবৈদ্য একটু মাথা নাড়লেন।

তাঁদের পেছনে ছিল আয়তনের অনেকগুলি ছাত্রছাত্রী। মৃগেন্দ্র, উষসী, সন্দীপ - এদেরকে সে চিনতে পারল। তরুণও আছে দলের মধ্যে, কঠোর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে।

সন্দীপ দৌড়ে এসে আলিঙ্গন করল তাকে। “অভী, তোমার অস্ত্রচালনা দেখার আগ্রহে আমার কাল রাতে ঘুম হয়নি ভালো করে।”

অভী ম্লান হাসল। “ওই একই ভয়ে আমারও ঘুম হয়নি।”

সন্দীপ হেসে উঠল। দর্শকাসন থেকে নিধি চিৎকার করে ডাকল, “সন্দীপ! আমরা এখানে।”

ওদের দেখে সন্দীপ হাত নাড়ল। “যাচ্ছি।”

অভী বলে ফেলল, “সন্দীপ, আমার খুব ভয় করছে। সবাই এসেছেন, এখন আমি যদি কিছুই করতে না পারি?”

সন্দীপ বলল, “আরে, প্রথমবার সবার ওরকম লাগে। পছন্দের অস্ত্র হাতে পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মিত্রভবনের বন্ধুদের সঙ্গেই আমি বসছি ওখানে। কোনো ভয় নেই। ‘সমরগরিমা’ই শেষ কথা, মনে আছে তো? ব্যস, ওতেই হবে।”

সবাই বসে পড়ল যে যার আসনে, রয়ে গেল শুধু মেঘবর্ণ। দর্শকদের দিকে ফিরে উঁচু গলায় সে বলল, “স্বাগতম দর্শকমণ্ডলী।”

সকলে হর্ষধ্বনি করে উঠল।

অভীর বুক টিপটিপ করছে। তার সামনে রাখা আছে বর্ষা, তির-ধনুক, গদা, ঋজু তরবারি। অস্ত্রগুলোর গায়ে এসে পড়েছে সকালের আলো - বেশ উজ্জ্বল লাগছে তাদের।

মেঘবর্ণ বলল, “আজ আমাদের নতুন শিক্ষার্থী অভীর অস্ত্রপরীক্ষা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমাদের ধন্য করেছেন মাননীয় নিয়ামক মহোদয়। তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।”

এলোমেলো দু'চারটি করতালির শব্দ। নিয়ামক বিনীতেশের মুখ পাঁচার মতো গম্ভীর হয়ে উঠল। অভী দেখতে পেল, নিধি-লীনা-সন্দীপরা মুখ টিপে হাসছে।

মেঘবর্ণের মুখে হাসির চিহ্নমাত্র নেই, কিন্তু অভী স্পষ্ট দেখতে পেল, তার চোখে দুট্টমি খেলা করে বেড়াচ্ছে। যেন ইচ্ছা করেই পরের নামটা উচ্চারণ করল সে।

“এই অস্ত্রপরীক্ষা অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাননীয় সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর।”

স্বতঃস্ফূর্ত করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল অনুশীলন ক্ষেত্র। নিয়ামক বিনীতেশের মুখে জমছে আষাঢ়ের মেঘ। বজ্রধর এগিয়ে এলেন, ডাকলেন, “শ্যামশ্রী, তুমিও এসো।”

তিনজন সমরোত্তম এসে দাঁড়ালেন মঞ্চের ওপর। অভী ভাবছে, “এবার কী হবে?”

বজ্রধর বললেন, “এখানে তরবারি, গদা, বর্শা আর ধনুর্বাণ এনে রাখা হয়েছে, অভী। সাধারণত শিক্ষার্থীরা এগুলোর মধ্য থেকেই কোনো একটা বেছে নেয়। তোমার চেহারা গদাযুদ্ধের অনুপযুক্ত, তাই ওটি বাদ রাখছি আপাতত। বর্শা ছুড়তে পারবে?”

অভী নিজেও জানে না, সে কী পারবে। মেঘবর্ণ বলল, “পেশিশক্তি তো এতেও দরকার। নিয়মিত অনুশীলন দরকার বর্শানিক্ষেপে দক্ষতা আনার জন্য। দেখি, একটা ছোড়ো, অভী। কতদূরে নিক্ষেপ করতে পারো, দেখা যাক।”

একটা বর্শা হাতে তুলে নিল অভী। ও বাবা, বেশ ভারী যে! এ জিনিস সে ছুড়বে কী করে?”

দর্শকরা হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে। মেঘবর্ণ আর একটা বর্শা হাতে তুলে নিয়ে বলল, “অভী, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে ছুড়তে হয়। আমার পরে তোমার পালা।”

বর্শাটা কাঁধের থেকে কিছুটা বেশি উচ্চতায় তুলে কয়েক পা ছুটে এসে মেঘবর্ণ ছুড়ে দিল ওটাকে। এত দূরে গিয়ে ওটা পড়ল যে অভীর মনে হল কোনো সাধারণ মানুষ অতদূরে ছুড়তেই পারে না। হাততালিতে ফেটে পড়ল দর্শকরা।

মেঘবর্ণ অবশ্য সাধারণ মানুষ নয় – সমরোত্তম।

যা থাকে কপালে! মেঘবর্ণের ভঙ্গিমা নকল করে নিজের বর্শাটাকে ছুড়ল সে। মাত্র কয়েক হাত দূরে গিয়েই কেমন যেন অসহায়ভাবে মাটির ওপর পড়ে গেল অস্ত্রটা।

দর্শকরা চুপ। অভীর কান লাল হয়ে গেছে।

বজ্রধর গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, “ঠিক আছে। বর্শা তোমার অস্ত্র নয়, বোঝা যাচ্ছে। এবার তাহলে ধনুর্বাণের পরীক্ষা হয়ে যাক।”

এ পরীক্ষাতেও ভালো ফল করতে পারল না অভী। প্রথমে তো সে ধনুকে বাণ পরিয়ে ছিলা টানতেই পারছিল না; স্বয়ং অধিনায়ক বজ্রধর এসে দেখিয়ে

দেওয়ার পর যদি বা গোটা পাঁচেক বাণ সে নিষ্ক্ষেপ করতে পারল, কোনোটাই লক্ষ্যবস্তুর ধারেকাছে দিয়েও গেল না।

দর্শকরা চুপ করে আছে। লীনা, মিত্রমাসিদের মুখে উৎকণ্ঠা। নিয়ামক বিনীতেশের চোখেমুখে বিরক্তি - যেন অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাঁর।

শ্যামশ্রী বললেন, “বাকি রইল অসিযুদ্ধ। সম্ভবত এইটিই তোমার আসল অস্ত্র, অভী।”

মেঘবর্ণ বলল, “কিন্তু অসিবিদ্যা অনুশীলনের জন্য আর একজনকে লাগবে। শিক্ষার্থীদের একজনকে ডাকা যাক। কী বলেন, অধিনায়ক বজ্রধর?”

বজ্রধর মাথা নাড়লেন। “কারা আসতে ইচ্ছুক, হাত তোলো।”

অনেকগুলো হাত উঠে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বজ্রধর সবার মুখগুলো একবার দেখলেন, তারপর মুচকি হেসে একজনকে ডাকলেন, “তুমি এসো।”

ছেলেটা এসে দাঁড়াল মঞ্চে। তরুণ।

তিনজন সমরোত্তম পরম্পরের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন - সম্ভবত চোখের ইশারায় কিছু কথা হয়ে গেল। তারপর বজ্রধর বললেন, “অভী, তরুণ। দু'জন একটি করে তরবারি তুলে নাও। যুদ্ধ করবে, কিন্তু কেউ অস্ত্র দিয়ে অন্যজনের শরীরে আঘাত করবে না। নাও, শুরু করো।”

অভীর খুব রাগ হচ্ছে। তরবারি ধরতে সে যে মোটেই জানে না, বজ্রধর কি জানেন না? আর তরুণ যে তার প্রতি কীরকম মনোভাব পোষণ করে, সমরোত্তমরা সবাই জানেন ভালো করেই। তাও সেই তরুণকেই পাঠানো হল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে!

তরুণের মুখে শয়তানের মতো হাসি। সে জানে, প্রশিক্ষণহীন অভী তার সামনে অসিযুদ্ধে মোটেই দাঁড়াতে পারবে না।

তরবারি উদ্যত করে অভী এগিয়ে গেল প্রতিপক্ষের দিকে। তার তরবারিতে আঘাত করল সজোরে তরুণ; তার হাত থেকে অস্ত্রটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। দর্শকাসনে বন্ধুরা মুখে হাত চাপা দিল। অভী যে এইভাবে হারবে, তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

এক হাত কোমরে রেখে তরুণ তরবারি দোলাচ্ছে তার নাকের সামনে। “যাও, কুড়িয়ে আনো ওটা।”

মাথা নীচু করে অস্ত্রটা কুড়িয়ে এনে আবার আক্রমণ করতে গেল সে; তরুণের আর এক আঘাতে আবার সেটা উড়ে গিয়ে পড়ল দূরে। এবার হেসে উঠল দর্শকরা।

তরুণ বলল, “আর একবার হোক। বারবার তিনবার।”

তরবারিটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিতে যাবে সে, এমন সময় পেছন থেকে পিঠে প্রবল একটা ধাক্কা খেয়ে সে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

লাথি মেরেছে তরুণ!

দর্শকাসন থেকে অসন্তোষের চিৎকার ভেসে এল। “ছিঃ! ছিঃ!”

মেঘবর্ণ ফিশফিশ করে বলল, “তরুণ কিন্তু এবার বাড়াবাড়ি করছে, অধিনায়ক বজ্রধর। নিরস্ত্র যোদ্ধাকে পেছন থেকে লাথি মারা অন্যায়।”

বজ্রধর বললেন, “সব যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ হয় না মেঘবর্ণ, তুমি ভালো করেই জানো। দেখাই যাক না, কতদূর গড়ায়।”

শ্যামশ্রী কিছু বললেন না, কিন্তু মনে হল, তরুণের ওপর তিনিও বিরক্ত হয়েছেন।

তরুণ ততক্ষণে আরও কয়েকটা লাথি ঘুষি মেরে অতীকে পেড়ে ফেলেছে মাটিতে। অতীও দু'চারটে দেয়নি, এমন নয়; কিন্তু তরুণের গায়ে জোর অনেক বেশি। অতীকে মাটিতে ফেলে মারতে মারতে সে নীচুগলায় গর্জাচ্ছিল, “হতচ্ছাড়া ছোটোলোক! আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা! তোদের জন্যই এই আয়তন নোংরা হয়!”

অতী বুঝতে পারছিল, তার দু'হাতের তালু ভীষণ দ্রুতগতিতে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। তরুণ চড়ে বসেছে তার বুকের ওপর; ঠাস ঠাস করে থাপ্পড় মারছে গালে। নিজের মুখে রক্তের নোনতা স্বাদ অনুভব করল অতী।

তার মুখের কাছে মুখ এনে তরুণ জোর গলায় বলল, “বলো, ‘দয়া করো’।”

অতীর ঠোঁট কেটে গেছে, ফুলে উঠেছে চোখের কোল। দর্শকদের মধ্যে থেকে কে যেন চৈঁচিয়ে বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর, ওকে থামতে বলুন এবার।” – গলা শুনে অতীর মনে হল, সন্দীপ।

বজ্রধর মাথা নাড়লেন। “না, লড়াই চলুক।”

লড়াই তখন একতরফা হয়ে গেছে। তরুণ বলল, “আগে ও বলুক ‘দয়া করো’।”

দর্শকাসনে বসে পর্বত হেসে উঠল; লীনা-নিধির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সে বলল, “ও ছেলে মরে গেলেও ‘দয়া করো’ বলবে না। আমি বুঝে গেছি, ওর ভেতরে প্রবল সমরগরিমা।”

অতীর মনে হল, তার দু'হাতের তালু যেন বরফের চেয়েও ঠান্ডা হয়ে আসছে। আর তার সঙ্গে শরীরে এত মার খাওয়ার পরেও যেন হঠাৎ করেই বইতে শুরু করেছে একটা প্রচণ্ড শক্তিপ্রবাহ। তার মনটা যেন শূন্য হয়ে যাচ্ছে – মাথা তুলছে একটাই প্রবল আবেগ – যে ছেলেটা তার বুকের ওপর চেপে বসে আছে, তার প্রতি ঘৃণা – অপরিসীম, অনন্ত শক্তিশালী, বরফশীতল ঘৃণা।

একহাতে তরুণের হাতটা শুধু চেপে ধরল সে। আর সঙ্গে সঙ্গেই তরুণের তীক্ষ্ণ চিংকারে যেন ফেটে পড়ল সকালের আকাশ।

চমকে উঠে সবাই দেখল, অতী ধরে আছে প্রতিপক্ষের হাত, আর একটা নীলচে বরফে ঢেকে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে তরুণের হাত থেকে শুরু করে গোটা শরীর।

অতীর কান ভোঁ-ভোঁ করছে। দূর থেকে কারা যেন বলছে, “থামো, থামো!” কিন্তু অতী ভালো করে কিছু শুনতেই পাচ্ছে না। তার সর্বসত্তা যেন চাইছে এই ঘৃণ্য জীবটাকে জমিয়ে মেরে ফেলতে।

মেরে ফেলতে!

চিন্তাটা মাথায় আসতেই অতী বুঝতে পারল, কী ভয়ংকর কথা সে

ভাবছিল। তরুণের হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিল সে। একটা মানুষের মৃত্যুকামনা! ছি ছি!

তরুণ তখন মাটিতে পরে ছটফট করছে আর বলছে, “দয়া করো! দয়া করো!” তার শরীরের প্রায় অর্ধেকটা ঢেকে গেছে বিষ-নীল বরফে। অভী যে তাকে ছেড়ে দিয়েছে, সেটুকুও বুঝতে পারছে না সে।

দর্শকরা নিঃশব্দ। এমন ভয়াবহ ব্যাপার তারা কখনও দেখেনি।

অভী ছেড়েই দিয়েছিল তরুণকে, তাও মেঘবর্ণ তাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল অন্যদিকে। তার কানের মধ্যে ভোঁ-ভোঁ আওয়াজটা তখনও হয়ে চলেছে। কিন্তু তার মধ্যেই সে বুঝতে পারল, হাতের তালুর অতি শীতলভাবটা কেটে গিয়ে হাতগুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক উষ্ণতায় ফিরছে।

সে ভেবেছিল, লড়াইয়ে তাকে জিততে দেখলে মেঘবর্ণ খুশি হবে। কিন্তু কই? মেঘবর্ণের মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর।

সমরোত্তম শ্যামশ্রী শুশ্রূষা করছেন প্রায়-অচেতন তরুণের। রক্ষাবৈদ্য দর্শকাসন থেকে নেমে গেলেন তাঁর কাছে। দু’জনে নীচুগলায় কীসব বলছেন। তরুণের হাতে হাত ঘষে তার রক্তচলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছেন রক্ষাবৈদ্য।

নিয়ামক বিনীতেশ তিক্তকণ্ঠে বললেন, “অধিনায়ক বজ্রধর, ছেলেটি দেখছি এক হিমকুশল।”

অভী বুঝতে পারছে, সে লড়াইয়ে জিতলেও কেউই বোধহয় ঠিক খুশি হয়নি। আর এই ‘হিমকুশল’ বস্তুটাই বা কী?

দেহিতে হলেও অভীর দিকে ফিরে হাততালি দিলেন অধিনায়ক বজ্রধর। তাঁর সঙ্গে যোগ দিল বাকি দর্শকরা।

তারপর হাততালি থামলে নিয়ামক বিনীতেশের দিকে ফিরে বজ্রধর বললেন, “অভী হিমকুশল হলেও ভয়ের কিছু নেই, নিয়ামক মহোদয়। আপনি যার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছেন, তার মতো কাজ অভী কোনোদিন করবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমাদের এই আয়তনের প্রতিষ্ঠাতা যুদ্ধদেব ঐশিকশ্রেষ্ঠ নিজেও একজন হিমকুশল ছিলেন, ভুলে যাবেন না যেন।”

তরুণ ততক্ষণে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। দুটি ছেলে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে গেল।

বজ্রধর বললেন, “আমাদের নতুন শিক্ষার্থী অভী আজ অস্ত্রপরীক্ষার মধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছে যে সে নিজের সমরগরিমা রক্ষা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এর চেয়ে আনন্দের কথা এক যোদ্ধার কাছে আর কিছু হতেই পারে না। আর অস্ত্রের ব্যাপারে আমি তাকে পরামর্শ দিচ্ছি প্রধান অস্ত্র হিসেবে তরবারি গ্রহণ করতে। আমার মনে হয়েছে, এতে সে ভবিষ্যতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। একই সঙ্গে মায়াবিদ্যাশিক্ষাও তার করা উচিত। সমরোত্তম শ্যামশ্রী তাকে এ-বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাদান করতে পারবেন।”

অনুশীলন মঞ্চ থেকে নেমে এল ওরা। নিয়ামক মহোদয়ের রক্ষীবাহিনী ঘিরে ফেলল জায়গাটা।

এইবার শুরু হবে কল্পনাথের হত্যাকারীর বিচারপর্ব।

অভী গিয়ে বসল লীনার পাশে। মিত্রমাসি বললেন, “আহা, কী মার মেরেছে গো! কালশিটে পড়ে গেছে ঠোঁটে!”

লীনা বলল, “হিমকুশল হয়, এতদিন কানে শুনেছিলাম। আজ নিজের চোখে দেখলাম। তবে ঠিক দিয়েছ ও ব্যাটাকে।”

অভী আর বলল না, সেই সময় তার মাথায় কী চিন্তার উদয় হয়েছিল। এখন আর তাকে নিয়ে আলোচনা হোক, সে মোটেই চাইছে না।

নিধি বলল, “আর কী কী বিদ্যা আছে তোমার পেটে, বলো তো?”

অভী হাসল। “আমার পেটে যে ঠিক কী আছে, আমার নিজেরই জানা নেই। কেটে দেখলে বোঝা যাবে বোধহয়।”

তার মাথাটা তখনও একটু একটু ঘুরছে। সেই প্রবল ঘৃণার অনুভূতিটা অনেকটাই হালকা হয়ে এসেছে। কানের মধ্যে ভ্রমরগুঞ্জনের শব্দটাও কমেছে।

পর্বত তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, “শাবাশ অভী!”

অভীর পিঠটা ঝনঝন করে উঠল ব্যথায়। পর্বতের হাত তো নয়, যেন গদা!

মিত্রমাসি বললেন, “ওই যে, খুনি অর্ধরাক্ষসটাকে নিয়ে আসছে রক্ষীরা।”

অভী দেখল, মাসির দিকে আড়চোখে চেয়ে একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করল নিধি।

লোকটাকে যেভাবে টানতে টানতে আনছিল নিয়ামক বিনীতেশের নিজস্ব রক্ষীর দল, তাতে অভীর খারাপই লাগছিল। বুড়োমতো, সাদা দাড়িওয়ালা লোকটা – অর্ধরাক্ষস হতে পারে, কিন্তু দেখলে মায়াই হয়। এই লোকটা খুন করেছে? হতেই পারে না।

বেচারাকে পেছন থেকে হাঁটুতে মারল একটা রক্ষী। ছড়মুড়িয়ে পড়ে গেল সে নিয়ামকের সামনে। অভী খেয়াল করল, অধিনায়ক বজ্রধরের দ্রুত ভয়ংকরভাবে কুঁচকে আছে। মেঘবর্ণের হাত কোমরে ঝোলানো তরবারির মুষ্টিতে। শ্যামশ্রীর মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছে না আবরণের আড়াল থেকে, কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে, অধিনায়ক বজ্রধরের আদেশের অপেক্ষায় আছেন তিনি – হুকুম হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

অভী দেখে খুশি হল, সমরোত্তমরা এই অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা পছন্দ করছেন না।

“কী নাম তোর?” জিজ্ঞাসা করলেন বিনীতেশ।

লোকটা হাতজোড় করে আছে, কাঁপছে থরথর করে। সে বলল, “প্রভু নিয়ামক, আমার নাম তারক।”

“তারক? কল্পনাথকে মারলি কেন?”

লোকটার চোখে জল এসে পড়েছে। সে বলল, “বিশ্বাস করুন প্রভু, আমি কাউকে মারিনি। কল্পনাথ আমার বন্ধু ছিল।”

নারদ এগিয়ে এলেন। “আমরা সংবাদ পেয়েছি, ওর সঙ্গে তোমার সদ্য তুমুল কলহ হয়েছিল।”

তারক বলল, “সহকারী নিয়ামক প্রভু, ওর সঙ্গে আমার মাঝেমধ্যেই

ওরকম ঝগড়াঝাঁটি হত। কিন্তু তাই বলে কি আমি ওকে খুন করব?”

নিয়ামক বিনীতেশ বললেন, “ওর খলিতে কী পাওয়া গেছে, নিয়ে এসো রক্ষীপ্রধান।”

রক্ষীদের মধ্যে যার শিরস্ত্রাণে শকুনের পালক গোঁজা ছিল, সে সাদা গোলাকার বস্তুটা দর্শকদের সবাইকে তুলে দেখিয়ে নিয়ামকের পায়ে কাছ এনে রাখল। একটা নরকরোটি!

নিধি ফিশফিশ করে বলল, “ফাঁসাচ্ছে বেচারাকে। ও জিনিস তোমরা মানুষরা পছন্দ করো না জানি, কিন্তু সুদক্ষিণসারিতে আমরা বিভিন্ন প্রাণীর কঙ্কাল দিয়ে ঘর সাজাই। এতে দোষের কী আছে?”

লীনার বলা টিকটিকির হাড়ের গল্পটা মনে পড়ে গেল অতীত। সে-ও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মিত্রমাসি বললেন, “আঃ, কথা বোলো না। বিচারটা দেখতে দাও।”

দর্শকদের মধ্যে মিত্রমাসির মতো অনেক অভিজাত ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা আছেন। আয়তনের একটা বড়ো খরচ এঁরা বহন করেন, এবং রাক্ষসদের ভয়ে এঁরা প্রায়শই ভীত থাকেন। এঁদের খুশি করার জন্য নিয়ামক বিনীতেশ যেভাবেই হোক একটা লোককে খুনি সাজিয়ে শাস্তি দিতে চাইছেন, অতীত স্পষ্ট বুঝতে পারল।

“এই মানুষের মাথার খুলিটা তোর ঝোলায় কী করছিল, জবাব দে।” নিয়ামক বিনীতেশ গর্জন করে উঠলেন। “নিষিদ্ধ মায়াবিদ্যা চর্চা করছিস তুই?”

তারক হাতজোড় করেই বলল, “প্রভু, আমরা অর্ধরাক্ষসরা এই ধরনের জিনিস দিয়ে ঘর সাজাই। আমি কোনো নিষিদ্ধ মায়াবিদ্যার চর্চা করি না প্রভু, করতে জানি-ও না।”

লীনা ফিশফিশ করে বলল, “সত্যি কথাই বলছে মনে হচ্ছে লোকটা। আর ওর কাছে একটা মড়ার খুলি পাওয়া গেছে মানে ও-ই কল্পনাথকে খুন করেছে, এ কী অন্যায় যুক্তি!”

নিয়ামক বিনীতেশ বললেন, “পীতপত্রবনে তোরা লুকিয়ে লুকিয়ে ষড়যন্ত্র করিস, আমি জানি না ভেবেছিস? জঙ্গলের মধ্যে ছায়াভবনে তোদের গোপন আলোচনা চলে, আমি সব খবর রাখি। তোরা অর্ধরাক্ষসগুলো আসলে বেইমানের জাত, বুঝলি?”

এবার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই একটা ক্রুদ্ধ গুঞ্জন শুরু হল। অতীত দেখল, মেঘবর্ণ কী একটা বলতে যাচ্ছিল, অধিনায়ক বজ্রধর তাকে থামিয়ে দিলেন।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল সে। নিয়ামক বিনীতেশ নিজেই নিজেকে আরও অপ্রিয় করে তুলছেন সবার কাছে। সমরোত্তমরা এই সময় হস্তক্ষেপ না করলে তিনি আরও ভুলভাল বকবেন নিঃসন্দেহে।

সহকারী নিয়ামক নারদ এগিয়ে এসে ব্যাপারটা সামলাতে চেষ্টা করলেন। “দয়া করে শিক্ষার্থীগণ কেউ এসব কথাকে ব্যক্তিগত আঘাত হিসেবে নিয়ো না। অপরাধীর মুখ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য কিছু রূঢ় কথা বলতে হয়, তোমরা তো জানোই।”

ছাত্রদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, “আমরা সব জানি। অর্ধরাক্ষসদের আপনারা কী চোখে দেখেন, কিছুই অজানা নেই আমাদের।”

নিয়ামক বিনীতেশ বক্তাকে দেখার চেষ্টা করেও বুঝতে পারলেন না এত জনের মধ্যে কে কথাটা বলল। অতী কিস্তি দেখেছিল তাকে – যোদ্ধাযক মৃগেন্দ্র। তার কাছাকাছিই বসে ছিল সে। মৃগেন্দ্রও তাহলে একজন অর্ধরাক্ষস! খুব রেগে গেছে সে, বোঝাই যাচ্ছে। এমন অন্যায় কথা শুনলে রাগ হওয়া অস্বাভাবিকও নয়।

ওদিকে কোনো কিছু পরোয়া না করেই নিয়ামক বিনীতেশ বলে চলেছেন, “তোরা শর্বরের রাজত্ব ফিরিয়ে আনতে চাস। তাই তলায় তলায় ঘেঁটি পাকাস সবসময়। জঙ্গলের মধ্যে গোপনে যাতায়াত আছে তোদের; ওখানে ছায়াভবনে মাল্যপর্বতের রাক্ষসরা আসে – সব জানি আমি। কল্পনাথকে তুই-ই মেরেছিস। আমি তোর ফাঁসির আদেশ দিলাম।”

উত্তেজনায অনেকের সঙ্গে অতীও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এ আবার কী বিচার! দোষই প্রমাণ হল না, মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হয়ে গেল! নিয়ামকের রক্ষীরা বর্শা তাক করল শিক্ষার্থীদের দিকে; কেউ নিয়ামকের কাছাকাছি এলেই তাকে মারবে।

এবার অধিনায়ক বজ্রধর এগিয়ে এলেন। “মাননীয় নিয়ামক মহোদয়, আমার কিছু বক্তব্য আছে।”

নিয়ামক বিনীতেশ চড়া গলায় বললেন, “আসামির মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হয়ে গেছে। এর পর আর কারও কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না।”

বজ্রধর বললেন, “পারে। সমরগরিমার আইন তৈরি করেছেন স্বয়ং যুদ্ধদেব ঐশিকশ্রেষ্ঠ। তাঁর তৈরি আইনের বলে প্রত্যেকটি বিচারসভায় সমরোত্তমদের বক্তব্য রাখার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে। এবং সে আইন মানতে আপনিও... বাধ্য। এবার কি আমি আমার বক্তব্য বলতে পারি?”

নিয়ামক বিনীতেশ একটা মুখভঙ্গি করে বললেন, “বলুন তবে, শুন।”

বজ্রধর বললেন, “তারকের অপরাধ প্রমাণ হয়নি।”

“ও অর্ধরাক্ষস। অর্ধরাক্ষসরা মিথ্যাবাদী হয়, সবাই জানে।”

“মিথ্যাবাদী মানুষরাও হয়, মাননীয় নিয়ামক মহোদয়,” বলে উঠল মেঘবর্ণ। “আপনার সন্দেহ হচ্ছে বলেই কারও ওপর আপনি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে দিতে পারেন না।”

বিনীতেশ গর্জন করে বললেন, “আলবাত পারি। আমি যা বলব, সেটাই আইন। আমি সর্বোচ্চ নিয়ামক – আমিই আইন।”

অতী বুঝতে পারছিল, তার হাতগুলো আবার ঠান্ডা হতে শুরু করেছে।

বজ্রধর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, “আজ্ঞে না, আপনি আইন নন। আইন তৈরি করেছেন একজন দেবতা, একজন ঐশিক। আপনি-আমি সবাই সেই আইনের সেবকমাত্র – তার বেশি কেউ নই। আমাদের কাজ আইনকে রক্ষা করা; আপনার কাজ সেই আইনের সুবিধা সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছে দেওয়া।”

নিয়ামক বিনীতেশ মুখ বিকৃত করে বললেন, “আপনি আমাকে আমার কাজ শেখাচ্ছেন, সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর? এত স্পর্ধা আপনার?”

অভী দেখতে পেল, বজ্রধরের দু'চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু নিজেকে সংযত রেখে তিনি বললেন, “শেখাচ্ছি না, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সেইসঙ্গে এটাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যে লোকটি মারা গেছে, সে কাজ করত সমরগরিমা আয়তনের হয়ে। এর বিচারের ভার আইন অনুযায়ী সমরোত্তমদের ওপর পড়ে। আপনি আর এ-ব্যাপারে ব্যস্ত না হলে সুখী হব, নিয়ামক মহোদয়।”

মাথা নেড়ে নিয়ামক বিনীতেশ বললেন, “না না না, আমার রাজ্যে এসে আমারই প্রজাকে খুন করে বিনা শাস্তিতে অর্ধরাক্ষসটা কেটে পড়বে, এ আমি হতে দেব না।”

মেঘবর্ণ বলল, “আপনি রাজা নন। এখানে কেউ আপনার প্রজা নয়।”

এবার শ্যামশ্রী এগিয়ে এলেন; রুম্বুস্বরে বললেন, “কী চান আপনি, নিয়ামক মহোদয়?”

“আমি? আমি ন্যায়বিচার করতে চাই। ওরা আমাদের একজনকে মেরেছে, আমি ওদের একটাকে মারতে চাই।”

শ্যামশ্রী বললেন, “আপনার ন্যায়বিচারের ধারণাটা বেশ গোলমালে, মাননীয় নিয়ামক মহোদয়। দাঁতের বদলে দাঁতকে বলে ‘প্রতিশোধ’; ‘ন্যায়বিচার’ বলে না। মন দিয়ে শুনুন, কল্পনাথকে হত্যা করা হয়েছিল সুপ্তসর্প মায়াঅস্ত্র প্রয়োগ করে। কোনো উচ্চমানের মায়াধর ছাড়া ও জিনিস কেউ তৈরি করতে পারে না – এই তারকের মতো মায়াবিদ্যায় অপ্রশিক্ষিত সাধারণ অর্ধরাক্ষসের পক্ষে তো ও জিনিস বানানো অসম্ভবতম ব্যাপার। খুনি কে, আপনি আদৌ জানেন না, অথচ একটা নিরীহ লোককে ফাঁসির আদেশ দিচ্ছেন কোন্ যুক্তিতে?”

এবার একটু ইতস্ততঃ করে নিয়ামক বিনীতেশ বললেন, “কিন্তু ওর ঝোলায় যে মড়ার খুলি... মানে নিষিদ্ধ মায়াবিদ্যাচর্চার উপকরণ...”

শ্যামশ্রী বললেন, “ব্যস, ওই দেখেই বুঝে ফেললেন ও মায়াবিদ্যা চর্চা করছিল? এ-বিষয়ে আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখছি, মাননীয় নিয়ামক মহোদয়!”

বিনীতেশ ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। “ঠিক আছে, ফাঁসির আদেশ আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু নতুন আদেশ – কশাঘাত। রক্ষীপ্রধান, ব্যাটাকে ধরে চাবকাও এখুনি।”

রক্ষীপ্রধান চাবুক নিয়ে তৈরিই ছিল – সর্বদাই থাকে। তার প্রভু মাঝেমধ্যেই অবাধ্যদের কশাঘাত করান।

‘সপাৎ’ করে প্রথম আঘাতটা তারকের পিঠে নামল কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই। কাতর আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

ভয়ে, উৎকণ্ঠায় মুখে হাতচাপা দিল অভী। লীনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, “ইশশ!”

আবার এক ঘা, আবার কাতর আর্তনাদ। দর্শকাসনে নিধির চোখে জল এসে পড়েছে, হাতের মুঠো শক্ত। তারক শরীরটা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল বজ্রধরের কাছাকাছি; তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল সে। “অধিনায়ক, বাঁচান।”

বজ্রধর কিছু বলার আগেই এসে পড়ল আর এক ঘা। একবার তড়িৎস্পৃষ্টের মতো ঝাঁকুনি খেল তারকের দেহ, তারপর আবার নেতিয়ে পড়ল বজ্রধরের পায়ে।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সবাই। রক্ষীপ্রধানের হাত আবার উঠছে শূন্যে। তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বজ্রধর আদেশ দিলেন, “থামো।”

সে কণ্ঠস্বরকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা রক্ষীপ্রধানের নেই। আপনা থেকেই হাত নেমে এল তার।

বজ্রধর পাথরের মতো মুখ নিয়ে তাকিয়ে রইলেন নিয়ামক বিনীতেশের দিকে। সেদিকে বেশিক্ষণ দেখতে পারলেন না বিনীতেশ; রক্ষীপ্রধানের দিকে ফিরে আদেশ দিলেন তিনি, “চালাও চাবুক।”

সে বেচারী পড়েছে উভয় সংকটে - একদিকে নিয়ামক প্রভুর আদেশ, আর একদিকে অমিত শক্তিমান সমরোত্তমরা। বিনীতেশ আবার আদেশ দিলেন, “আমি বলছি, চাবুক চালাও।”

রক্ষীপ্রধান আবার হাত তুলতেই শ্যামশ্রী নিজের ডানহাতটা তুলে একবার শূন্যে দোলালেন। রক্ষীপ্রধানের হাত থেকে চাবুকটা উড়ে গিয়ে পড়ল অনেকটা দূরে।

অভী অবাক হয়ে ভাবল, “এই তাহলে মায়াযুদ্ধবিদ্যা!”

রক্ষীপ্রধানের দিকে তাকিয়ে শ্যামশ্রী বললেন, “সৈনিক, সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধরের আদেশের বিরুদ্ধে গেলে আগামীকালের সূর্যোদয় তোমার আর দেখা হবে না, মনে রেখো।”

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল রক্ষীপ্রধান। রাগে গরগর করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন নিয়ামক বিনীতেশ। “আপনাদের নাক গলানোর জন্য ধন্যবাদ, সমরোত্তমগণ। আইন মেনেই আশা করি পরের বার থেকে আমাকে বিচারসভা করতে দেবেন।”

বজ্রধর মৃদু হেসে বললেন, “নিশ্চয়ই। আইন তো সবার জন্যই সমান, তাই না? স্বয়ং ঐশিকশ্রেষ্ঠের তৈরি করা আইন যখন, তখন আমরাও তাকে সম্মান দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটি বিচারসভায় উপস্থিত থাকব; ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না, নিয়ামক মহোদয়।”

ক্রুদ্ধভাবে স্থানত্যাগ করলেন নিয়ামক বিনীতেশ। অভীদের দিকে ফিরে একবার বোকার মতো হেসে সমরোত্তমদের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে নিয়ামকের পেছনে চললেন নারদ। বজ্রধর বললেন, “রক্ষোবৈদ্য, একবার আসুন দয়া করে।”

যজ্ঞগায় ছটফট করছে তারক। কয়েকজন এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল এখান থেকে। রক্ষোবৈদ্য বললেন, “ওকে নিয়ে চলো আমার সেবাকক্ষে।”

অভী দেখল, তারকের পিঠের জামা ভিজে উঠেছে লম্বা লম্বা রক্তাক্ত আঁচড়ের মতো দাগে। আহা, কত যজ্ঞগাই না পাচ্ছে বেচারী! একটু যদি শীতল কিছু দেওয়া যেত ওকে।

সে ফিশফিশ করে বলল, “পর্বতদা, হাতদুটো ঠাণ্ডা করে ওর গায়ে রাখতে পারলে ওর একটু আরাম হত, বলো?”

পর্বত গম্ভীরমুখে বলল, “অভী, হিমকুশলতা কিন্তু খুব একটা ভালো জিনিস বলে কেউই মনে করে না। তাই এ ক্ষমতা যার-তার সামনে দেখাতে যেয়ো না।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “কেন? এতে খারাপ কী?”

পর্বত নীচুগলায় বলল, “স্বয়ং ঐশিকশ্রেষ্ঠকে বাদ দিলে এর আগে এই আয়তনে একজন মাত্র হিমকুশল যোদ্ধা এসেছিল, আর সে লোকটা এমন কিছু খারাপ কাজ করেছিল যার জন্য গোটা সমরগরিমা আয়তন এখনও লজ্জা অনুভব করে। ওই একটি লোকের জন্য এই আয়তনের সব মান-সম্মান একসময় ধুলায় মিশে গিয়েছিল। সেই তখন থেকে ওর নাম কেউ এখানে নেয় না।”

নিধি আর লীনাও শুনছিল তার কথা। লীনা বলল, “পর্বতদা, সে-কথা আমিও শুনেছি। কিন্তু লোকটা যে কী করেছিল, কবে করেছিল – এসব কিছু জানতে পারিনি। তুমি বলো না।”

পর্বত বলল, “এসব তোমাদের অনেকেরই জন্মের আগের ব্যাপার, লীনা। আমি চাই না তোমরা কেউ কোনোদিন ওই লোকটার মতো এত ঘৃণ্য কাজ করো। তোমরা অবশ্য অতটা নীচে কোনোদিন নামতে পারবে না, এ আমার স্থির বিশ্বাস।”

অভী বলল, “কে ছিল সে? কী করেছিল?”

“সে ছিল একজন সমরোত্তম। সমরোত্তম নীলাভ।” পর্বতের মুখটা বলতে বলতে যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। “সে আয়তনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুকে যুদ্ধে জিতিয়ে দিয়েছিল।”



।। সপ্তম অধ্যায় ।।

দিব্যান্ত্র

বিকেলবেলা মিত্রমাসি বললেন, “আয়তন থেকে নির্দেশ পাঠিয়েছে তোমাদের সংগ্রহশালা পরিদর্শনে যেতে। যারা নতুন শিক্ষার্থী, এটা বিশেষ করে তাদের জন্য। তবে...” - লীনা আর নিধির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন তিনি - “চাইলে পুরোনোরাও আসতে পারে। সূর্যাস্তের ঠিক আগে সকলের আয়তনে উপস্থিত হওয়া চাই।”

মেয়ে দুটো লাফিয়ে উঠল। লীনা বলল, “যাব তো বটেই। ওই ঘরটায় যতবার যাই, ততবারই যেন নতুন লাগে।”

নিধিও বলল, “অস্ত্রগুলোর সামনে দাঁড়ালে যেন গায়ে কাঁটা দেয়।”

আরও কীসব বলতে যাচ্ছিল সে, মিত্রমাসি তাকে থামিয়ে দিলেন। “আঃ, আগে থেকে বলে অভীর মজাটা মাটি করে দিয়ো না।”

লীনা বলল, “যতই আগে থেকে বলে রাখি, ওগুলোর মুখোমুখি দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতাটাই আলাদা। ঠিক অভীর এখনকার মুখের মতোই রোমাঞ্চকর দৃশ্য।”

অভী একবার নিজের মুখে হাত বুলিয়ে নিল। সেদিকে তাকিয়ে ফিকফিক করে হাসছিল নিধি; অভী কটমট করে তাকাতেই হাসি থামিয়ে দিল। সেই দেখে লীনাও হেসে ফেলল।

অভীর মুখে যে আঘাতগুলো লেগেছিল সেগুলোর ওপর বিশল্যকরনী পাতা খেঁতো করে লাগিয়ে দিয়েছিলেন মিত্রমাসি। এখন সে পাতার রস শুকিয়ে কালচে সবুজ রং ধারণ করেছে; গোটা মুখে তার বিচিত্র বর্ণের ছোপ। ঠোঁটটা মার খেয়ে ফুলে গেছে; তার ওপরেও পাতার রস দিয়েছিলেন মিত্রমাসি। ফলে এখন তার মুখে অদ্ভুত সবজের রঙের ছাপভরতি। এই মুখ নিয়ে সবার সামনে বেরোলে...!

নিধি যেন তার মনের কথা বুঝে নিয়েই বলল, “কেউ হাসবে না।”

লীনা যোগ করল, “আমরা ছাড়া!”

“হি হি! হো হো!”

অভীর রাগও হচ্ছিল, আবার হাসিও পাচ্ছিল। লীনা একটা ছোটো আয়না বাড়িয়ে দিল। তাতে নিজের মুখ দেখে অভী এবার নিজেই হেসে ফেলল। তাকে হাসতে দেখে মিত্রমাসিও হাসলেন।

নিধি বলল, “কোনো চিন্তা নেই, কেউ হাসবার সাহসই করবে না। সবাই দেখেছে, নতুন ছেলেটা যদি একবার রেগে গিয়ে হাত চেপে ধরে, তাহলেই সব হাসি ‘ঠান্ডা’ হয়ে যাবে।”

এবারে অভী বাকিদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিতে গিয়েও পারল না। রেগে গেলেই কি তার হাত ঠান্ডা হয়ে যায়? না তো। রাগের সঙ্গে আরও কিছু একটা যেন থাকে; কী যেন একটা প্রচণ্ড আবেগ তার ভেতর থেকে উঠে আসে। কী সেটা?

বন্ধুদের সঙ্গে যখন সমরগরিমা আয়তনে পৌঁছোল অভী, তখন সূর্যাস্ত হচ্ছে। আরও অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আছে – উষসী, মৃগেন্দ্র, অরিত্র, সন্দীপ। না, তরুণ নেই। সন্দীপ ওদের দেখে হাসল, অভীও প্রত্যুত্তরে হাসল। তারপর কী মনে হতে সে এগিয়ে গেল।

সন্দীপের কাছে গিয়ে সে ফিশফিশ করে বলল, “একটা কথা জিজ্ঞেস করব?”

“বলো না।”

“আমাকে কি খুব হাস্যকর লাগছে?”

সন্দীপ হেসে তার পিঠ চাপড়ে দিল। “আরে, ওইসব চিহ্ন তো এখানে গর্বের বিষয়, বন্ধু। ওর মানে, তুমি শেষপর্যন্ত তোমার সমরগরিমা অটুট রাখতে পেরেছ। ওর চেয়ে বেশি গর্বের ব্যাপার এখানে আর কিছু আছে নাকি? ... দেখো, আড়চোখে দেখে নাও, তোমার পেছনে বামদিকে ওই তিনটে মেয়ে তোমাকে হাঁ করে দেখছে।”

অভীর আর মাথা ঘুরিয়ে দেখার সাহস হল না। “কেন? আমাকে দেখছে কেন?”

সন্দীপ হি হি করে হেসে বলল, “আজ আয়তনের সবাই দেখেছে, অত মার খাবার পরেও তুমি হার মানোনি, বরং তরুণকে উচিত শিক্ষা দিয়েছ। হ্যাঁ, হিমকুশলতার ক্ষমতাটা সকলে ভালো চোখে দেখে না ঠিকই, কিন্তু তাতে কী? তার ওপর পর্বতদা সারা আয়তনে রাষ্ট্র করে দিয়েছে গতকাল তোমার সঙ্গে

তার প্রথম দেখা হওয়ার গল্প। এইরকম সাংঘাতিক সমরগরিমা যে ছেলের, কমবয়সি মেয়েরা তার দিকে দেখবে না তো কাকে দেখবে?”

অভী-র অস্বস্তি লাগতে শুরু করেছিল। এমন সময় অধিনায়ক বজ্রধর এসে পড়াতে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

বজ্রধর বললেন, “শিক্ষার্থীগণ, তোমরা আমার সঙ্গে সংগ্রহশালায় এসো। সমরোত্তম শ্যামশ্রী ও সমরোত্তম মেঘবর্ণ ওখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।”

অভী তাড়াতাড়ি নিধি আর লীনার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বজ্রধর বললেন, “তোমাদের মধ্যে অনেকেই নতুন শিক্ষার্থী আছ। এই আয়তনের গর্বের দিকটি সম্বন্ধে তোমাদের জানানোর জন্যই এই পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা। ওখানে তোমরা এমন অনেক জিনিস দেখবে, যাদের অস্তিত্বের কথা বাইরের পৃথিবী কল্পনাই করতে পারে না; এবং কেউ কল্পনা করুক, এও আমরা চাই না। মূলতঃ এইগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই ঐশিকশ্রেষ্ঠ এই আয়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে-বিষয়ে তোমাদের বিস্তারিত বলবেন সমরোত্তম মেঘবর্ণ এবং তারপর মায়াযুদ্ধ সম্পর্কে তোমাদের প্রাথমিক ধারণা দেবেন সমরোত্তম শ্যামশ্রী। ও হ্যাঁ, সংগ্রহশালায় যা দেখবে, আয়তনের বাইরের কারও কাছে সে-বিষয়ে আলোচনা করা নিষেধ। মনে থাকবে?”

সবাই ‘হ্যাঁ’ বলল। বজ্রধর চলতে শুরু করলেন। শিক্ষার্থীরাও অনুসরণ করল তাঁকে।

একটির পর একটি কক্ষের সামনে দিয়ে যেতে যেতে অভী ভাবছিল, কী এমন আছে সংগ্রহশালায়! তার মনে পড়ল, নারদ আভাসে বলেছিলেন, যুদ্ধবিদ্যাবিষয়ক জিনিসপত্র।

কক্ষের দ্বার খোলাই ছিল। অভী দেখল, একটা অদ্ভুত ভাস্কর্য রাখা আছে একটা উঁচু বেদিতে; সেটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন অন্য দুই সমরোত্তম। ওদের আসতে দেখে তাঁরা সরে গেলেন জিনিসটার সামনে থেকে – যেন অন্য কেউ তাঁদের ওটার সামনে দেখুক, তাঁরা চান না।

ভাস্কর্যটা একটা পাথরের তৈরি হাতের আকৃতি – মণিবন্ধ থেকে আঙুলখোলা একটা হাত। আলাদা করে আর কোনো বিশেষত্ব তার নজরে পড়ল না।

ভাস্কর্যের নীচে লেখা আছে দুটি কথা – ‘সমরোত্তম সমরগরিমা’।

ছাত্রছাত্রীরা এসে সারবেঁধে দাঁড়াল সমরোত্তমদের সামনে। অভী দেখছিল, কক্ষটা এত বড়ো যে দূরের জিনিসগুলো এখান থেকে ভালো করে বোঝাই যাচ্ছে না। আজ অবশ্য আলোয় ঝলমল করছে কক্ষের ভেতরটা। দেয়ালে টাঙানো আছে বিচিত্র সব তৈলচিত্র, সাজানো আছে নানা ধরনের ভাস্কর্য, আর আছে বিশাল আকারের সব কাচের বাস্কে...

অস্ত্রশস্ত্র!

অস্ত্র যে এতরকমের এবং এত বিরাট আকারের হয়, অভী ভাবতেই পারেনি। নতুন শিক্ষার্থীদের বিস্মিত কথাবার্তা কানে এল তার।

“ওটা... ওটা কী?”

“গদা! এত বড়ো! কিম্বদন্তি এদিকে এটা কী বস্তু?”

“ওটা তো নারাচ! শুধু শুনেছি; দেখিনি কখনও!”

“আর এটা কী? কেমন বাঁকানো তলোয়ারটা দেখো!”

বজ্রধর গলার মধ্যে একটা শব্দ করলেন। কক্ষের মধ্যে শিক্ষার্থীদের গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

বজ্রধর বললেন, “শিক্ষার্থীগণ, যেসব অস্ত্র তোমাদের সামনে রাখা আছে, এদের অস্তিত্ব বেশিরভাগ মানুষই বিশ্বাস করে না। মহাকাব্যে এবং পুরাণে যেসব অস্ত্রের ব্যবহারের কথা তোমরা শুনেছ এবং পড়েছ, সেইসব ভয়ংকর অস্ত্রের অল্প কয়েকটিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে সমরগরিমা আয়তনের সংগ্রহশালা!”

লীনা ফিশফিশ করে বলল, “রামায়ণ-মহাভারতের সেইসব অসম্ভব অস্ত্র! বুঝলে?”

অভী ভাবছিল, এই নাকি ‘অল্প কয়েকটি’! ঘরটার এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত দেখাই যাচ্ছে না!

বজ্রধর বললেন, “সমরোত্তম মেঘবর্গ। দয়া করে শিক্ষার্থীদের কিছু বলো এ-বিষয়ে।”

মেঘবর্গ এগিয়ে এল। দেখে নোকাই যাচ্ছে, বলার সুযোগ পেয়ে সে খুবই খুশি। সে বলল, “শিক্ষার্থীরা, আমার সঙ্গে হাঁটতে থাকো। আমি চলতে চলতেই অস্ত্রগুলোর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেব। তবে তার আগে ইতিহাসটাও নতুন শিক্ষার্থীদের একটু জেনে নেওয়া দরকার।”

“ইতিহাস?” একটি মেয়ে নীচুগলায় বলল।

মেঘবর্গ হেসে বলল, “ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এমন ইতিহাস তোমরা কখনও শোনোনি। আর হ্যাঁ, আমাদের সংগ্রহশালার বিশাল সংগ্রহের সবগুলি নিয়ে আমি আজ বলব না, শুধু বিশেষ কয়েকটি নিয়েই আলোচনা করব। পুরোটা ভালো করে দেখতে বেশ কয়েকদিন লাগে।”

লীনা আবার অভীর কানে ফিশফিশ করে বলল, “আমরা তো পুরোনো শিক্ষার্থী। আমরাই এখনও পুরোটা দেখে উঠতে পারিনি।”

মেঘবর্গ বলতে শুরু করল। তার বলার ভঙ্গী বেশ সাবলীল; সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথা বলে। “পৌরাণিক দেবতাদের কাল অতীত হয়েছে, এ আমরা সবাই জানি। আগে যজ্ঞ করা হত দেবতাদের উদ্দেশে; সেইসব ক্রিয়াকাণ্ড কমে গেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। অথচ ভেবে দেখো, একসময় এঁরা কত সক্রিয় ছিলেন – রামায়ণ-মহাভারত জুড়ে এঁদের দেখা আমরা বারবার পেয়েছি। এঁরা সন্তান জন্ম দিয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন, রাজত্ব করেছেন স্বর্গে, আবার অসুরদের হাতে মারও খেয়েছেন। এঁদের সন্তানদের গল্পেই তো পরিপূর্ণ গোটা মহাভারত।

“এখন প্রশ্ন হল, মহাভারতে বা রামায়ণে এত যে ভয়ংকর যুদ্ধ হল, তারপর সেই রথ, মহারথ, অতিরথ যোদ্ধাদের ব্যবহার করা অস্ত্রগুলো গেল কোথায়? কোথায় গেল ভীমের গদা? অর্জুনের গাণ্ধীবধনু, কর্ণের বিজয়ধনু কোথায় গেল? রাম যখন হরধনু ভঙ্গ করলেন, তখন সেই ধনুকের ভাঙা টুকরোগুলোকে নিয়ে রাজা জনক কী করেছিলেন? যে শক্তিশেল লক্ষ্মণের

বুকে বিঁধেছিল, লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর সেটি কোথায় গেল? এরকম অজস্র যুদ্ধাস্ত্র - যেগুলো ব্যবহার করেছিলেন এই মহাবীরেরা - সেগুলো কি হারিয়ে গেল সময়ের ব্যবধানে?

“এইখানেই সমরগরিমা আয়তন দুকে পড়ল মহাকাব্যের ইতিহাসের মধ্যে।

“পুরাণে বা মহাকাব্যে যেসব দেবদেবীর কথা আমরা পড়েছি, তাঁরা ছিলেন অমিত শক্তিধর। তাই তাঁদের এবং তাঁদের আশীর্বাদ পাওয়া মহাবীরদের অস্ত্রশস্ত্রগুলিও যে অতি ভয়ংকর এবং দর্শনীয় হবে, সে-কথা না বললেও চলে। এই দেবতারা এই মুহূর্তে যেখানেই থাকুন, তাঁরা যে এখন মহাকাব্যের যুগের মতো গুরুত্ব জনজীবনে পান না, এটা কিন্তু ঠিক। কিন্তু তাঁরা আমাদের আজকের ইতিহাসের আলোচনার বিষয়বস্তু নন। আমাদের এখনকার আলোচনা যাঁদের নিয়ে, তাঁরা হলেন নতুন দেবতার মণ্ডলী - সপ্ত ঐশিক।

“ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ যে অর্থে দেবতা ছিলেন, ঐশিকরা ঐশ্বর্যে ও ক্ষমতায় তার ধারেকাছেও যান না। এঁরা কেবলমাত্র কিছু অতিলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, এবং এঁদেরকে আমরা পূজনীয় মনে করি - এইমাত্র। আকাশলোকের অধিবাসী এই ঐশিকদের মধ্যে একজন - যুদ্ধদেব - তিনি এই মহাকাব্যে উল্লিখিত হারিয়ে যাওয়া অস্ত্রগুলির কয়েকটির সন্ধান পান এবং এখানে নিয়ে আসেন। তারপর এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই তিনি স্থাপন করেন সমরগরিমা আয়তন। আমাদের সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর গুঁর প্রথম শিক্ষার্থী। করতালি দিয়ে তাঁকে আমরা অভিনন্দিত করছি।”

একসঙ্গে সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। অধিনায়ক বজ্রধর একটু বিরক্তির সুরে বললেন, “হুম, মেঘবর্ণ। ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না। এইজন্যই তোমাকে বলতে দিতে চাই না।”

মেঘবর্ণ একগাল হেসে আবার বলতে শুরু করল। “যুদ্ধদেব যেহেতু আমাদের আয়তনের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁকে আমরা ডাকি ‘ঐশিকশ্রেষ্ঠ’ নামে। তাঁর ডান বাহুতে আছে একটি উজ্জ্বল চিহ্ন - তরবারি ও সূর্য - যে চিহ্নটিকে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের গর্বিত পরিচয়চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করেছি। ঐশিকশ্রেষ্ঠের তৈরি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার আইন মেনে আজও আমরা কত সমস্যার সমাধান করছি - তোমরা তো জানোই।”

অভী স্পষ্ট বুঝতে পারল, মেঘবর্ণ আজ সকালের বিচারসভার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছে। অনেক ছেলেমেয়েই মুখ টিপে হাসছে। নিয়ামক বিনীতেশ আদৌ জনপ্রিয় মানুষ নন, বলাই বাহুল্য।

মেঘবর্ণ বলল, “এবার আমাদের ঐশিকশ্রেষ্ঠের সংগ্রহ করা কয়েকটি নমুনা দেখাই। অর্জুনের গাণ্ডীব তিনি পাননি; কর্ণের ধনুক বিজয়ও পাননি; জনকরাজের সভায় রাম যে হরধনু ভেঙেছিলেন, তার খণ্ডগুলিও পাওয়া যায়নি। তবে যেগুলি পাওয়া গেছে, এটি তার মধ্যে অন্যতম।”

দু’মানুষ উঁচু কাচের বাস্কে রাখা গদাটির দিকে চোখ পড়তেই ভয়ে যেন অভীর বুক কেঁপে উঠল। বিশালাকৃতির গদার গায়ে উঁচু উঁচু লৌহকোণ, তাদের অগ্রভাগ কালচে হয়ে গেছে। তার গায়ে বসানো আছে আটটি ছোটো ছোটো

ঘণ্টার মতো বস্তু। বাস্তবের বাইরে লেখা আছে ‘ভীমের গদা’।

বেশ কিছুক্ষণ বস্তুটার সামনে ঘোরাফেরা করার পর শিক্ষার্থীরা গেল পরের অস্ত্রের দিকে।

তারপরের উল্লেখযোগ্য নিদর্শনটি হল লক্ষ্মণকে আঘাতকারী শক্তিশেলের একটি খণ্ড। অভীর মনে হল, জিনিসটা অদ্ভুত ধরনের বর্ষার মতো দেখতে।

বজ্রধর বললেন, “মুক্ত আর অমুক্ত – এই দু’ধরনের অস্ত্র তোমরা এখানে দেখতে পাবে। মুক্ত অস্ত্র অর্থাৎ দূরবর্তী শত্রুর উদ্দেশ্যে নিষ্ক্ষিপ্ত অস্ত্র, যেমন বর্ষা; আর অমুক্ত অস্ত্র মানে হাতে ধরে লড়াই করার অস্ত্র, যেমন তরবারি। এছাড়াও মন্ত্রমুক্ত নামে আর এক ধরনের অস্ত্র হয়। যেমন পাশুপত বা ব্রহ্মশির – কিন্তু সেগুলিকে আহ্বানের মন্ত্র কারও জানা নেই এ যুগে, এবং সেগুলি সংগ্রহশালায় রাখার মতো জিনিসও নয়।”

কতরকমের প্রাচীন অস্ত্র যে ওরা দেখল, অভী গুনে উঠতে পারল না। ভিন্দিপাল, শক্তি, তোমর, চক্র, পাশ, গদা, অসিধেনু, মুষল, পট্টিশ, পরিঘ, মৌষ্টিক – অভীর সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। সন্দীপ ওর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, “মনে রাখার চেষ্টাও কোরো না। সমরোত্তমরা ছাড়া ওসব কেউ মনেও রাখে না, রাখতেও পারে না।”

শ্যামশ্রী ওদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিলেন, কিন্তু তাও যে কী করে কথাটা গুনতে পেয়ে গেলেন, কে জানে। তিনি বললেন, “সন্দীপ, সবার স্মরণশক্তি তোমার মতো উর্বর নাও তো হতে পারে।”

অভীর দিকে ফিরে জিভ কেটে সন্দীপ সরে গেল। মেঘবর্ণ একটু হেসে বলল, “চলো, আমাদের পরবর্তী আকর্ষণ সাংঘাতিক একটি জিনিস – সম্ভবত মহাকাব্যের যুগে এর থেকে বেশি মানুষ মারার কৃতিত্ব আর কোনো অমুক্ত আয়ুধের নেই। পরশুরামের কুঠার।”

কাচের বাস্তবে বিশাল কুঠারটার দিকে চেয়ে অভীর গা ছমছম করতে লাগল। জিনিসটার মধ্যে এমন একটা ভয়াবহ ব্যাপার আছে যে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। বজ্রধর বললেন, “লোকে বলে, এই কুঠার দিয়ে মারা মানুষের রক্তে সমস্তপঞ্চকে পাঁচ পাঁচটা হৃদ তৈরি হয়েছিল।”

মেঘবর্ণ বলল, “আশ্চর্যের বিষয় হল, এটির এখানে থাকার কথাই নয়। যে দু’টি রহস্যময় অস্ত্র আমাদের আয়তনের সংগ্রহশালায় থাকার কথা আমরা ভাবতেও পারি না, এটি তাদের একটি।”

অভী বলল, “‘রহস্যময়’ কেন?”

“কারণ এখানে মূলত সেইসব অস্ত্রই আছে, যাদের বর্তমান মালিককে আর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু মহাকাব্যমতে, পরশুরামের কুঠার গণেশের কাছে থাকার কথা। এখানে ও বস্তু কেন উদয় হল, তার কোনো ব্যাখ্যা আমাদের কাছে নেই।”

একটি নতুন ছাত্র প্রশ্ন করল, “এই অস্ত্রগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি?”

কয়েকজন হেসে উঠল। তাদের খামিয়ে দিয়ে মেঘবর্ণ বলল, “না সৌমিত্র। এই সংগ্রহশালার দৈবঅস্ত্রগুলির একটিও সাধারণ মানুষের লড়াইয়ে ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। এমনকি ঐশিকরাও এগুলি ব্যবহার করে যুদ্ধ করতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, উপযুক্ত কোনো বীর যোদ্ধা এইসব অস্ত্র বহন করতে অবশ্যই পারেন। আমাদের পূজনীয় ঐশিকশ্রেষ্ঠই তো এদের এনেছেন, সংরক্ষণ করেছেন।”

অভী বলল, “আর দ্বিতীয় রহস্যময় অস্ত্র?”

“তার কথাই বলব এবার। এই যে সেই অস্ত্র। ভালো করে দেখো সবাই।”

মধ্যম উচ্চতার বেদির ওপর রাখা কাচের বাক্সের মধ্যে শুয়ে আছে বাঁকা চাঁদের মতো তরবারিটি। সামনে নাম লেখা আছে – ‘চন্দ্রহাস’।

মেঘবর্ণ বলল, “এর সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য আমরা পাইনি। এইটুকু শুধু জানি, রাক্ষসরাজ রাবণের ওপর সম্ভ্রষ্ট হয়ে এই বন্ধিম তরবারিটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন শিব। কিন্তু শর্ত ছিল, এই চন্দ্রহাসকে কখনও কোনো অন্যায় কাজে ব্যবহার করা যাবে না। রাবণ সীতাহরণের সময় জটায়ুর ডানা কেটে দেন এই অস্ত্রে; এই অন্যায় কাজে ব্যবহার হওয়ার ফলে চন্দ্রহাস সম্ভ্রত শিবের কাছেই ফিরে যায়। আবার কেউ বলেন, রাবণের ছেলে ইন্দ্রজিৎ-ও নাকি চন্দ্রহাস ব্যবহার করেছেন, তবে সে মতে আমি খুব একটা বিশ্বাসী নই। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই ভয়ংকর অস্ত্রটি আমাদের আয়তনে কেন, কীভাবে উদয় হল, তা কেউ জানে না। অধিনায়ক বজ্রধর মনে করেন, এ নিয়তির ক্রীড়ামাত্র।”

অভী স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তরবারিটির দিকে। চন্দ্রহাস – চাঁদের হাসি – কী অদ্ভুত নাম! তার খুব ইচ্ছা হল, একবার হাতে নিয়ে ছুঁয়ে দেখে জিনিসটাকে, কিন্তু এই অন্যায় ইচ্ছা সে দমন করল। রাবণকে দেওয়া শিবের অস্ত্র! বাবা রে!

তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তার মনে হল, চন্দ্রহাস যেন কাঁপছে। অতি মৃদু সে কম্পন, কিন্তু কাঁপছে তো বটেই।

বাকিদের দিকে একবার দেখে নিল সে। এতজন ভিড় করে আছে কাচের বাক্সটাকে ঘিরে – কেউ কি দেখতে পাচ্ছে না কাঁপুনিটা? তার আবার ইচ্ছা হল হাত বাড়িয়ে ওটাকে ছুঁতে।

বজ্রধর বললেন, “চন্দ্রহাস অতি বিপজ্জনক এক দৈবাস্ত্র। স্বয়ং ঐশিকশ্রেষ্ঠও একদিন হঠাৎ এটিকে আবিষ্কার করে চমকে গিয়েছিলেন, স্মরণে আছে আমার।”

সবাই তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে গল্পটা শোনার আশায়, কিন্তু তিনি আর কিছু না বলে পরের নিদর্শনটির দিকে এগিয়ে গেলেন।

মেঘবর্ণও এগিয়ে চলল। একটি ক্ষুদ্রাকার বাক্সের কাছে এসে ভেতরের ছোটো ধনুকটি দেখিয়ে সে একটু হাসল। তার সঙ্গে অনুচ্চকণ্ঠে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে হেসে উঠল পুরোনো ছাত্রছাত্রীরাও। অভী ধনুকের সামনে লিখে রাখা নামটি পড়ল – ‘পুষ্পধনু’। এর মধ্যে হাসির কী আছে, সে বুঝতে পারল না।

মেঘবর্ণ বলল, “আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে এই অস্ত্রটি খুব প্রিয়। তবে আগেই বলে রাখি, এটি কিন্তু আসল জিনিস নয় – আসলটাকে অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে এই নিদর্শনটি। ইস্কুদণ্ডের তৈরি আসল ধনুকটির মালিক কামদেব; তাঁর পঞ্চশর নিক্ষেপ করতে তিনি ব্যবহার করেন এই পুষ্পধনু। এই পঞ্চশর যদি গায়ে লাগে...”

বাক্য অসমাপ্ত রেখে থেমে গেল সে। সবাই আবার হেসে উঠল।

আরও অনেক কিছু দেখল ওরা – যুধিষ্ঠিরের শঙ্খ অনন্তবিজয়, সহদেবের মণিপুষ্প, লৌহভীমের ধ্বংসাবশেষ। তারপর একটা খালি কাঁচের বাস্ত্রের সামনে এসে অভী প্রশ্ন করল, “এর মধ্যে কী ছিল?”

তিন সমরোত্তম পরম্পরের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর মেঘবর্ণ বলল, “ওখানে বরুণের একটা অস্ত্র ছিল। বর্তমানে সেটা অন্য জায়গায় রাখা আছে একটা বিশেষ কারণে।”

দীনা অভীর কানে কানে বলল, “ওখানে যে কী ছিল, আমরাও দেখিনি কখনও।”

তারপর ওরা দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলো দেখতে শুরু করল। প্রথম তৈলচিত্রটির সামনে দাঁড়িয়ে মেঘবর্ণ বলল, “আমাদের ঐশিকশ্রেষ্ঠ।”

সবাই নমস্কার জানাল একযোগে। অভী দেখল, একজন দীর্ঘদেহী, বলশালী চেহারার পুরুষ তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। নিঃসন্দেহে সুদর্শন মানুষ – তাঁর কোমরে ঝুলছে তরবারি, হাতে ধনুর্বাণ, পাশে গদা এবং বর্শা। ডান বাহুতে দেখা যাচ্ছে তীক্ষ্ণধার তরবারির হাতলে উজ্জ্বল সূর্যের ছবি। ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে তিনি যেন দেখছেন দর্শকদের দিকে, মুখে বুদ্ধিদীপ্ত হাসি। বজ্রধর বললেন, “আমাদের হাতে সমরগরিমা আয়তনকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর উনি আর আসেন না; আকাশলোক থেকেই তত্ত্বাবধান করেন। একবারই শুধু আসতে হয়েছিল তাঁকে।”

কেউ জানতে চাইল না দেখে অভীও ‘কবে’ জানতে চাইল না। কিন্তু মেঘবর্ণ তার প্রশ্নটা অনুমান করেই বলল, “শেষবার তিনি এসেছিলেন শর্বরের আক্রমণের সময়। তারপর থেকে আর তাঁর আসার দরকার পড়েনি।”

পরের তৈলচিত্রগুলোতে পরপর ছ’জন ঐশিককে দেখা গেল। তারপর এল বিভিন্ন যুদ্ধের ছবি। মেঘবর্ণ খুব উৎসাহ নিয়ে ব্যাখ্যা করে দিতে লাগল নানা রকমের যুদ্ধের কৌশল, আত্মরক্ষার কৌশল। অভী হাঁ করে শুনতে শুনতে যাচ্ছিল।

একটা ছবির সামনে এসে থেমে গেল সবাই। মেঘবর্ণ বলল, “অনেকেই জানো, তাও নতুনদের জন্য আবার বলছি। ইনি আমাদের প্রাণপ্রিয় বন্ধু – আয়তনকে রক্ষা করতে গিয়ে আত্মোৎসর্গ করেছেন। সমরোত্তম স্বর্ণশেখর।”

সমরোত্তম স্বর্ণশেখরের চোখগুলো দেখে বড়ো ভালো লাগল অভীর। মানুষের চোখ এত সুন্দর, এত করুণাপূর্ণ হয়? লম্বা চেহারা, কিন্তু মেঘবর্ণ বা বজ্রধরের মতো অতটা ব্যায়ামপুষ্ট নয় – হাতে সরু, দীর্ঘ একটি লৌহদণ্ড। বজ্রধর বললেন, “সমরগরিমা আয়তনের জন্য যে আত্মত্যাগ করেছেন

স্বর্ণশেখর, তার ঋণ আমরা জীবন দিয়েও পরিশোধ করতে পারব না। শব্দ যখন আক্রমণ করেছিল এই আয়তন, তখনকার ঘটনা বলছি। মাল্যপর্বতে আয়তনকে রক্ষা করার জন্যই তিনি যে কাজে গিয়েছিলেন, সে কাজ সমাপ্ত করে আর আয়তনে ফিরে আসা হয়নি তাঁর।”

সমরোত্তম শ্যামশ্রী অনেকক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার তিনি বলে উঠলেন, “এমন মানুষ আমি আমার সারাজীবনে দেখিনি। স্বর্ণশেখরকে তোমরা পেলে না, এ যে কত বড়ো না-পাওয়া তোমাদের রয়ে গেল, সে আমি বলে বোঝাতে পারব না।”

ছবিটার সামনে থেকে যেতে ইচ্ছা করছিল না অতীত; মনে হচ্ছিল যেন তার দিকে তাকিয়েই থাকে। কিন্তু সবাই এগিয়ে গেছে, অগত্যা তাকেও যেতে হল।

মেঘবর্ণ সেটা লক্ষ করেছিল। সে বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর, আপনার অনুমতি পেলে একটি স্বপ্ন-উপলে স্বর্ণশেখরকে আমি দেখাতে চাই শিক্ষার্থীদের।”

বজ্রধর বললেন, “অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমিই আজ প্রধান বক্তা ও প্রদর্শক। তোমার যা ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে করতে পারো।”

সমরোত্তম স্বর্ণশেখরের ছবির সামনেই একটি ছোট্টো কাচের বাস্তু রাখা ছিল, অতীত এতক্ষণে খেয়াল করল। বাস্তু থেকে একটা বড়ো আঙুলের আকারের লালচে পাথর বার করে আনল মেঘবর্ণ।

পাথরটা লালচে হলেও তার গায়ে যেন রামধনুর সাতরং খেলছে। মেঘবর্ণ বলল, “এর নাম স্বপ্ন-উপল। কোনো দৃশ্য বা কোনো শব্দকে ধারণ করার ক্ষমতা আছে এই অদ্ভুত বস্তুটির।”

সবাই সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। মেঝেতে পাথরটি সাবধানে বসিয়ে পেছনে সরে গেল মেঘবর্ণ; শিক্ষার্থীরা কৌতূহলীভাবে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

হঠাৎ দেখা গেল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্বপ্ন-উপল, আলো বেরোচ্ছে তার গা দিয়ে; ঘনঘন বদলাচ্ছে সে আলোর রং। তারপর তার আলোটা শূন্যের গায়ে সৃষ্টি করল লালচে একটা আলোয় ঢাকা দৃশ্য। সেই আলোর মধ্যে স্বর্ণশেখরকে দেখতে পেল ওরা।

তার হাতের লৌহদণ্ড থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সাত-আটজন ভীষণাকৃতির রাক্ষস ঘিরে ধরেছে তাকে; তাদের কারও হাতে গদা, কারও হাতে তরবারি, কারও হাতে এই একটু আগে দেখা অসিধেনু। কিন্তু স্বর্ণশেখরের মুখের ভাব শান্ত – একটুও উত্তেজনা নেই সেখানে।

কী অদ্ভুত গতিতে সে দণ্ডচালনা করল আর কীভাবে রাক্ষসগুলোর প্রত্যেকের হাত থেকে অস্ত্রগুলো পড়ে গেল, তা চোখে না দেখলে অতীত কোনোদিন বিশ্বাসই করতে পারত না। ভয়াবহ চোখে রাক্ষসগুলো একবার স্বর্ণশেখরের দিকে তাকাল, আর তারপরেই প্রাণপণে দৌড়ে পালাল। শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে হেসে উঠল সে দৃশ্য দেখে।

স্বর্ণশেখর সেই আলোর মাঝখান থেকে তাকিয়ে রইল পলায়নপর শত্রুর দিকে, কিন্তু পিছু ধাওয়া করল না। তার হাতের লৌহদণ্ডটি আগুন ছড়ানোর পরিমাণ কমাতে কমাতে শান্ত হয়ে গেল। স্বর্ণশেখর একবার দর্শকদের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে হাসল। তারপর স্বপ্ন-উপলের আলোটিও নিভে গেল।

মেঘবর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “স্বপ্ন-উপলটিতে এই স্মৃতি-সংরক্ষণটি আমিই করেছিলাম; ওই যে ও হাসল – আমাকে দেখেই হাসল।” – হঠাৎ আলতোভাবে চোখ মুছে নিল সে।

কিছুক্ষণ কেউ আর কোনো কথা বলল না।

অভীর চোখের সামনে যেন ভাসছিল স্বর্ণশেখরের ওই তাকানোর ভঙ্গিমাটি। কেন যে তার একটা অস্বস্তি হচ্ছে ওই বিশেষ দৃষ্টিটা দেখে, সে নিজেই বুঝতে পারল না।

বিগত দিনগুলোয় ঘটে যাওয়া শব্দ-যুদ্ধ সমেত বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি দেখতে দেখতে ওরা এগিয়ে চলল। ছবিগুলোতে অনেককেই চিনতে পারল সে – বজ্রধর, শ্যামশ্রী, মেঘবর্ণ, পর্বত, মেঘবর্ণের আহুদি।

নিধি এসে পড়েছিল অভীর কাছে। সে ফিশফিশ করে বলল, “এর পরের ছবিটা ভালো করে দেখো। সমরোত্তমরা ওটার প্রসঙ্গ খালি এড়িয়ে যায়।”

অভী তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়াল পরের তৈলচিত্রটার সামনে। এই সারির শেষ ছবি এইটি। আলোটাও এখানে কম – হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবেই।

একঝলক ছবিটা দেখেই তার মনে হল, এমন অদ্ভুত দৃশ্য সে জীবনে দেখেনি। যে লোকটিকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তার পরনে সমরোত্তমদের মতো যোদ্ধার পোশাক। মুখে গোঁফ আছে, দাড়ি কামানো সুশ্রী মুখ, কিন্তু ছবিতে তার মুখে অদ্ভুত একটা যন্ত্রণার ছাপ। সে পড়ে যাচ্ছে একটা বিশাল গর্তের মধ্যে; যেন পৃথিবীর মাটি ফেটে গিয়ে হাঁ করে আছে তাকে গিলে খাবে বলে, আর সেই ফাটল থেকে উঠে আসছে লকলকে আগুনের শিখা। লোকটির কাঁধে বিদ্ধ হয়ে আছে একটি দীর্ঘফলক বর্শা।

ছবিটার মধ্যে এমন একটা ভয়ংকরতা, এমন একটা যন্ত্রণা ছিল যে অভী চাইলেও চোখ সরাতে পারছিল না। আরও কিছুক্ষণ পর তার খেয়াল হল, বাকিদের থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সবাই নিঃশব্দে দেখছে তাকে। মেঘবর্ণের কথা বলা থেমে গেছে; বিরাট কক্ষে বিরাজ করছে সম্পূর্ণ নীরবতা।

অভী মেঘবর্ণের দিকে ফিরে বলল, “এটা কীসের ছবি?”

সে কথার উত্তর না দিয়ে মেঘবর্ণ বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর, দয়া করে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যন্ত্রণা থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন।”

বজ্রধর বললেন, “অতি উত্তম, মেঘবর্ণ। তবে আবেগপ্রবণ যত কম হবে, ততই সকলের মঙ্গল – এ-কথা তো তুমিও জানো এবং মানো। ...ঠিক আছে, এ-বিষয়ে আমিই বলছি এদের।”

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন তিনি। অভী দেখল, মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রী কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। বজ্রধর বললেন, “ওটি একজনের মৃত্যুর ছবি। আমরা সমরগরিমার প্রত্যেকে জানি, যুদ্ধ করতে গিয়ে মৃত্যু হওয়া খুবই সম্ভব।

সে মৃত্যু বেদনার বটে, কিন্তু তার মধ্যে কোথাও অগৌরব নেই। কিন্তু যদি কোনো যোদ্ধা মৃত্যুর পূর্বে সমরগরিমা বিসর্জন দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে তার শত্রুর হাতে এইরকম যজ্ঞণাময়, লাঞ্ছনাময় মৃত্যু হওয়া খুবই সম্ভব।”

সুবিশাল কক্ষে বজ্রধরের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। শিক্ষার্থীরা কেউ কোনো কথা বলছে না।

বজ্রধর আবার শুরু করলেন, ‘সমরগরিমা আয়তনের কোনো যোদ্ধার কাছে এর চেয়ে লজ্জার মৃত্যু আর কিছু হতে পারে না। ওই যে অগ্নিকূপ দেখছ, ওকে বলে ‘নরকগহ্বর’। উচ্চমানের মায়াধর আমাদের পায়ের নীচে মাটির তলায় যে আগুন আছে, সেই আগুনকে আহ্বান করতে পারেন – তখন ভূমি বিদীর্ণ হয়ে দেখা দেয় নরকগহ্বর। সেই গহ্বরেই শেষ গতি হয় সমরগরিমাহীন বিশ্বাসঘাতক যোদ্ধার।”

এই প্রথমবার বজ্রধর বলছেন এই ছবিটির বিষয়ে। সবাই চুপ করে সাগ্রহে শুনছে।

“একসময় আমাদের আয়তনে এক মহাযোদ্ধা ছিল – এক সমরোত্তম – তার নাম ছিল নীলাভ্র। অসিযুদ্ধে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না – আমিও নয়। কেবল সমরোত্তম মেঘবর্গই কিছুটা পারতেন তার সঙ্গে অসিযুদ্ধের মহড়ায়। শর্বর যখন গতবার আমাদের আক্রমণ করে, তখন আমরা সবাই পরাজিত হয়েছিলাম সেই অতর্কিত আক্রমণে। কিন্তু নীলাভ্রকে তারপর দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে শর্বর; শর্ত দেয়, নীলাভ্র যদি তাকে পরাজিত করতে পারে, সে তাহলে হার স্বীকার করে নিয়ে চলে যাবে, আর কোনোদিন আসবে না। আমরা সবাই একই সঙ্গে বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়ে পড়লাম। আমি জানতাম, নীলাভ্র যদি তরবারি হাতে তুলে নেয়, তাহলে ওকে পরাস্ত করতে পারে, এমন শক্তি সারা পৃথিবীতে নেই। স্বয়ং ঐশিকশ্রেষ্ঠও চমকে যেতেন ওর অসিযুদ্ধে পারদর্শিতা দেখে।

“আমরা সবাই যখন আসন্ন বিজয়ের আনন্দে উচ্ছ্বসিত, তখনই নীলাভ্র এমন একটা ঘটনা ঘটিয়ে বসল, যার কথা আমরা অতি বড়ো দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি কখনও। নিজের অসি শর্বরের পায়ের তলায় নামিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও; হাতজোড় করে শর্বরকে বলল, ‘আমি আমার সমরগরিমা ত্যাগ করে পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছি। আপনি বিজয়ী হলেন, শর্বর।’

“জানি না তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার, শ্যামশ্রীর, মেঘবর্গর – প্রত্যেকের মনে হয়েছিল, এ দৃশ্য দেখার আগে মরে গেলেই বোধহয় ভালো হত।”

শিক্ষার্থীরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একজন সমরোত্তম যে এভাবে সমরগরিমা বিসর্জন দিয়ে বিনাযুদ্ধে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেন, তারা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। এ কী ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা!

একটি মেয়ে প্রশ্ন করল, “তারপর কী হল?”

“তারপর শর্বর মায়াবলে নরকগহ্বর আহ্বান করল। এই ছবির মতোই মাটি দু’ফাঁক হয়ে বেরিয়ে এল তার আগুনজ্বলা হাঁ-করা মুখ। নীলাভ্রর কাঁধে একটা বর্শা ঢুকিয়ে দিল শর্বর। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, নীলাভ্র একটুও চিৎকার করল না, যন্ত্রণা সহ্য করল দাঁতে দাঁত চেপে। তারপর শর্বর লাথি মেরে তাকে ফেলে দিল সেই অগ্নিময় অতল নরকে। সেই শেষ দেখা তার সঙ্গে।”

নিধি ফিশফিশ করে বলল, “আমি শুনেছি মায়ের কাছে, তখন নাকি ঐশিকশ্রেষ্ঠ নেমে এসেছিলেন।”

বজ্রধর বললেন, “হ্যাঁ নিধি, ঠিকই শুনেছ। তাঁর নিজের হাতে গড়া সমরগরিমা আয়তন ধ্বংস হতে বসেছে দেখে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। শর্বরকে তিনি পরাজিত করেন; তারপর বন্দি শর্বরকে রেখে আসা হয় এক গোপন, সুরক্ষিত জায়গায়। ...না উষসী, সে জায়গাটির নাম আমি বলব না। যাবার আগে ঐশিকশ্রেষ্ঠ বলে গিয়েছিলেন, যদি আবার এইরকম পরিস্থিতি আসে, যদি দেখা যায় সমরগরিমা আয়তনকে রক্ষা করার মতো আর কেউ নেই, তখন একে রক্ষা করার জন্য তিনি আবার আসবেন। ...মেঘবর্ণ, এবার এসো।”

মেঘবর্ণ এসে দাঁড়াল অভীর সামনে, দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেই খোলা হাতের ভাস্কর্যটার দিকে – যার নাম ‘সমরোত্তম সমরগরিমা’। - “অভী, এই জিনিসটা তুমি দেখছিলে না একটু আগে? এর মানেটা বুঝতে পারিনি বোধহয়। পাঁচটা আঙুল নিয়ে সম্পূর্ণ হয় একটা হাত। পাঁচজন সমরোত্তম এ হাতের পাঁচ আঙুল। সে পাঁচের মধ্যে দুইকে আমরা হারিয়েছি। এখন এই হাতের ভাস্কর্যটা দেখলে মনে পড়ে যায়, আমরা সমরোত্তমরা আজ কতখানি অসম্পূর্ণ।”

শ্যামশ্রী এসে আলতোভাবে হাত রাখলেন তার কাঁধে। মেঘবর্ণ একটু হেসে পরিবেশটা হালকা করে নিয়ে বলল, “অনেক ইতিহাস পড়া হল আজ তোমাদের। একসঙ্গে এতটা হজম হলে হয়!”

সবাই হাসল – হাসতে পেরে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আবহাওয়াটা যেন বড়োই গম্ভীর হয়ে উঠেছিল।

বজ্রধর বললেন, “সমরোত্তম শ্যামশ্রী, মায়াযুদ্ধ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য...”

শ্যামশ্রী বললেন, “অধিনায়ক বজ্রধর, এই মুহূর্তে আর ওই বিষয়ে আলোচনায় মন সায় দিচ্ছে না। অবশ্য আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তাহলে আমি নিশ্চয়ই...”

বজ্রধর তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “প্রয়োজন নেই। পরবর্তী সম্মেলনে তুমি অনায়াসেই এই বিষয়ে ওদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে। ব্যস্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই।”

মেঘবর্ণ বলল, “আজ তাহলে সংগ্রহশালার শিক্ষামূলক পরিদর্শন এখানেই শেষ হচ্ছে। সবাই এবার ধীরেসুস্থে নিজ নিজ বাসভবনে ফিরে যাও।”

শিক্ষার্থীরা একে একে সারিবদ্ধভাবে বেরোতে লাগল কক্ষ থেকে। অভী একবার ঘুরে দেখল নীলাভ্রর দিকে। বিরাট গহ্বর থেকে উঠে আসা আগুনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এক আহত যোদ্ধা – দৃশ্যটা যে কেন তার এত অস্বস্তিকর

লাগছে, সে বুঝে উঠতে পারছে না।

সে বলল, “এই ছবিগুলি এঁকেছেন কে?”

মেঘবর্ণ বলল, “রক্ষোবৈদ্য। অসাধারণ চিকিৎসক, অসাধারণ চিত্রশিল্পী - আরও কত কী! গুনের শেষ নেই গুঁর।”

শ্যামশ্রী বেরিয়ে গেলেন, বহুধরও। অভীর চোখে পড়ল ছবির পাশে একটি কাঠের বেদিতে রাখা আছে একটি দীর্ঘ, ঝড় তুলেয়ার। কাঠের বাক্সে যত্ন করে তুলে রাখা হয়নি তাকে; দীর্ঘদিনের অবহেলায় ধুলো ভেমেছে অস্ত্রটার ওপর। কোনো নামও লেখা নেই তার পাশে।

মেঘবর্ণ বলল, “চলো অভী, দরজায় চাবি লাগিয়ে এবার আমরাও বেরিয়ে যাব।”

অভী বলল, “মেঘবর্ণ, এই তরবারটি কার?”

মেঘবর্ণ একটু চমকে উঠল, তারপর ঘান হাসল। অভী বুঝতে পেরে বলল, “ও, সেই বিশ্বাসঘাতকের জিনিস!”

অদ্ভুত দৃষ্টিতে মেঘবর্ণ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তার দিকে; তারপর বলল, “হ্যাঁ, ওটা নীলাভ্ররই তরবারি।”

অভী বলল, “কেমন ফ্যাকাশে, বিবর্ণ লাগছে না? না, শুধু ধুলোর জন্য নয়; কেমন যেন ‘প্রাণহীন’, ‘মরা মরা’ লাগছে এর ফলকটা।”

“কারণ গুর সমরগরিমা ছেড়ে চলে গেছে ওকে। আমরা কেউ আর তাই ওটাকে ছুঁয়েও দেখি না। বিশ্বাসহস্তার অস্ত্র ও। ...চলো এবার।”

মেঘবর্ণ এগিয়ে চলল দরজার দিকে। কৌতূহলভরে অভী দু’আঙুলে স্পর্শ করল একবার অস্ত্রটা। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সে।

তার স্পর্শমাত্রই মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিশ্বাসহস্তার অসি - তারার মতো ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠল তার শরীর জুড়ে।

আবার একমুহূর্ত পর নিভেও গেল।



।। অষ্টম অধ্যায় ।।

সমরশিক্ষা

পরের দিন সকালে অতীর জন্য দুটো অনুশীলন কার্য বরাদ্দ হল। প্রথমে শ্যামশ্রীর মায়াযুদ্ধবিদ্যার প্রাথমিক ধারণার পাঠগ্রহণ, আর তারপর মেঘবর্ণের কাছে অসিযুদ্ধ শিক্ষা।

মায়াযুদ্ধের পাঠে তার সঙ্গে যোগ দিল লীনা, নিধি, সন্দীপ, অরিত্র আর দেবদত্ত নামে একটি নতুন ছাত্র। ছাউনিতে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন শ্যামশ্রী। মেঘবর্ণও ছিল সেখানে - গল্প করছিল শ্যামশ্রীর সঙ্গে।

ওরা আসতে শ্যামশ্রী ওদের পাশাপাশি সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। মেঘবর্ণ বলল, “যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আমি এদের অনুশীলন দেখতে চাই।”

শ্যামশ্রী বললেন, “আপত্তির কী আছে? আমিও তো এদের সঙ্গে তোমার অসিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেখব।”

দেবদত্তের প্রাথমিক পরীক্ষা হয়ে গেছে অতী আসার তিনদিন আগে। সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর তাকে মায়াযুদ্ধে মনোনিবেশ করতে বলেছেন। ছেলেটিকে দেখে একটু ভীষণপ্রকৃতির মনে হয়। সেও নাকি প্রথম অস্ত্রপরীক্ষায় খুব একটা ভালো করতে পারেনি।

আকাশে রোদ ঝলমল করছে। প্রাকারপ্রান্তের গাছে গাছে পাখি ডাকছে। অতীর মনটা বেশ প্রফুল্ল লাগছে। লীনা, সন্দীপ আর অরিত্র নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। দেবদত্তের মুখ শুকনো।

অভী চাপাগলায় নিধিকে বলল, “এই ছেলেটার এরকম ভয়-ভয় ভাব কেন?”

নিধিও মুখ গভীর রেখে ফিশফিশ করে উত্তর দিল, “ছোকরার পেট খারাপ হয়েছে। তার ওপর আমি এখানে এসেই শুকে বলেছি, মায়াযুদ্ধ প্রথম প্রথম অভ্যাস করলে পেটে ভীষণ চাপ পড়ে। সেই তখন থেকে ও ভয়ে ভয়ে আছে, পাছে কাপড়ে-চোপড়ে...”

অভী অনেক কষ্টে হাসি চেপে দেখল, দেবদত্ত ভয়ে ভয়ে সমরোত্তম শ্যামশ্রীর দিকে তাকাচ্ছে। উঃ, কী দুষ্টবুদ্ধি এই মেয়েটার মাথায়!

একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল মেঘবর্ণ; শ্যামশ্রী এসে দাঁড়ালেন ওদের সামনে। ছাউনির চারদিকে তাকিয়ে বললেন, “চমৎকার সকাল। মায়াবিদ্যা শেখার পক্ষে একেবারে আদর্শ।”

শ্যামশ্রীর মুখ বরাবরের মতোই আবৃত, কণ্ঠস্বর যান্ত্রিক। কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গিমার মধ্যেই শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করে নেওয়ার ক্ষমতা আছে।

“মায়াবিদ্যার পরিধি কেমন জানো? দিগন্তরেখার মতো। যত জানবে, যত দূরে যাবে, দেখবে আরও কত কিছু অজানা রয়ে গেছে। এমনকি ঐশিকরাও জানেন না এ বিশ্বে মায়ার সীমানা কোথায় শেষ হয়। নিধি, আগের দিন তিনধরনের মায়ার কথা বলেছিলাম। মনে আছে?”

“মনে আছে, সমরোত্তম শ্যামশ্রী।”

“বলো, শোনা যাক তোমার মুখ থেকেই।”

নিধি বলল, “প্রথমে আছে মানুষেরা, যারা প্রায় সকলেই মায়াবিদ্যাহীন হয়ে জন্মায়। তাদেরকে পরিশ্রম করে এই বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করতে হয়। তবে অল্প কিছু ব্যতিক্রম আছে। সেইসব মানুষ কিছু বিশেষ ধরনের মায়াবিদ্যার আধার হয়েই জন্ম নেয়।”

শ্যামশ্রী বললেন, “এই ব্যতিক্রমের একটা উদাহরণ দিতে পারবে কেউ?”

শিক্ষার্থীরা চুপ করে আছে দেখে মেঘবর্ণ হাসিমুখে হাত তুলল। “আমি বলব?”

শ্যামশ্রী হেসে বললেন, “না, তুমি নয়। ওদেরকেই বলতে হবে। শিক্ষার্থীরা, এইরকম একটা উদাহরণ তোমরা সদ্য দেখেছ।”

অভীর মনে যে সন্দেহটা হচ্ছিল, নিধি সেটাই বলে উঠল। “অভীর সেই হিমকুশলতা!”

“একদম ঠিক।” শ্যামশ্রী বলে উঠলেন। “তবে হিমকুশলতা বড়ো সামান্য মায়াবিদ্যা নয়। একে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন, আর ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে এ জিনিস এর ধারকের জীবন লন্ডভন্ড করে দেয়।”

অভীর দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন তিনি; অভী শুকনো ঠোঁটে একবার জিভ বুলিয়ে নিল।

নিধি বলল, “তারপর আছে রাক্ষস আর অর্ধরাক্ষসরা। এরা সকলেই, সামান্য হলেও, জন্মগত মায়াধর। কারও মুখ দেখে তার সম্বন্ধে কিছু বুঝতে পারা বা খুব সাধারণ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারা – এ বিদ্যা সব রাক্ষসেরই

আছে। কিন্তু এমন বহু উন্নতমানের মায়া আছে, যা কেবলমাত্র শরীরে রাক্ষসরক্ত আছে এরকম ব্যক্তিরাই নির্মাণ করতে পারে। রাক্ষসমায়া আর মানবমায়ার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। এমন অনেক মায়া আছে, যা মানুষেরা কোনোদিনই বুঝতেও পারে না, ব্যবহারও করতে পারে না। তাই সেইসব উচ্চকোটির মায়াধর রাক্ষসকে মানুষেরা সন্দেহের চোখে দেখে।”

শ্যামশ্রী বললেন “ভালোই বললে। কেবল এই শেষ বাক্যটি তোমার নিজের সংযোজন। তাই তো?”

নিধি বলল, “আমি কি ভুল বললাম, সমরোত্তম শ্যামশ্রী?”

শ্যামশ্রী বললেন, “সে বিচার করার জন্য আজকের পাঠ সম্মেলন নয়। পরে কখনও আলোচনা করা যাবে এ নিয়ে। আপাতত তৃতীয় প্রকারের মায়াবিদের কথা শুনব আমরা। ...না নিধি, তুমি দুটো বললে। তৃতীয়টা অন্য কেউ বলো।”

সন্দীপ বলল, “আর আছেন ঐশিকরা। মানুষ বা রাক্ষসদের তুলনায় তাঁরা অনেক বেশি ক্ষমতাধর মায়াবিদ। ঐশিকমায়াও রাক্ষসমায়ার থেকে আলাদা ধরনের।”

শ্যামশ্রী বললেন, “হ্যাঁ, কিন্তু পৃথিবীর সব মায়া তাঁদেরও আয়ত্তে নয়। ...তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, গতকাল নিয়ামক বিনীতেশ মহোদয়ের রক্ষীপ্রধানের হাত থেকে চাবুকটা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল?”

সবাই হেসে উঠল। শ্যামশ্রীও হাসলেন। “একদম প্রাথমিক মায়াবিদ্যার প্রয়োগ ওটা। একটু অনুশীলন করলে তোমরাও পারবে। কিন্তু তার আগে মায়াপ্রয়োগের মূল কথাটা জেনে রাখতেই হবে। একটা উদাহরণ দিলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। একটা জিনিসকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঠেলে সরাতে গেলে কী করতে হবে? দেবদত্ত, তুমি বলো।”

দেবদত্ত ভয়ে ভয়ে বলল, “আমি ...মানে ...ইয়ে...!”

শ্যামশ্রী বললেন, “আরে, এত ভয় পাচ্ছ কেন? ঠিক আছে, তুমি না পারলে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করছি। অভী, তুমি বলো।”

অভী বলল, “বলপ্রয়োগ করতে হবে।”

“একদম ঠিক। মায়াবিদ্যার প্রাথমিক কথা এইটিই - বলপ্রয়োগ। এই বলপ্রয়োগ হয় মনের সাহায্যে, এইখানেই এই বিদ্যার মাহাত্ম্য। মনের সাহায্যে মায়াতরঙ্গের যে ধাক্কা আমি দিয়েছিলাম, তার ফলেই রক্ষীপ্রধানের হাত থেকে চাবুকটা ওইভাবে পড়ে গিয়েছিল।”

লীনা বলল, “কিন্তু সমরোত্তম শ্যামশ্রী, অভীর ওই হিমকুশলতা? ওটাও কি বলপ্রয়োগ?”

শ্যামশ্রী বললেন, “নিশ্চয়ই। এই বল, এই শক্তিতরঙ্গ তৈরি করে আমাদের মস্তিষ্ক। হিমকুশলতা খুবই কঠিন এবং উচ্চমানের মায়াবিদ্যা; অভী নিজেও এখনও জানে না কীভাবে ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কিন্তু তাও ও প্রয়োগ করে ফেলে। অভী, নিশ্চয়ই খেয়াল করে দেখেছ, সাধারণ অবস্থায় তোমার হাত স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু রেগে গেলেই ঠান্ডা হয়ে যায়।”

অভী একটু ইতস্তত করছিল সবার সামনে কথাটা বলবে কিনা; সমরোত্তম শ্যামশ্রী তার মুখের ভাব দেখে সম্ভবত কিছু একটা অনুমান করলেন। “তুমি মনে হয় কোনো একটা কথা বলতে চাইছ।”

অভী বলল, “ইয়ে, আমি একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখেছি, রেগে গেলেও কিন্তু সবসময় হাতটা ওইরকম হয়ে যায় না। আমার কাকার ওপরেও মাঝেমধ্যেই রাগ করতাম, কিন্তু কখনও হাত ঠান্ডা হয়ে যেত না।”

শ্যামশ্রীর চোখটা যেন আপনা থেকেই চলে গেল মেঘবর্ণের দিকে। অভী দেখল, মেঘবর্ণের মুখটাও যেন হঠাৎ করেই একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

শ্যামশ্রী বললেন, “হুম, শুধু রাগ নয়, আরও কিছু আছে তাহলে তোমার হিমকুশলতার পেছনে। কিন্তু সে-বিষয়ে আমরা পরে আসব। আপাতত এই কথাটি সবার মনে রাখা প্রয়োজন যে, মায়াবিদ্যার মূল কথা হল স্পর্শ না করে মানসিক শক্তি প্রয়োগ। একে আয়ত্ত্ব করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার – অতি দক্ষ ব্যক্তিরও বহু বছরের অভ্যাসে এই বিদ্যার কিছুটা রপ্ত হয় মাত্র। যেহেতু মানসিক শক্তি প্রয়োগ কীভাবে তুমি করবে, সেটা একান্তই তোমার ব্যাপার, তাই এর প্রয়োগবৈচিত্র্যের কোনো সীমা নেই। একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। তিনজন এগিয়ে এসো।”

লীনা আর নিধি এগিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। শ্যামশ্রী বললেন, “উঁহ, নিধি। গত সপ্তাহের অনুশীলনে তুমি আর সন্দীপ সুযোগ পেয়েছিলে। অভী, তুমি এসো। আর দেবদত্ত, তুমি।”

এগিয়ে যেতে যেতেই অভী নিধির গলার মধ্যে একটা খক খক কাশির শব্দ হচ্ছে শুনতে পেল। হাসি চাপার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে। দেবদত্তের মুখ দেখে মনে হল, তাকে যেন ফাঁসিকাঠে চড়ানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

“অভী আর লীনা পাশাপাশি দাঁড়াও। দেবদত্ত, তুমি দাঁড়াবে ওদের সামনে। লীনা, ওই যে চর্মকোষে তরবারি রাখা আছে, ওটা নিয়ে এসো। অভী, তোমরা দু’জন ওই কোষবদ্ধ তরবারিটি আলতো করে ধরে রাখো। দেবদত্ত, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, কীভাবে মায়াপ্রয়োগ করে দূরের বস্তু নড়াতে হয়। আমার পরে তুমি চেষ্টা করবে। তারপর লীনা, তারপর অভীর পালা।”

দেবদত্ত মুখ বিকৃত করে বলল, “আমি... আমি পারব না বোধহয়... স্-সমরোত্তম শ্-শ্যামশ্রী।”

বেচারার অবস্থা দেখে অভীর খারাপ লাগছিল। শ্যামশ্রী একটু অবাক হয়ে বললেন, “কী হল তোমার? শরীর খারাপ লাগছে?”

“আমার প্-পেটে...!”

মেঘবর্ণ এগিয়ে এল। “পেটে ব্যথা করছে?”

“একটু একটু। মায়াপ্রয়োগ করতে গেলে যদি আরও... ইয়ে, ব্যথা বেড়ে যায়?”

শ্যামশ্রী হাসলেন। “মায়াপ্রয়োগ করতে গেলে পেটে ব্যথা বাড়বে কেন? বোকা ছেলে! কোথায় শুনলে এরকম অদ্ভুত কথা?”

মেঘবর্ণ বলল, “নিধি! এ নিশ্চয়ই তোমার কীর্তি। তাই তখন থেকে মুচকি মুচকি হাসছ!”

নিধি মুখ তুলে দেখল মেঘবর্ণের চোখে তিরস্কার নেই। সে হেসে ফেলল। শ্যামশ্রী বললেন, “নিধি, তুমি পুরোনো শিক্ষার্থী হয়ে যদি নতুনদের সঙ্গে এমন করো...”

নিধি কিছু না বলে মাথা নীচু করল। শ্যামশ্রী বললেন, “কী দেবদত্ত, থাকবে? নাকি আজকের মতো ছুটি নেবে?”

মায়াবিদ্যায় পেটব্যথা বাড়ে না শুনে দেবদত্তের সাহস বেড়ে গেছে। সে একগাল হেসে বলল, “থাকব।”

“ভালো কথা। এসে দাঁড়াও তবে এখানে।”

দেবদত্ত এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে; তাঁদের মুখ অভী আর লীনার দিকে। ওরা দু’জন আলতো করে ধরে আছে কোষবদ্ধ তরবারির দুটি প্রান্ত।

শ্যামশ্রী বললেন, “যে বস্তুটিকে সরাতে হবে, তার ওপর মনঃসংযোগ করো, দেবদত্ত। যেন শুধু ওইটিই আছে তোমার সামনে, আর কিছু নেই।”

দেবদত্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তরবারির দিকে। শ্যামশ্রী বললেন, “এবার কল্পনা করো, তোমার মনের সব জোর দিয়ে তুমি আঘাত করছ ওটার গায়ে। ...না, এতেই এক্ষুনি ওই তরবারি নড়বে না – আজ তো সবে প্রথম দিন। কিন্তু কল্পনা করতে থাকো, তোমার মনের শক্তি প্রবল জলস্রোতের মতো ধাক্কা মারছে ওর গায়ে – দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করো। করছ?”

দেবদত্ত ঈষৎ মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ জানাল।

শ্যামশ্রী বললেন, “বেশ। এর পরের ধাপ, তোমার হাত দিয়ে ওই স্রোতটা বেরিয়ে আসছে, এইরকম কল্পনা করে স্রোতটাকে লক্ষ্যবস্তুর দিকে সজোরে পাঠাও। তারপর মানসচক্ষে দেখো, বস্তুটা স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। হাত বাড়াও, তারপর চেষ্টা করো।”

ওদের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে সজোরে চোখ টিপে মুখ কুঁচকে রইল দেবদত্ত। শ্যামশ্রী বললেন, “আবার বলছি, অত প্রবলভাবে চেষ্টা কোরো না। মায়াবিদ্যায় আমরা নিজেদের মনের আবেগশক্তিকে কল্পনা দ্বারা চালিত করি। জোর করলে এতে খুব ভালো ফল হয় না। ...থাক, আজ এখানেই থামো, দেবদত্ত।”

দেবদত্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত নামিয়ে চোখ খুলল। তার কপালভরতি ঘামের বিন্দু।

“এবার তুমি গিয়ে অভীর পাশে দাঁড়াও। লীনা এসো।”

লীনা যখন তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে চোখ বন্ধ করে শক্তিচালনা করছে, অভী স্পষ্ট বুঝতে পারল, তার হাতে ধরে রাখা তরবারির প্রান্তটা একটু একটু কাঁপছে। এই মানসিক শক্তিচালনার মায়া বুঝতে পেরে অভী বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

লীনার হলেই তার পালা!

শ্যামশ্রী খুশি হয়ে বললেন, “বাঃ, চমৎকার! বেশ ভালো অনুশীলন করেছে, বুঝতে পারছি। এবার অভী এসো।”

ইঠাং মেঘবর্ণ বলল, “শ্যামশ্রী, শোনো। একটা কথা আছে।”

শ্যামশ্রী তাকালেন তার দিকে। মেঘবর্ণ অনুচ্চকণ্ঠে তাঁকে কী বলল, অভী শুনতে পেল না। শ্যামশ্রী তাকিয়ে রইলেন তার দিকে কিছুক্ষণ। মেঘবর্ণ বলল, “সাবধানের মার নেই। আর যাই হোক, এতে ক্ষতি তো কিছু হবে না।”

মাথা নেড়ে শ্যামশ্রী বললেন, “লীন, দেবনন্দ, তরবারি মাটিতে রেখে বাকিদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াও।”

ওরা একটু অবাক হয়েই আদেশ পালন করল। অভীও অবাক - তাহলে কি তাকে মায়াবিদ্যা অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া হবে না? মেঘবর্ণ কী এমন বলল শ্যামশ্রীকে?

শ্যামশ্রী বললেন, “অভী, তোমার বেলায় পরীক্ষাটা একটু অন্যরকমের করছি। তরবারি রাখা থাকছে মাটিতে। তোমার কাজ - ঠিক যেভাবে বলে দিয়েছি, সেইভাবে ওটার গায়ে মনঃশক্তি দিয়ে অক্ষত করা। এসো, হাত বাড়াও।”

কেন তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা হল, অভী ভাবেন না। কিন্তু তাকে যে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না, এতেই সে খুশি।

সে চোখ বন্ধ করে কল্পনা করতে লাগল, তবু হাত থেকে বেরিয়ে আসছে প্রবল জলের ধারা, ধাক্কা মারছে বস্তুর গায়ে, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বহু, বহু দূরে।

চোখ খুলে সে দেখতে চেষ্টা করল, তরবারিটা একটু হলেও নড়েছে কিনা। কিন্তু না, ওটা যেমন ছিল, তেমনই পড়ে আছে মাটিতে।

শ্যামশ্রী মৃদু তিরস্কারের সুরে বললেন, “উহঃ, চোখ খুললে মনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। খোলা চোখে বস্তুর স্থান পরিবর্তন করতে অনেক দিনের অভ্যাস দরকার।”

অভী বলল, “আর একবার চেষ্টা করি?”

“করো। কিন্তু চোখ খুলবে না।”

চোখ বন্ধ করেই অভী জলস্রোতের কল্পনা করল। কিন্তু জল নয়, এবার আপনা থেকেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল বিরাট হিমবাহের দৃশ্য, তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের দৃশ্য। ধস নামছে বরফের - সেই প্রবল ধ্বংসাত্মক পতনবেগে চূর্ণ হয়ে মুছে যাচ্ছে নিম্নভূমি, অভী স্পষ্ট দেখতে পেল - অনুভব করতে পারল তার সর্বসত্তায় ওই ভয়াবহ শক্তিকে। বিন্দুমাত্র না ভেবেই সেই প্রচণ্ড শক্তির যতটা সে পারল, ছুড়ে মারল তরবারিটার দিকে।

পরক্ষণেই একটা ভয়াবহ চিৎকার কানে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে গেল তার। চোখের সামনে নেমে এল চাপ চাপ অন্ধকার - মনে হল, এই শরীরটার ওপর তার আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

বহুক্ষণ পরে মনে হল, কে যেন ডাকছে তাকে।

“অভী! অভী!”

চোখ খুলতে সব যেন ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছে। মেঘবর্ণ, নিধি, লীনা, শ্যামশ্রী, সন্দীপ - একে একে তার চারপাশে ঘিরে থাকা মুখগুলো চিনতে পারল সে। উঠে বসতে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা আবার ঘুরে গেল।

জলপাত্র থেকে কিছুটা জল নিয়ে তার মুখে ছিটিয়ে দিল মেঘবর্ণ। ঠান্ডা জলের স্পর্শে ঘোরলাগা ভাবটা কেটে গেল।

আবার সে উঠতে যাচ্ছিল, শ্যামশ্রী বললেন, “এখন বসে থাকো। প্রচুর শক্তি খরচ করে ফেলেছ; উঠতে গেলেই মাথা ঘুরে যাবে। আমি মিত্রভবনে সংবাদ পাঠিয়েছি - ফিরে গিয়েই গরম দুধ খেতে হবে।”

অভী বলল, “কী হয়েছিল আমার? আমি কি ওটা সরাতে পেরেছিলাম?”

শ্যামশ্রী গম্ভীরমুখে বললেন, “যে কাণ্ড তুমি ঘটিয়েছ, আমি আমার এতদিনের সমরোত্তম জীবনে কখনও দেখিনি। তোমাকে জল কল্পনা করতে বলেছিলাম; তুমি বরফ ভাবলে কেন?”

অভী বলল, “আমি ইচ্ছে করে ভাবিনি। মনে এসে গেল, তাই...”

শ্যামশ্রী বললেন, “মেঘবর্ণ, ভাগ্যিস তুমি দেবদত্ত আর লীনাকে সরিয়ে দিয়েছিলে। নয়তো আর ওদের খুঁজে পাওয়া যেত না।”

মেঘবর্ণ বলল, “এ ছেলের আবেগ-নিয়ন্ত্রণের সমস্যা আছে, আমি জানি। অভী, তুমি একজন হিমকুশল - নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রিতভাবে চালনা করাই মায়াবিদ্যার মূল কথা। তোমার কল্পনাশক্তিও প্রবল, নয়তো ওই বরফের স্রোত তুমি কল্পনা করতে পারতে না। আদর্শ মায়াযোদ্ধা হয়ে ওঠার অনেক গুণ তোমার মধ্যে আছে। কিন্তু যাকে তুমি ডেকে এনেছিলে, সে প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক শক্তি। এদের নিয়ে কোনোদিন ছেলেখেলা করতে নেই। তোমার মধ্য দিয়ে সেই শক্তি আজ হঠাৎ করেই কিছুটা বেরোনের পথ পেয়ে গিয়েছিল। নিজের আবেগ, নিজের কল্পনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেই হবে তোমাকে - নয়তো তোমার চারপাশে যারা আছে, তুমি তাদের ভয়ংকর বিপদ ঘটিয়ে ফেলবে। একবার তাকিয়ে দেখো ওইদিকে।”

অভী চমকে উঠল। তার সামনে দিয়ে যেন বয়ে গেছে তুমার ঝড় - তাদের থেকে অনেকটা দূরে জমে আছে এক বিরাটকায় বরফের টিপি। সকালের রোদে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে সেদিকে তাকালে। তরবারিটা কোথাও নেই - সম্ভবত চাপা পড়েছে ওই বরফস্তূপেরই তলায়।

শ্যামশ্রী বললেন, “মায়াবিদ্যাচর্চায় আমরা যে বল প্রয়োগ করি, তা আসে আমাদের শরীর থেকে। প্রত্যেকটি মায়াপ্রয়োগ তাই আমাদের শরীরের জমা শক্তিকে খরচ করে। তুমি যদি এইরকম অবিবেচকের মতো শক্তিব্যয় করো, তাহলে মৃত্যুও হতে পারে।”

অভী বলল, “তাই কি আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম?”

মেঘবর্ণ বলল, “হ্যাঁ। ওই প্রচণ্ড শক্তির প্রবাহ তোমার শরীর নিতে পারেনি। তুমি নিজের শক্তিদ্বারা প্রকৃতির শক্তিকে ডেকে এনে তাকে নিক্ষেপ করেছ এই সাধারণ রক্তমাংসের শরীর দিয়ে। তুমি যে ওইখানেই মারা যাওনি, এ তোমার

সৌভাগ্য বলতে হবে।”

শ্যামশ্রী গম্ভীরমুখে বললেন, “অভী, আমাকে একটা কঠোর সিদ্ধান্ত এই পরিস্থিতিতে নিতেই হবে। অধিনায়ক বজ্রধর বুঝেছিলেন, তোমার মধ্যে মায়াবিদ্যায় পারদর্শিতা আছে। তাই তিনি অসিশিক্ষার সঙ্গে মায়াবিদ্যারও চর্চা করতে বলেছিলেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তোমার এই বিদ্যার চর্চা আয়তনের অন্যদের কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই আপাতত তোমার মায়াবিদ্যার প্রশিক্ষণ আমি বন্ধ রাখছি।”

অভী হাঁ হয়ে গেল। “আর শেখাবেন না আমাকে?”

মেঘবর্ণ এসে তার কাঁধে হাত রাখল। “তুমি খুব আবেগপ্রবণ ছেলে, অভী। সেইসঙ্গে তোমার কল্পনাশক্তিও মারাত্মক, বোঝাই যাচ্ছে। মায়াবিদ্যায় এই দুটির সঙ্গে আর একটি উপাদান লাগে – সেইটির কিঞ্চিৎ অভাব তোমার এই মুহূর্তে আছে – নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা। নিজের শক্তির যা নমুনা তুমি আজ দেখালে, এইরকম সক্ষমতা মাল্যপর্বতের শ্রেষ্ঠ মায়াধর রাক্ষসদেরও নেই। তাই আমার ধারণা, তোমার আর একটু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন মানসিক পরিপক্বতা বাড়বে, তখন আবার তোমার এই বিদ্যা অনুশীলন করা উচিত। কিন্তু এই মুহূর্তে মায়াচর্চায় তোমার এবং বাকিদের ক্ষতি বই লাভ কিছু হবে না। সমরোত্তম শ্যামশ্রী সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন।”

বরফের পাহাড়টা গলে যাচ্ছে একটু একটু করে – রোদে তার সাদা গা ভিজে উঠেছে। অভী চুপ করে সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

দু’জন সমরোত্তম একটু দূরে সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। অভীর বন্ধুরা এসে বসল তার পাশে।

লীনা বলল, “অভী, মন খারাপ কোরো না। আমরা যা শিখব, চুপিচুপি শিখিয়ে দেব তোমাকে।”

নিধি তার মাথায় টোকা মেরে বলল, “হ্যাঁ, শুধু আমাদের যেন বরফে জমিয়ে মেরে ফেলো না, এইটুকু গুরুদক্ষিণা দিলেই হবে।”

এতক্ষণে অভী মন খুলে একটু হাসতে পারল। “আমি যখন অজ্ঞান হয়ে গেলাম, তখন চেষ্টা করেছিল কে?”

দেবদত্ত লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বলল, “আমি। তোমার হাত থেকে ওইরকম ভয়ংকর বেগে বরফ বেরিয়ে আসছে দেখে যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম না!”

নিধি বলল, “তারপরেও যে তুমি নিজেকে এবং নিজের পেটকে সামলে রাখতে পেরেছ, তার জন্য তোমার একটা পুরস্কার পাওনা হল।”

দেবদত্ত হি-হি করে হাসল। “হ্যাঃ! কী যে বলো তুমি!”

মেঘবর্ণ এগিয়ে এল। “অভী, তোমার অসিশিক্ষা শুরু হবে। এটিই তোমার প্রধান অস্ত্র হবে, এবং আমি তোমার নির্দেশক – অধিনায়ক বজ্রধরের নির্দেশ অনুযায়ী। বাকিরাও চাইলে থাকতে পারো।”

শ্যামশ্রী একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন; সেখান থেকেই তিনি বললেন, “এর চেয়ে ভালো অসিশিক্ষক গোটা দুনিয়ায় আর পাবে না, জানো তো তোমরা? থেকে যাও সবাই; তোমাদেরই লাভ।”

মেঘবর্ণ বলল, “আঃ শ্যামশ্রী, ক্ষান্ত দাও এবার। অভী, শরীর ঠিক আছে তো? অসিযুদ্ধ করতে পারবে তো? যদি ক্লান্ত বা অসুস্থ লাগে, তাহলে আজ থাক। পরে একদিন হবে।”

অভী জোর দিয়ে বলল, “না না, আমি ঠিক আছি।”

মেঘবর্ণ তার হাতে একটি ঋজু তরবারি তুলে দিয়ে বলল, “এখানে অনুশীলন করার জন্য কাঠের তরবারি আছে অনেকগুলি। কিন্তু আমি চাই প্রথম দিনের অনুশীলনটা তোমার আসল জিনিস দিয়েই হোক।”

অভী এই প্রথম হাতে নিল আসল কোষযুক্ত তরবারি। দীর্ঘ অস্ত্রটার সারা দেহ থেকে যেন নাগকেশর ফুলের মতো আভা বেরোচ্ছে। সে-কথা বলতে মেঘবর্ণ বলল, “ওই অসিটিকে নিতান্ত সাধারণ মানের অস্ত্র ভেবো না যেন। দুস্ত্রাপ্য ময়ূরবজ্র-লৌহনির্মিত এই তরবারি দিয়ে আমি নিজে অসিযুদ্ধ শিখেছিলাম একসময় ঐশিকশ্রেষ্ঠর কাছে। একে যত্ন করে রেখো তুমি, যতদিন অনুশীলন চলবে। খুব সুলক্ষণ, চক্রচিহ্নযুক্ত অসি।”

অভী অবাক হয়ে গেল। এহেন অমূল্য অস্ত্র তাকে দিয়ে দিচ্ছে মেঘবর্ণ!

মেঘবর্ণ বলল, “লীনা, অসির গুণাগুণ বিচারের সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় বলেছিলাম, মনে আছে?”

লীনা বলল, “আছে। শব্দ।”

“ঠিক। ব্যাখ্যা করে বলো।”

“আলগোছে অসি ধারণ করে নখ দিয়ে তার ফলকে আঘাত করতে হবে, বা ছোটো নুড়িপাথর ছুড়ে আঘাত করতে হবে। হংসধ্বনি, কাঁসার পাত্রে আঘাতের মতো ধ্বনি বা মেঘের গম্ভীর গর্জনের মতো ধ্বনি শোনা গেলে তা ভালো লক্ষণ। আর কাক, গাধা বা বীণার মতো ধ্বনি শোনা গেলে তা অতি খারাপ অসির লক্ষণ।”

“বাঃ! আজ কয়েকটি বিধিনিষেধ বলে দিচ্ছি। তারপর অসিযুদ্ধের প্রাথমিক অনুশীলন শুরু করব। শোনো সবাই, এই নিয়মগুলি ঐশিকশ্রেষ্ঠ বলেছিলেন আমাদের। অকারণে অসিকে তার কোষ থেকে বার করবে না এবং অকারণে তাকে ঘর্ষণ করবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে অসি তোমার প্রাণরক্ষা করে, তাই তাকে কখনও অসম্মান করবে না। সে তোমার সমরগরিমা অটুট রাখতে সাহায্য করে, তাই আত্মীয়ের মতো তার যত্ন করবে। কখনোই উন্মুক্ত অসিফলকে নিজের মুখ দেখবে না এবং অশুদ্ধ অবস্থায় অসিকে স্পর্শ করবে না। মনে থাকবে?”

লীনা, নিধি, সন্দীপরা একথা আগেও শুনেছে। তরবারি ওদের সকলের প্রাথমিক অস্ত্র নয়, কিন্তু তাও ওরা তরবারি-চালনা শিখতে মেঘবর্ণের কাছে মাঝে মাঝেই চলে আসে। আয়তনের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই আসে। সমরোত্তম মেঘবর্ণের কাছে অসিশিক্ষা নেওয়া মানে খুব আনন্দের সঙ্গে খুব কাজের বিদ্যা শেখার সুযোগ পাওয়া।

শেখাতে পেরে মেঘবর্ণও খুশি হয়, বলাই বাহুল্য।

নিজের তরবারি কোষমুক্ত করল সে; বলল, “কোষ ধারণ করবে বাম দিকে। বামহাতে কোষ চেপে রেখে অসি নিষ্কাশন করবে ডান হাতে।”

অভী দেখল, মেঘবর্ণের তরবারি থেকে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। মেঘবর্ণ বলল, “তরবারি চালনার জন্য যোদ্ধাকে শক্তপোক্ত হতে হয়। হাতে, বিশেষত কবজিতে জোর থাকতেই হবে, নয়তো প্রতিপক্ষের মার ঠেকাতে পারবে না। তার সঙ্গে চাই ঠান্ডা মাথা। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শত্রুর চলন, আক্রমণের ধরন, আত্মরক্ষার ধরন – এগুলো লক্ষ্য করতে হবে এবং নিজেকে বাঁচিয়ে আঘাত করতে হবে শত্রুর দুর্বলতা বুঝে। লীনা, এগিয়ে এসো।”

লীনা তার তরবারি নিয়ে এগিয়ে এল। মেঘবর্ণ বলল, “অসিযুদ্ধের একটা প্রধান বিষয় হল ‘ছলনা’। অসি বুদ্ধিমানের অস্ত্র – চতুর এবং কুশলী যোদ্ধার অস্ত্র। মনে রাখবে, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর কাছে ন্যায়যুদ্ধের প্রত্যাশা করার চেয়ে বড়ো বোকামি আর কিছু হতে পারে না। তোমার শত্রু তোমাকে ছলনা করবে; ভান করবে সে একদিক থেকে তোমাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে, কিন্তু করবে অন্যদিক থেকে। আজকের মতো সেই শিক্ষা দিয়েই শুরু করা যাক। অভী, এসো।”

অভী এসে লীনার মুখোমুখি দাঁড়াল। মেঘবর্ণ বলল, “লীনা, দেখা যাক তুমি অভীকে হারাতে পারো কিনা। অভী, শুধু তরবারি ব্যবহার করবে। হিমকুশলতা মোটেই চলবে না।”

প্রাথমিকভাবে কীরকম করে আঘাত হানতে হয়, কীভাবে সে আঘাত প্রতিরোধ করতে হয়, মেঘবর্ণ দেখিয়ে দিল; বলে দিল, “অসিযোদ্ধার চলনের এবং আক্রমণের ছন্দ থাকা ভালো, কিন্তু না থাকা আরও ভালো। প্রতিপক্ষ যদি বুঝতে পেরে যায় তোমার ছন্দ, তাহলে তোমাকে হারাতে তার বেশি সময় লাগবে না। পায়ের নড়াচড়া একটা বড়ো ব্যাপার – তার ওপর অনেকটা নির্ভর করবে তোমার জয়-পরাজয়। নাও শুরু করো এবার। লীনা আক্রমণ করবে, অভী আত্মরক্ষা করবে।”

লীনা মাথার ওপর তরবারি তুলে এগিয়ে এল দ্রুতবেগে, আঘাত হানল শূন্য থেকে অভীর মাথার ওপর। অভী মেঘবর্ণের শিক্ষামতো আড়াআড়িভাবে নিজের তরবারি দিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করল। বাকিরা হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিল তাকে। মেঘবর্ণ বলল, “বাঃ! আবার হোক।”

কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে লীনা আবার তরবারি তুলে ধরল শূন্যে। আবার সে ছুটে আসছে, অস্ত্র তুলে রেখেছে উঁচু করে – আঘাত করবে ওপর থেকে। অভী প্রস্তুত হল গতবারের মতোই আড়াআড়িভাবে আঘাত আটকানোর জন্য। লীনা সম্ভবত তার কবজির জোর পরীক্ষা করতে চাইছে এইভাবে।

লীনার অস্ত্র দ্রুতবেগে নামছে তার মাথা লক্ষ্য করে। অভী নিজের তরবারি তুলতে গেল আত্মরক্ষার জন্য। আর ঠিক সেই মুহূর্তের ভগ্নাংশের অসতর্কতায় নিজের ডান পা দিয়ে তার তলপেটে সজোরে লাথি মারল লীনা। কাতর আর্তনাদ করে মাটিতে ছিটকে পড়ল অভী।

দর্শকরা আবার হাততালি দিচ্ছে। লীনার জন্য।

অভী কোনোক্রমে উঠে দাঁড়াল। লাথিটা লীনা মোটেই আস্তে মারেনি। মেঘবর্ণের দিকে তাকিয়ে সে বলল, “কিন্তু অসিযুদ্ধে লাথি-ঘুসি অন্যায় নয়?”

লীনা দাঁত বার করে হাসল। মেঘবর্ণ বলল, “এই উপলক্ষিটাই তোমার মধ্যে জাগানোর ইচ্ছা ছিল আমার। যুদ্ধ মানে যুদ্ধই – তার থেকে বেঁচে ফিরে আসাই আমাদের লক্ষ্য। হ্যাঁ, তাই বলে অবশ্যই সমরগরিমা বিসর্জন দিয়ে নয়। তরুণ যখন তোমাকে লাথি মেরেছিল, তখন তুমি নিরস্ত্র ছিলে। আর সে মেরেছিল ঘৃণার বশে; যুদ্ধের অঙ্গ হিসাবে নয়। তাই আমিও তখন বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু মনে রাখবে, ন্যায়যুদ্ধ কেউ করে না আসল যুদ্ধক্ষেত্রে। তাই মনে এ আশা রেখো না যে তোমার প্রতিপক্ষ অন্যায় করবে না - বরং সেটাই আশা করবে এবং সতর্ক থাকবে। মনে রাখবে, মৃত যোদ্ধার থেকে জীবিত যোদ্ধাই তার দলের কাজে লাগে। সেজন্য অসিযোদ্ধাকে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হয়।”

লীনা বলল, “মারও খেতে হয় প্রচুর। এই নিধিটা কম মেরেছে আমাকে?”

সবাই হাসল। অভীও। সে বলল, “আবার হোক একবার, লীনা।”

লীনা এককথায় রাজি। “হোক না। অসুবিধা কী?”

মেঘবর্ণ দু'জন সদস্যের তিনটে দল করে দিল। অভী আর লীনা, নিধি আর অরিত্র, সন্দীপ আর দেবদত্ত। দলগুলো নিজেদের মধ্যে অভ্যাস করতে লাগল অসিচালনার বিভিন্ন কায়দা। তদারক করতে করতে মেঘবর্ণ নীচুগলায় বলল, “শ্যামশ্রী, কিছু মনে পড়ছে?”

শ্যামশ্রী শুধু গম্ভীরভাবে বললেন, “হুঁ।”

মেঘবর্ণ আবার সরে এল ছাত্রছাত্রীদের কাছে। “উঁহু অরিত্র, বামকোণ থেকে কোনাকুনি নামাতে হবে হাতটা, তার জন্য কনুইটা থাকবে এইভাবে। আঃ দেবদত্ত, শক্ত করে ধরো তরবারি; আঘাত আটকাবে হাতলের ওপরের এই জায়গাটা দিয়ে – তরবারির সবচেয়ে শক্তিশালী জায়গা এইটি, মনে রাখবে। অভী, তোমার পায়ের নড়াচড়া বেশ ভালো, কবজিতেও জোর আছে, কিন্তু তোমার হাত ঘোরানো দেখে মনে হচ্ছে তরবারি নয়, কাস্তে ধরে আছ। ওভাবে হবে না, এই ভাবে আক্রমণ করতে হবে।”

আরও কিছুক্ষণ অনুশীলনের পরে ঘরমুক্ত কলেবরে শিক্ষার্থীরা যখন হাঁপাচ্ছে, মেঘবর্ণ তখন ছুটি ঘোষণা করল। “এর পর অধিনায়ক বজ্রধর একদিন ধনুর্বিদ্যার পাঠ দেবেন। তবে তার দিনক্ষণ ভবন-অধ্যক্ষদের মাধ্যমে তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। আজ সবাই অসিবিদ্যা অনুশীলন খুব ভালো করেছে। যা আজ শিখলে, এগুলি নিজেদের মধ্যে নিয়মিত অভ্যাস করো।”

শ্যামশ্রী এগিয়ে এসে বললেন, “এখন প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষে ফিরে যাবে এবং স্নানাহার করবে। ...অভী, গরম দুধ অবশ্যই পান করবে একপাত্র। বিপুল শক্তিব্যয় করেছে আজ তুমি – সাবধান হতে হবে তোমাকে। আর হ্যাঁ, আজ দুপুরের পরে তোমরা সবাই এখানে আবার জড়ো হবে। যারা মানবমন্দির

অঞ্চলের মানুষ শিক্ষার্থী এবং যারা সুদক্ষিণসারির অর্ধরাক্ষস শিক্ষার্থী, তারা সবাই একবার নিজেদের বাড়ি গিয়ে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে পারবে। সমরোত্তম মেঘবর্ণ থাকবেন তোমাদের সঙ্গে আজকের এই ভ্রমণে।”

নিধি, লীনা, সন্দীপরা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। “আজ বাড়ি যাব! আজ বাড়ি যাব!”

রবিকাকার কথা মনে পড়ল অভীর। মেঘবর্ণ তার দিকেই তাকিয়ে ছিল; সম্ভবত তার মনের কথা বুঝেই দুঃখী দুঃখী হেসে মাথা নাড়ল।

অভীও জানে, তার পক্ষে ফিরে যাওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব নয়।

ফেরার পথে দেবদত্ত সবাইকে পেছনে ফেলে প্রায় ছুটে চলে গেল। তাই নিয়ে হাসাহাসি করতে করতেই ওরা তিনজন পৌঁছে গেল মিত্রভবনে।

মিত্রমাসি দুধের গামলা নিয়ে তৈরি ছিলেন। শুধু অভীকেই নয়, বাকি দু’জনকেও জোর করে গরম দুধ খেতে বাধ্য করলেন তিনি। উচ্ছে গেলার মতো মুখ করে খেল ওরা।

তারপর দুপুরের রোদ পড়ে এলে আয়তন থেকে দূত ডাকতে এল ওদের। “সমরোত্তম মেঘবর্ণ অপেক্ষা করছেন অনুশীলন প্রাঙ্গণে।”

বেরিয়ে যাচ্ছিল লীনা আর নিধি বাড়ি যাওয়ার খুশিতে, কিন্তু বাইরে এসেই দু’জনের খেয়াল হল তৃতীয় ব্যক্তি অনুপস্থিত। নিধি বলল, “উঃ! বাবুকে মনে হচ্ছে ঠ্যাং ধরে টেনে আনতে হবে।”

লীনা বলল, “চলো, ব্যাটাকে ধরে আনি।”

দু’জনেই এসে ঢুকল আবার মিত্রভবনে। অভী তো কিছুতেই যাবে না। “না না, তোমরা যাও। আমার দুর্বল লাগছে।”

লীনা চোখমুখ কুঁচকে বলল, “যাবে, নাকি ওবেলার মতো আর একটা দিতে হবে পেটে? সব দুর্বলতা কেটে যাবে একমুহূর্তে!”

নিধি বলল, “ভয় নেই, চলো না। মড়ার খুলিতে ফলের রস খাওয়াব।”

এবার অভী হেসে ফেলল। যাবার ইচ্ছা তার ছিল না। বন্ধুরা তাদের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে আনন্দ করবে – তার মাঝখানে অবাস্থিতের মতো এসে পড়ার ইচ্ছা তার মোটেই করছিল না। কিন্তু মেয়েদুটো এমন নাছোড়বান্দা যে না উঠে তার উপায় রইল না।

মেঘবর্ণ দাঁড়িয়ে ছিল ছাউনির কাছে। ছাত্রছাত্রীদের ছোটো ছোটো দলগুলো একে একে এসে জুটছে। মেঘবর্ণ বলল, “প্রথমে আমরা যাব মানবমন্দিরে। তারপরের গন্তব্য সুদক্ষিণসারি।”

আয়তনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মানবমন্দির এলাকা। স্থানীয় মানুষেরা এখানেই থাকে। লীনা বলল, “বেশিরভাগই খুব গরিব ওখানে, জানো? চাষবাস করে ওরা যা উপার্জন করে, তার বড়ো একটা অংশ পাঠাতে হয় আমাদের আয়তনে। না না, দান নয়; আয়তন কিনেই নেয়। কিন্তু তাও ওদের খুব অভাবে দিন কাটে।”

অভী বলল, “কেন?”

“নিয়ামক বিনীতেশ ওদের অর্ধেক দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য করেন। এই নিয়ে সমরোত্তমদের সঙ্গে তাঁর অনেকবার তর্কাতর্কিও হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারটা যেহেতু সরাসরি আয়তনের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাই অধিনায়ক বজ্রধর কিছু করে উঠতে পারেন না। বিনীতেশ আর তাঁর অনুগত কয়েকটি লোক ছাড়া এতে কারও লাভ হয় না।”

মানবমন্দির এলাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল ওরা সবাই এসে সমবেত হওয়ার পরে। সমরগরিমা যে কত বড়ো জনপদ, হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারছিল অভী। প্রায় জনা চল্লিশ ছেলেমেয়ে একসঙ্গে হাঁটছে – সবার বাড়ি অবশ্য মানবমন্দিরে নয়; সুদক্ষিণসারির অর্ধরাস্কস ছেলেমেয়েও অনেক আছে। পথ সকলেই চেনে, অভী বাদে। গল্প করতে করতে, হাসিঠাট্টা করতে করতে দলটা এগিয়ে চলল।

নিধি বলল, “কী মজা লাগছে! বোনটাকে দেখিনি কতদিন!”

অভী অবাক হয়ে বলল, “তোমার বোন আছে?”

“আছে তো।”

লীনা পাশ থেকে বলল, “আমাদের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে সুখী পরিবারের মেয়ে। বাবা-মা-বোন সব আছে ওর।”

অভী কিছু বলল না, চুপ করে থাকাই উচিত মনে করল। লীনার বাবা নেই, সে জানে।

মানবমন্দিরে পৌঁছে ওরা যাকে দেখল, তার কথা অভী ভুলেই গিয়েছিল। পর্বত বসে আছে মাঠে; আনমনে বাচ্চাদের খেলা দেখছে আর ঘাসের শিষ ছিঁড়ে চিবোচ্ছে।

ওদের আসতে দেখে সে খুশি মুখে ডাক ছাড়ল বাজখাঁই গলায়, “মেঘবর্ণ! খুব ব্যস্ত নাকি আজকাল?”

মেঘবর্ণ হেসে বলল, “তোমার মতো সৌভাগ্য করে তো আর আসিনি, পর্বত। ব্যস্ততাতেই জীবন কেটে যাচ্ছে।”

ছেলেমেয়েরা যে যার বাড়িতে গিয়ে ঢুকছে; বাবা-মায়েরা বেরিয়ে আসছেন সন্তানদের আদর করে ভেতরে ডেকে নিতে। কাউকে আবার জড়িয়ে ধরছেন মা; বুকে টেনে নিচ্ছেন বাবা। দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা কেমন যেন চিনচিন করতে লাগল অভীর।

লীনা ডাকল, “আরে, এসো। এইটা আমার বাড়ি। নিধি, তুমি তো চেনো। তুমি দেরি করছ কেন? ভেতরে এসো এখনি।”

লীনার বাড়ির মধ্যে ঢোকার আগে অভীর চোখে পড়ল তরুণ দাঁড়িয়ে আছে অন্য একটা বাড়ির দরজায়। তরুণ অবশ্য দেখেনি তাকে। সে কথা বলছে এক বয়স্ক ভদ্রমহিলার সঙ্গে – হয়তো ওর মা।

মেঘবর্ণকেও ভেতরে আসার জন্য ডাকল লীনা, কিন্তু সে একটা শুকনো হাসি হেসে বলল, “না, থাক। তোমরা যাও, আমি ... আমি একটু পর্বতের সঙ্গে গল্প করি।”

লীনার মাকে দেখলে মনে হয় যেন লীনাই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বয়স তাঁর খুব বেশি নয় – মুখের হাসিটি বেশ মিষ্টি। অভীর পরিচয় পেয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি।

লীনার বাবার একটি তৈলচিত্র টাঙানো ছিল দেয়ালে, লীনা সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল বন্ধুদের। “আমার বাবা। কী সুন্দর দেখতে ছিলেন, বলো?”

অভী আর নিধি দু’জনেই স্বীকার করল, হ্যাঁ, ভদ্রলোকের মুখশ্রী চমৎকার ছিল।

লীনার মা লতাদেবী বললেন, “শুধু বেশিদিন রইলেন না। তোকে বড়ো করে যেতে পারলেন না, এই দুঃখ নিয়েই মানুষটা চলে গেলেন।”

আঁচলের প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছলেন তিনি। লীনা একটু বিব্রতভাবে বলল, “মা, থাক না এখন ওসব কথা।”

লতাদেবী বুদ্ধিমতী মহিলা। মেয়ের বন্ধুরা অস্বস্তি বোধ করছে বুঝে তিনি দ্রুত নিজেকে সামলে নিলেন। নিমকি, মুড়ির মোয়া এনে খেতে দিলেন ওদের। গল্প করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন, “আয়তনের কতজন এসেছে আজকের সফরে?”

নিধি বলল, “তা চল্লিশ-বিয়াল্লিশ জন তো হবেই।”

লতাদেবী বললেন, “ও, তাহলে খুব বেশি ছেলেমেয়ে আসেনি এবার। সমরোত্তমদের কে এসেছেন আজ সঙ্গে?”

অভী বলল, “সমরোত্তম মেঘবর্ণ।”

লতাদেবী বললেন, “লীনা, তুই ওঁকে ভেতরে আসতে বলিসনি?”

লীনা বলল, “বলেছিলাম, মা। কিন্তু প্রতিবারের মতো এবারও উনি একটা অজুহাত দিয়ে এলেন না। সম্ভবত মাঠে বসে পর্বতদার সঙ্গে গল্প করছেন।”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, কিন্তু এ-ব্যাপারে আর কিছু বললেন না। অভী ঘরের ভেতরটা দেখছিল – মাটির দেয়ালে ফাট ধরেছে, স্যাঁতসেঁতে ছোপ ধরেছে এক কোণে। অভাবের চিহ্ন স্পষ্ট সারা ঘরে।

ভদ্রমহিলার মুখ দেখে মনে হয়, অনেক যত্নগা পেয়েছেন তিনি, কিন্তু সে যত্নগার কাছে কখনও হার মানেননি – অভাব তাঁর স্বভাবের কোমলতাকে নষ্ট করতে পারেনি।

ওদের ওঠার সময় হয়ে এসেছিল। লতাদেবী বললেন, “নিধি, তোমার বাবা-মাকে আমার নমস্কার জানিয়ো।”

তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল ওরা তিনজন। তিনি বললেন, “তিনজন একসঙ্গে থাকছ – পরস্পরের খেয়াল রেখো। জীবনে আসল বন্ধু পাওয়াটা খুব বড়ো একটা পাওয়া। অভী, তোমার বাবা-মাকেও আমার নমস্কার জানিয়ো।”

লীনা বলতে যাচ্ছিল, “মা, অভী...”, কিন্তু তার আগেই অভী তার হাতে চাপ দিয়ে চুপ করে থাকতে ইশারা করল। মৃদু কণ্ঠে সে বলল, “জানাব, নিশ্চয়ই।”

লতাদেবী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ওদের বিদায় জানালেন। সূর্য তখন পশ্চিমদিকে কিছুটা হেলে পড়েছে।

ওখানে থেকে সরে এসে অভী বলল, “লীনা, বাবা-মাকে তো মনেই পড়ে না। কাকা-ই আমার সব। তাকেই না হয় তোমার মায়ের নমস্কার জানিয়ে দেব।”

লীনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল। নিধি বলল, “চলো, ওই মাঠে ওঁরা দু'জন আছেন। আমরাও গিয়ে বসি। সবাই এলে ওঠা যাবে 'খন।”

মাঠের দিকে যেতে যেতেই অভী খেয়াল করে দেখল, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ঢোকেনি কোনো ঘরের মধ্যেই। তারা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে, গাছতলায়; কেউ বা আবার বসে আছে শানবাঁধানো পুকুরঘাটে।

মেঘবর্ণের কাছে গিয়ে মাঠের ঘাসের ওপর বসল ওরা তিনজন। বলবে কী বলবে না ভাবতে ভাবতে অভী কথাটা বলেই ফেলল, “আমাদের আয়তনের এতজন ছাত্র রাস্তায় ঘুরছে কেন? ওরা ঘরে ঢুকছে না কেন?”

কেউ কিছু বলল না, শুধু নিধি সজোরে হেসে উঠল। “সব অভিভাবক তো লীনার মায়ের মতো মানসিকতার মানুষ নন, অভী। অর্ধরাক্ষসদের তাঁরা ঘরে ঢুকতে দিতে চান না, পাছে বাসগৃহ অপবিত্র হয়ে যায়।”

অভী যেন বুঝতেই পারল না নিধি কী বলতে চায়। “তার মানে?”

“সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর যেমন আয়তনের নিয়ম পালনের ব্যাপারে খুব কড়া, অনেক মানুষ-অভিভাবকও ছেলেমেয়েদের অর্ধরাক্ষস বন্ধুদের ঘরে ঢুকতে দেওয়া নিয়ে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি কড়া।”

মেঘবর্ণ বলল, “দেখো নিধি, কে কেমন ব্যবহার করবে, তার ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারো। এই বিষয়টা আমিও বুঝি, মানুষ-বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে তাদের বাবা-মায়ের চোখের শীতল চাহনি দেখতে অর্ধরাক্ষস শিক্ষার্থীদের ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু ‘আমাদের সব ভালো আর ওদের সব খারাপ’ – এই মানসিকতাকে আমরা আয়তনে মোটেই প্রশ্রয় দিই না। মানুষ হোক বা অর্ধরাক্ষস হোক – আমাদের কাছে তার একটাই পরিচয় – সে শিক্ষার্থী। এই ভেদ দূর করার জন্যই ছাত্রছাত্রীদের জাতিনির্বিশেষে একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা চালু করতে বলেছিল নীলাভ্র।”

অভী বলল, “নীলাভ্র? মানে সেই বিশ্বাসঘাতক?”

পর্বত এতক্ষণ চুপ করে ছিল; সে এবার বলল, “আমি একটা কথা বলি এখানে। আয়তনে আর কেউ নীলাভ্রর নামই নেয় না; এমন একটা ভাব করে যেন ওই নামে কোনো মানুষ কোনোদিন ছিলই না। কিন্তু আমারও কম সময় কাটানো হল না এই আয়তনে। আমি জানি, অনেক ভালো কাজ একসময় করে গেছে লোকটা; অনেক নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা দিয়ে গেছে, যার সুফল এই মুহূর্তে ভোগ করছে প্রত্যেকে। হ্যাঁ, যে অপরাধ সে করেছে, তার ক্ষমা নেই। কিন্তু তাই বলে আয়তন যেভাবে লোকটার নামটুকুও মুছে দিতে চাইছে, সেটা, হুম, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না।”

বজ্রধরের এত চমৎকার নকল করল পর্বত যে মেঘবর্ণও হেসে ফেলল। কিন্তু তারপর একটু বিষণ্ণভাবেই সে বলল, “পর্বত, তুমিও তো ছিলে সেদিন ওখানে। আমরা সবাই পরাস্ত হয়েছিলাম সেদিন, এমনকি তুমিও। তুমি তো

জানো, সেদিন পুরো সমরগরিমায় কেউ যদি শর্বরকে থামানোর ক্ষমতা রাখত তো সেই ব্যক্তি ছিল নীলাদ্র। কিন্তু ও নিজের সমরগরিমা ত্যাগ করে, বন্ধুদের ত্যাগ করে ভীরুর মতো আত্মসমর্পণ করল। ওই মহান তরবারি ও শর্বরের সামনে মাটিতে রেখে দিতে পারল! পর্বত, তোমার মনে হয় ওই দৃশ্যের কথা মনে পড়লে আমার কষ্ট হয় না? নীলাদ্র আমার কতখানি কাছে বন্ধু ছিল, তুমি জানতে না? বজ্রধরের কাছে, শ্যামশ্রীর কাছে ও কত প্রিয় ছিল, শিক্ষার্থীরা ওকে কত ভালোবাসত, তুমি জানতে না?”

পর্বত চুপ করে রইল, অন্যেরাও কেউ কিছু বলল না। এতটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে মেঘবর্ণকে কখনও দেখেনি ওরা।

মেঘবর্ণ আবার বলল, “তুমি ভুল ভাবছ, পর্বত। আমরা সমরোত্তমরা তো শিক্ষক। ঐশিকশ্রেষ্ঠের কাছে যা শিখেছি, শিক্ষার্থীদের তাই শেখাই – যুদ্ধবিদ্যা আর তার মূলকথা সমরগরিমা। আমরা কী করে শিক্ষার্থীদের বলব, যে বিদ্যা আমরা শেখাই, যা সেই বিদ্যার একটিমাত্র দেবনির্দেশিত অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, সেই নিয়মকে ভেঙে আয়তনের মানসম্মান ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে আমাদের শিক্ষকদেরই একজন? ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমাদের সঙ্গে; আমরা যা কিছু সম্মানজনকের প্রতীক, তার সঙ্গে। আমরা ওর নাম মুছে দিতে চাইছি না পর্বত, আমরা আমাদের কলঙ্ককে ছাত্রদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছি।”

পর্বত কাঁধে হাত রাখল তার। মেঘবর্ণ মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে।

পর্বত কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সকলে চমকে উঠল প্রবল ঘণ্টাধ্বনির শব্দে।

মেঘবর্ণ ভ্রু কুঁচকে বলল, “মায়াঘণ্টা বাজাচ্ছেন সহকারী নিয়ামক নারদ। এর পরেই ঘোষণা আসছে।”

বাস্তবিকই তাই। আকাশ কাঁপিয়ে শোনা গেল মায়াবলে নারদের উচ্চরবের ঘোষণা। “সমরোত্তমগণ এবং ছাত্রছাত্রীগণ। এই মুহূর্তে সকলকে অনুশীলন মঞ্চের মাঠে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় নিয়ামক মহোদয় এক অতি জরুরি সভা আহ্বান করেছেন।”

পর্বত বিরক্তমুখে বলল, “ওঃ! ও ব্যাটা আবার নতুন কী ঝামেলা পাকাল?”

মেঘবর্ণ বলল, “জানি না, কিন্তু উনি যখনই এইরকম ‘অতি জরুরি সভা’ ডাকেন, তখনই একটা বড়োরকমের গণ্ডগোল বাধে। ...নিধি, আমি খুবই দুঃখিত। এই মুহূর্তে সবাইকে নিয়ে আয়তনে ফিরতেই হবে আমাদের। তবে কথা দিচ্ছি, সভা শেষ হতে হতে যদি সন্ধ্যাও হয়ে যায়, তাও একবার সুদক্ষিণসারিতে তোমার বাবা-মায়ের কাছে তোমাকে নিয়ে আমি যাবই। শুধু তুমিই নয়, সব অর্ধরাক্ষস শিক্ষার্থীই সুযোগ পাবে তাদের বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করার।”

সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মেঘবর্ণ যখন আবার হাঁটতে শুরু করল আয়তনের দিকে, তখনও সূর্যাস্ত হতে দেরি আছে। পূর্ব আকাশে সাদা মেঘের ওপর বিকেলের হলদে আলো পড়েছে।

মেঘবর্ণ আর পর্বত কথা বলতে বলতে একটু এগিয়ে গেছে, এমন সময় নিধি চাপাগলায় বলল, “অভী! লীনা! একটু সরে এসো। একটা কথা আছে।”

শিক্ষার্থীদের দল থেকে ওরা তিনজন একটু পাশে সরে গেল। নিধির চোখে মুখে উত্তেজনার ছাপ। অভী বলল, “ব্যাপার কী?”

“ব্যাপার তোমাকে নিয়েই। অনেকক্ষণ থেকেই বলব ভাবছি, কিন্তু ফাঁকা পাচ্ছি না। ওখানে মিত্রমাসি, এখানে সমরোত্তম মেঘবর্ণ। তারপর অবশ্য ভুলেও গিয়েছিলাম; এখন মনে পড়ল আবার।”

লীনা বলল, “কী হয়েছে, খুলে বলো দেখি।”

“আজ সকালে অস্ত্রশিক্ষার পর আমরা যখন ফিরছি, তখন সমরোত্তম মেঘবর্ণ আর সমরোত্তম শ্যামশ্রী চুপিচুপি তোমাকে নিয়ে কথা বলছিলেন, অভী। আমি তার একটুখানি শুনতে পেয়েছি।”

অভী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। লীনা বলল, “বলো, বলো!”

নিধি বলল, “মেঘবর্ণ বলছিল, ‘অভীর পায়ের কাজটা খেয়াল করেছ? তরবারি হাতে আক্রমণ ঠেকানোর ভঙ্গিটা?’ আর শ্যামশ্রী তার উত্তরে বললেন, ‘মেঘবর্ণ, আমি চাই না অভী কথাটা জানুক। যে বিষয়ের ওপর বেচারার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, সেই বিষয়ের কথা ওকে জানতে দিয়ে ওইটুকু ছেলের ওপর আমি এতবড় বোঝা চাপিয়ে দিতে চাই না।’ এইটুকু শুধু শুনতে পেয়েছিলাম, তারপর তো আমরা মিত্রভবনের পথে বেঁকে গেলাম।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “এর মানে কী? কী বিষয়ের কথা বলছিলেন ওঁরা? কীসের বোঝা?”

নিধি কাঁধ ঝাঁকাল। “কোনো ধারণাই নেই আমার।”

লীনাও অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, “তোমার আক্রমণ ঠেকানোর ভঙ্গিতে বিশেষ কোনো দ্রষ্টব্য ছিল বলে তো আমার মনে হয়নি – কেবল বেশ কিছুটা ক্যাবলামি ছাড়া!”

অভী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় মেঘবর্ণ দূর থেকে তাড়া দিল। “তোমরা আবার ওখানে দাঁড়িয়ে গল্প শুরু করলে কেন? আমাদের নিয়ামক মহোদয় বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পছন্দ করেন না, মনে রেখো। আজকে আবার তাঁর ‘অতি জরুরি সভা!’”

হেসে ওরা বাকিদের সঙ্গে যোগ দিল, কিন্তু অভীর মনে অস্বস্তির একটা কাঁটা ক্রমাগতই খচখচ করে বিঁধতে লাগল।

কী ধরনের বোঝার কথা বলছিলেন শ্যামশ্রী?



।। নবম অধ্যায় ।।

সুদক্ষিণসারি

মেঘবর্ণ বলেছিল, ‘বড়োরকমের গণ্ডগোলে’র কথা। দেখা গেল, গণ্ডগোলটা শুধু ‘বড়োরকমের’ নয়, বরং ‘বেশ বড়ো রকমের’।

নিয়ামক বিনীতেশ স্থির করেছেন, তিনি মাল্যপর্বতের রাক্ষসদের বিরুদ্ধে এখনই যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।

ওখানে পৌঁছে অভী দেখল, বজ্রধর ও শ্যামশ্রী ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়েছেন। এসেছেন মিত্রমাসিসহ বিভিন্ন ভবনের অধ্যক্ষরা। নারদ আছেন; এসে পৌঁছেছে শিক্ষার্থীরা। আর আছেন স্বয়ং তিনি – আজকের সভার আহ্বায়ক নিয়ামক বিনীতেশ মহোদয়।

মেঘবর্ণ এসে শ্যামশ্রীর পাশের আসনে বসল। অভী খেয়াল করল, নারদের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা রোগামতো একটা লোকের দিকে একবার ড্রকুটি করে তাকিয়ে নিলেন অধিনায়ক বজ্রধর।

সহকারী নিয়ামক নারদ উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুললেন। উপস্থিত ছেলেমেয়েদের গুঞ্জন বন্ধ হয়ে গেল।

পর্বত দাঁড়িয়ে ছিল অভীর পেছনে। কিছুটা ঝুঁকে অভীর কানের কাছে মুখ এনে সে বলল, “নারদের মতো ঠান্ডা মাথার দক্ষ লোক আছে বলে নিয়ামক বিনীতেশ এখনও সবদিক সামলে চলতে পারছেন। নয়তো নিজের এবং আয়তনের সর্বনাশ করে ছাড়তেন উনি এতদিনে।”

নারদ বললেন, “আমাদের মাননীয় নিয়ামক মহোদয়ের আদেশে আজ এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সভা আহ্বান করা হয়েছে। মাল্যপর্বতের রাক্ষসদের গতিবিধি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য জানা গেছে। সেই বিষয়ে আলোচনা করাই আজকের সভার উদ্দেশ্য।”

রাজনীতি, যুদ্ধনীতি অভী প্রায় কিছুই বোঝে না; তাও তার মনে হল, এই সভা তো রুদ্ধদ্বার কক্ষে ডাকলেই ভালো হত মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিয়ে – শুধু নিয়ামক, সহকারী নিয়ামক, সমরোত্তম-রা আর ছাত্রদের কয়েকজন যোদ্ধা-নাযক – এরা থাকলেই চলে যেত। কল্পনাথের খুনি এখনও ধরা পড়েনি; আয়তনে রাক্ষসদের চর থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় সবার সামনে খোলা মাঠে সভা করাটা তার কাছে খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হল না।

অবশ্য নিয়ামক বিনীতেশের কাছে ‘বুদ্ধিমানের কাজ’ আশা করাও অন্যায়।

বিনীতেশ উঠে দাঁড়ালেন। অভী মনে মনে তৈরি হল। এইবার আসতে চলেছে অতি বিপজ্জনক কিছু কথা।

বিনীতেশ বললেন, “রাক্ষসদের পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা জানতে পেরেছি। শর্বরকে মুক্ত করতে চাইছে ওরা। তার পরিকল্পনাও করা হয়ে গেছে ওদের। তাই আমার নির্দেশ, শর্বর মুক্ত হওয়ার আগেই রাক্ষসদের আক্রমণ করে তাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে নিতে হবে।”

অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, “আপনার সংবাদসূত্র কী? কোনো প্রমাণ আছে রাক্ষসদের এই তৎপরতার?”

বিনীতেশ বললেন, “আছে। আজ প্রমাণ নিয়েই সভায় এসেছি। চঞ্চল, সামনে এসো।”

অভী দেখল, নারদের পেছনে দাঁড়ানো সেই রোগা লোকটা অনিচ্ছাসহকারে এগিয়ে এল। নিধি নীচুগলায় বলল, “এ একজন অর্ধরাক্ষস। আমাদের সুদক্ষিণসারিতে মাঝেমধ্যে দেখেছি একে। কিন্তু খুব রহস্যময় লোক – ছায়াভবনে যায়, কিন্তু আসলে কী করে, কাউকে বলতে চায় না।”

বিনীতেশ বললেন, “আমার গুপ্তচর পাকা খবর এনেছে।”

লীনা কপালে হাত চাপড়ে বলল, “সবার সামনে ঘোষণা করে দিল? ও গুপ্তচর আর ‘গুপ্ত’ রইল? ওর প্রাণের দাম যে আর কানাকড়িও রইল না।”

চঞ্চল একবার অস্বস্তিভরে দেখে নিল সমরোত্তমদের দিকে। বিনীতেশ বললেন, “আমি আগেও বলেছিলাম, পীতপত্রবনের ছায়াভবনে রাক্ষসরা এসে ষড়যন্ত্র করে, আর তাতে যোগ দেয় আমাদের সমরগরিমা জনপদের অনেক অর্ধরাক্ষস। সে-কথা যে সত্যি, তা আজ আবার প্রমাণিত হয়েছে। সদ্য ওদের একটা সম্মেলন হয়ে গেছে। সেই সম্মেলনের বিষয়বস্তু তুমি সবাইকে গুনিয়ে দাও তো চঞ্চল।”

পাশ থেকে সহকারী নিয়ামক নারদ বললেন, “আর, ইয়ে, ভাষাটা একটু পরিপূর্ণ করে বোলো – একটু সংযতভাবে।”

চঞ্চলের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সবার সামনে তার গুপ্তচর পরিচয়টা প্রকাশ হয়ে যেতে সে বেশ রেগে আছে। অসম্ভবভাবে সে বলল, “আমি অশিক্ষিত অর্ধরাক্ষস। আপনাদের ওসব ‘পরিশুদ্ধ’, ‘সংযত’ ভাষা আমার আসে না। যেমনটি শুনেছি, তেমনটিই বলতে পারি, যেসব বলছি আপনাদের একটু আগে। যদি অনুমতি দেন সেইভাবেই বলার, তাহলে বলতে পারি।”

নারদ অসহায়ভাবে বললেন, “অগত্যা। বলো তোমার বক্তব্য।”

পাশে সরে গেলেন তিনি। চঞ্চল বলল, “গভীর অরণ্যে ছায়াভবন নামে যে সরাইখানা আছে, সেখানে গতকাল রাতে অনেক রাক্ষস এসেছিল মাল্যপর্বত থেকে। ওরা বলছিল, ‘সমরোত্তমরা তাদের তরবারি দিয়ে ওই গাধাটাকে ঘিরে রেখেছে বলে ওকে এখনও সহ্য করতে হচ্ছে।’ – আমি ছিলাম ওখানে; স্বকর্ণে শুনেছি এ-কথা।”

শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা প্রবল হাসির রোল উঠেই মিলিয়ে গেল। অভী দেখল, বজ্রধরের মুখ গম্ভীর, শ্যামশ্রীর তো মুখ দেখাই যায় না, কিন্তু মেঘবর্ণ প্রাণপণে হাসি চাপার চেষ্টা করছে।

অভীর পেছনে পর্বত এখনও হি হি করছে। লীনা মৃদুকণ্ঠে ধমক দিল। “আঃ পর্বতদা, চুপ করো না! তোমার হাসি শুনে আমাদের হাসি চেপে রাখা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।”

নিয়ামক বিনীতেশের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে। দারুণ ভ্রুকুটি করে তিনি তাকিয়ে রইলেন চঞ্চলের দিকে।

চঞ্চল সেদিকে একটুও মনোযোগ না দিয়ে বলে চলল, “ওরা বলছিল, অর্ধরাক্ষসদের ওপর ভয়ংকর অত্যাচার হচ্ছে ওখানে। রাক্ষসজাতি নিয়ে মিথ্যা অপপ্রচার চলছে ওখানে। ওই অপদার্থ নিয়ামকটাকে সরিয়ে শর্বরকে ক্ষমতায় না আনা পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই।”

নিয়ামক বিনীতেশ গর্জন করে বললেন, “ঢের হয়েছে! এই যথেষ্ট! বলুন সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর, এই প্রমাণ কি যথেষ্ট নয়? এখনও কি আক্রমণ করার সময় হয়নি?”

বজ্রধর বললেন, “আপনি ভালো করে বুঝুন বিষয়টা, মাননীয় নিয়ামক মহোদয়। শর্বর বন্দি আছে একটি দৈবাস্ত্রের দ্বারা। কোনো মানুষ বা রাক্ষসের দ্বারা সে বন্ধন খোলা অসম্ভব।”

নিয়ামক বিনীতেশ বললেন, “রাক্ষসরা সব পারে। ওরা দুর্দান্ত মায়াধর। ওদের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়।”

বজ্রধরের মতো গম্ভীর মানুষও এবার একটু হেসে ফেললেন। “মাননীয় নিয়ামক মহোদয়, বরুণের ‘পাশ’ দিয়ে বেঁধে আটকে রাখা হয়েছে শর্বরকে। কোনো জীবিত প্রাণীর সাধ্য নেই সে বাঁধন খোলার। স্বয়ং ঐশিকশ্রেষ্ঠ বন্দি করেছিলেন তাকে।”

নিয়ামক বিনীতেশ বললেন, “ওরা আমাকে অসম্মান করেছে। আমি যুদ্ধ চাই।”

কোনো কথা না বলে বজ্রধর স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। সেই দৃষ্টির সামনে নিয়ামক বিনীতেশ মাথা নত করতে বাধ্য হলেন।

চঞ্চল বলল, “সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর।”

বজ্রধর বললেন, “বলো।”

“আমার বাবাকে মনে আছে আপনার?”

বজ্রধরের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। তিনি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, “আছে।”

অভীদের পেছন থেকে পর্বত ফিশফিশ করে বলল, “শর্বর যখন গতবার আক্রমণ করেছিল, চঞ্চলের বাবা তখন তার বড়ো সমর্থক ছিল। এই আয়তনেই যে ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল, সে যুদ্ধে ওর বাবা মারা গিয়েছিল বজ্রধরের হাতে। চঞ্চলের বয়স তখন তোমাদের মতো ছিল, বা আর একটু বেশি। ভালো ছেলে ছিল ও; ওর বাবার মতো হিংস্র প্রকৃতির নয়। নিয়ামক বিনীতেশ আর সহনিয়ামক নারদের গুপ্তচর হিসাবে কাজ করছে ও অনেকদিন।”

চঞ্চল বলল, “বাবা যা করেছিলেন, তার দাম আয়তন তাঁকে মিটিয়ে দিয়েছে সুদে-আসলে। কিন্তু তারপরেও আমি আয়তনের প্রতি, সমরগরিমার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছি। আপনি ঠিকই বলেছেন অধিনায়ক বজ্রধর। বরুণদেবের পাশ-বন্ধন কোনো জীবিত প্রাণী খুলতে পারে না। কিন্তু সে বাঁধন কি কাটা যায় না?”

বজ্রধর বললেন, “‘পাশ’ একটি দৈবাস্ত্র, চঞ্চল। তাকে কোনো সাধারণ অস্ত্রে কাটা নিতান্তই অসম্ভব।”

“কিন্তু অন্য কোনো দৈবাস্ত্র দিয়ে?”

বজ্রধর ভ্রূ কুঁচকে রইলেন। চঞ্চল যে যুক্তি দিতে চলেছে, তিনি জানেন; তাও ওর মুখ থেকে শোনার জন্য চুপ করে রইলেন।

চঞ্চল আবার বলল, “সমরগরিমার বেশিরভাগ মানুষ অর্ধরাক্ষসদের কী চোখে দেখে, তা তো আর জানতে কারও বাকি নেই। আপনার কি মনে হয়, এই জনপদে যত অর্ধরাক্ষস আছে, তারা সবাই আপনাদের ওপর খুশি? এতজন অর্ধরাক্ষস ছাত্রছাত্রী আছে – তারা কেউ কেউ নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট। তারা অনেকেই মনে মনে হয়তো চায়, শর্বর এসে ক্ষমতায় বসুক। তাদের কারও পক্ষে আপনাদের দৈব-অস্ত্রের সংগ্রহশালা থেকে কোনো একটিকে গোপনে নিয়ে আসা কি খুব অসম্ভব? সাধারণ অস্ত্রে না হোক, ওইসব মারাত্মক ক্ষমতাধর দৈব-অস্ত্রের দ্বারা শর্বরের বন্ধন কাটা যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।”

বজ্রধর চাপা গর্জন করলেন, “আমার শিক্ষার্থীদের তুমি ‘চোর’ অপবাদ দিচ্ছ, এত বড়ো দুঃসাহস তোমার!”

নিয়ামক বিনীতেশ এতক্ষণে একটা বলার মতো কথা পেয়েছেন। তিনি বললেন, “আপনার আত্ম-অহংকারের চেয়ে অনেক বড়ো বিপদ এখন সমরগরিমার সামনে, অধিনায়ক বজ্রধর। যুদ্ধ ঘোষণা করতে চাই আমি এই মুহূর্তে।”

সমরোত্তম শ্যামশ্রী বললেন, “আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করতে চান, কারণ সে যুদ্ধে আপনাকে লড়াই করতে হবে না। মাল্যপর্বতের রাক্ষসদের পরাজিত করে

ওখানে রাজত্ব করার সাধ তো আপনার বহুদিনের, নিয়ামক মহোদয়। আপনার সেই সাধপূরণের জন্য আপনার সেনাদল – যারা রাক্ষসদের মায়াযুদ্ধের সামনে নিতান্তই অসহায় – এবং এই আয়তনের শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চান আপনি। মনে রাখবেন, মাল্যপর্বতে পত্রতিলকরা কিন্তু আমাদের সঙ্গে সখ্যতা বজায় করেই চলতে চায়। আমরা যদি এখন হঠাৎ আক্রমণ করি, তাহলে ওরাও কিন্তু অস্ত্র তুলে নেবে হাতে। আর বিমোহকরা তো আছেই – অতি ভয়ংকর যুদ্ধবাজ রাক্ষস তারা; আর তারা আমাদের সম্পর্কে আর আপনার সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করে, আমরা তো এক্ষুণি চঞ্চলের মুখেই শুনলাম। তাই একজন যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ সমরোত্তম হিসাবে আমি বলছি, আক্রান্ত না হলে আমরা আক্রমণ করব না – এইটিই এই মুহূর্তে আমাদের নীতি হওয়া উচিত। তবে এ-বিষয়ে শেষ কথা বলবেন সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর।”

“না, এ-বিষয়ে শেষ কথা বলব আমি। আমি সমরগরিমার নিয়ামক।” – ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন নিয়ামক বিনীতেশ।

সহকারী নিয়ামক নারদ পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করছিলেন বরাবরের মতো। “মানে, আমাদের মাননীয় নিয়ামক মহোদয় বলতে চাইছেন, যুদ্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন দেরি করে লাভ নেই।”

“না, নারদ!” নিয়ামক বিনীতেশ আজ যেন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। “তোমাদের মাননীয় নিয়ামক মহোদয় বলতে চাইছেন, বজ্রধরসহ এখানে প্রত্যেকে তাঁর আদেশের ভৃত্য। তিনি যা আদেশ করবেন, প্রত্যেকে তা মানতে বাধ্য।”

ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে ক্রুদ্ধ অসন্তোষের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। মেঘবর্ণ, শ্যামশ্রী – দু’জনেই উঠে দাঁড়ালেন। মেঘবর্ণের হাত তরবারির মুষ্টিতে; তার চোখ যেন জ্বলছে রাগে। শান্ত কিন্তু ভীতিপ্রদ কণ্ঠে সে বলল, “পরের শব্দগুলো সাবধানে, ভেবেচিন্তে উচ্চারণ করবেন, নিয়ামক মহোদয়। আমাদের সামনে অধিনায়ক বজ্রধরকে মন্দবাক্য বলে আপনি নিষ্কৃতি পেয়ে যাবেন, এমনটা স্বপ্নেও ভাববেন না।”

বজ্রধর তাকে চুপ করতে চোখের ইশারা করে শিক্ষার্থীদের দিকে ফিরে হাত তুললেন; তারা শান্ত হয়ে গেল। তিনি বললেন, “মাননীয় নিয়ামক মহোদয়, একই ভুল আপনি বারবার করেন। আপনাকে তাই আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, সমরোত্তমরা আপনার ভৃত্য নন – ঐশিকশ্রেষ্ঠের তৈরি করা নিয়মের বলে আপনার সুরক্ষার ব্যবস্থা তাঁরা করে থাকেন, এ-কথা অবশ্য ঠিক। যেসব মানুষ ও অর্ধরাক্ষস শিক্ষার্থী এখানে আছে, আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য তারাও নয়। ভৃত্য যদি কেউ থাকে, সে আপনি, নিয়ামক মহোদয় – সমরগরিমার লোকেদের সেবা করার জন্য আপনি ওই আসনে বসেছেন। সেই উদ্দেশ্য যদি ভুলে গিয়ে থাকেন, সেই কর্তব্য পালনে যদি অসমর্থ হন, তাহলে ওই আসন থেকে নেমে যাওয়াই আপনার পক্ষে সম্মানজনক হবে।”

নিয়ামক বিনীতেশ বললেন, “অধিনায়ক বজ্রধর, আপনার আত্ম-অহংকার

আপনাকে অক্ষ করে রেখেছে এমনভাবে যে, চঞ্চলের আনা খবরটা আপনি শুনতেই চাইছেন না।”

বজ্রধর বললেন, “চঞ্চলের আনা সংবাদ তো শুনলাম। আরও কিছু আছে নাকি?”

চঞ্চল বলল, “উর্গায়ু এসেছিল দিন কয়েক আগে ছায়াভবনে। খুব উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছে সে। বলেছে, একমাত্র শর্বরই পারে রাক্ষসদের এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করতে। রাক্ষসদের নায়ক সে; রাক্ষসদের মঙ্গল করতে গিয়েই আজ সে বন্দি। তাই তাকে মুক্ত করে সর্বশক্তি নিয়ে সমরগরিমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াই এই মুহূর্তে প্রত্যেকটি রাক্ষস ও অর্ধরাক্ষসের ধ্যানজ্ঞান হওয়া উচিত।”

তিন সমরোত্তমের মধ্যে দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় হল। তারপর বজ্রধর বললেন, “উর্গায়ুটা কে?”

চঞ্চল বলল, “সে যে আসলে কে, কেউ জানে না। তবে বোঝা যায়, শর্বরের খুব বড়ো অনুগামী। রূপান্তরে ভীষণ দক্ষ – মুহূর্তের মধ্যে যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারে। সে-ই বলছিল, শর্বরের বরুণপাশের বন্ধন কীভাবে ছেদন করা যায়, সে জানে।

নিয়ামক বিনীতেশ বললেন, “কীভাবে ছেদন করা যায়?”

বজ্রধর বললেন, “যায় না। এই উর্গায়ু খুব ধূর্ত খেলোয়াড়, বোঝাই যাচ্ছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে রাক্ষসদের খেপিয়ে তুলছে সে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “আর যদি ধরে নিই, সেই বন্ধন কোনো দিব্যাস্ত্র দ্বারা কাটা যায়, তাহলেও বলব, কোনোভাবেই সংগ্রহশালা থেকে কোনো অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যে কাচের বাক্সগুলিতে অস্ত্রগুলি রাখা আছে, তার চারপাশে অদৃশ্য মায়াবর্ম দেওয়া আছে। সমরোত্তমরা ছাড়া আর কেউ ওই কক্ষে ঢুকতেও পারে না – কারণ আর কারও কাছে ওর চাবি নেই – আপনার কাছে অবশ্য একটি আছে, নিয়ামক মহোদয়। ছাত্রছাত্রীদের কারও পক্ষে সবার অগোচরে কোনো একটি অস্ত্র নিয়ে রাক্ষসদের কাছে পৌঁছে দেওয়া নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার।”

অসম্ভব মুখে নিয়ামক বিনীতেশ উঠে দাঁড়ালেন। শিক্ষার্থীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল; তারা বুঝেছে, নিয়ামক মহাশয় এবার স্থানত্যাগ করবেন। পর্বত নীচুগলায় বলে উঠল, “অবশেষে ‘জরুরি সভা’ শেষ হইল এবং যথারীতি অশ্বাভিষেক প্রসব করিল!”

নিয়ামক বিনীতেশ ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে হেঁটে চললেন সভা ছেড়ে। অতী দেখল, সহকারী নিয়ামক ওদের দিকে আসছেন। কাছে এসে তিনি বললেন, “নিধি, তোমার সঙ্গে একটু দরকার আছে। একবার একটুক্ষণের জন্য আমার কার্যালয়ে এসো তো।”

বলেই হস্তদস্ত হয়ে আবার নিয়ামক বিনীতেশের পিছু পিছু চললেন তিনি। নিধিও হাঁটা দিল তাঁর সঙ্গে। অতী বলল, “বারবার নারদের কাছ থেকে ওর জন্য ডাক আসছে কেন?”

দেখতে পাচ্ছি। তোমরা যাও, আমি কমলার রস খেতে খেতে একটু গল্প করি পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে।”

মেঘবর্ণ চলে গেল। নিধি বলল, “মেঘবর্ণ আগে অনেকবার এসেছে আমাদের বাড়ি। এখানের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর বাড়িতেই একবার হলেও গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করেছে সে। এই একটিমাত্র লোক যাকে অপছন্দ করে এমন কেউ সুদক্ষিণসারিতে নেই।”

লীনা বলল, “হুঁ, মানবমন্দিরেও একই ব্যাপার। কিন্তু সবার বাড়ি যায়, শুধু আমার বাড়িতে আসবার কথা বললেই নানারকমের অজুহাত দেখায়।”

দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন নিধির মা; ওদেরকে দেখে খুব যত্ন করে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

ভেতরে ছিলেন নিধির বাবা। অভী আর লীনা দু'জনকেই প্রণাম করল।

নিধির বাবা গম্ভীর প্রকৃতির অর্ধরাক্ষস। নিধি পরিচয় করিয়ে দিল, “বাবা, লীনাকে তো অনেকবার দেখেছ। এ অভী। আমরা তিনজন আছি মিত্রভাবে।”

নিধির বাবা বললেন, “মানুষ তো তুমি?”

অন্য কোথাও এ প্রশ্ন শুনলে অভীর হাসি পেয়ে যেত, কিন্তু নিধির বাবা যা রাশভারী! সে মৃদুস্বরে বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“কেমন লাগছে সমরগরিমা আয়তন?”

“ভালো লাগছে।”

“মানুষদের ওখানে ভালো লাগারই কথা।”

নিধির মা বললেন, “আবার তুমি শুরু করেছ? অভী আজ প্রথমবার এল আমাদের বাড়িতে! কী ভাববে ছেলেটা?”

সেদিকে কান না দিয়ে নিজের পাকা গোঁফে আঙুল চালাতে চালাতে নিধির বাবা বলে চললেন, “নিয়ামক বিনীতেশ মনে করেন, আমরা অর্ধরাক্ষসরা সবাই শর্বরকে সমর্থন করি; আমরাই নাকি গতবার তাকে ক্ষমতায় আনতে চেয়েছিলাম। আমাদের যে সমরগরিমায় শুধু গোরু-ছাগলেরও অধম মনে করা হয়, তা নয়; প্রতি পদে আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের দয়ায় আমরা বেঁচে আছি।”

অভীর খারাপ লাগছিল। এইসব কথা শুনতে হবে জানলে সে আসত না। সে বলল, “সমরোত্তমরা কিন্তু কোনো ভেদাভেদে বিশ্বাসী নন।”

নিধি রাগতঃসুরে বলল, “বাবা, তোমার ওই অসন্তোষের কথাগুলো শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। নিয়ামক বিনীতেশ লোকটা ভালো নয়, সবাই জানে। কিন্তু সে যেমন মানুষ হয়ে সব অর্ধরাক্ষসকে একই রকম মনে করে, তেমনই তুমিও অর্ধরাক্ষস হয়ে সব মানুষকে একরকম ভেবে বিচার করছ। আমার বন্ধুদের সামনে অন্তত এইসব কথা বন্ধ করো।”

“বন্ধু? তুই কি ভাবিস এরা তোকে নিজেদের সমান ভাবে? মানুষদের চোখের অন্যরকম দৃষ্টি দেখতে পাস না তুই? ওদের চোখে তুই শুধু একটা রাক্ষস – তার বেশি কিছু নয়। ওই সমরগরিমা আয়তনে কী শেখায় তোদের, আমি জানি না? ওখানে ওইসব বড়ো বড়ো যোদ্ধারা ‘রাক্ষস’ মারতে শেখায় –

আমাদের মারার পদ্ধতি শেখায়।”

নিধির চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। লীনা আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত রেখে অল্প চাপ দিয়ে বোঝাতে চাইল, “ঠিক আছে, আমরা কিছু মনে করিনি।”

নিধির মা বললেন, “লীনা, অভী! তোমরা কিছু মনে কোরো না, লক্ষ্মী মা, লক্ষ্মী বাবা! বয়স হচ্ছে তো – তাই এখন খালি এইসব উলটোপালটা বকেন! এই দিনকয়েক আগে রাতের বেলা জঙ্গলে গিয়ে কীসব বক্তৃতা শুনে এলেন ছায়াভবন থেকে। তারপরেই এইসব বাজে বকা আরও বেড়েছে।”

এরা তিনজন হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেল।

নিধি সতর্ককণ্ঠে বলল, “মা, খিদে পাচ্ছে। কিছু নিয়ে এসো না জলদি। ... বাবা, কার বক্তৃতা শুনলে, বলো তো।”

নিধির বাবা বললেন, “উর্গাযু। রাক্ষসের মতো রাক্ষস বটে একজন! যেমন সুন্দর কথা বলে, তেমনই তার তেজ। পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল, রাক্ষসদের ওপর, অর্ধরাক্ষসদের ওপর কত অত্যাচার হয়ে চলেছে এতদিন ধরে। তার বদলা নিতেই হবে আমাদের। শর্বরকে ফিরিয়ে আনতে না পারলে আমাদের অর্ধরাক্ষসদের চিরকাল দাসত্বেই কাটাতে হবে।”

নিধিদের ঘর খুব বড়ো নয়; তেলের প্রদীপ জ্বলছিল। একটু দূরেই খাবার জোগাড় করছিলেন তার মা – সব কিছু ফেলে ছুটে এসে বৃদ্ধের মুখ চেপে ধরলেন তিনি। “ওগো, দোহাই তোমার, চুপ করো! এসব কথা কারও সামনে বোলো না! সংসারসুদ্ধ সবাইকে মারতে চাও নাকি?”

অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইলেন নিধির বাবা। “কে মারবে বলো তো আমাদের এসব শুনলে? আয়তনের লোকেরা? তোমার মেয়ে – সেও তো এখন আয়তনের লোক! সেও কি মারবে আমাদের? তার ‘বন্ধু’রাও?”

অভী কী বলবে, ভেবে পেল না। বৃদ্ধ আপনমনে মাথা নাড়ছেন। তাঁর ছায়া নড়ছে আস্তুরণ খসে-পড়া দেওয়ালের গায়ে দীপের আলোতে। লীনা বলল, “আমরা আয়তনের লোক ঠিকই, কিন্তু আমরা ঘরের লোকেদের সঙ্গে শত্রুতা করিনা; বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার প্রস্তুতি নিই।”

নিধি বলল, “লীনা, থাক। এসব কথা তুমি বাবাকে বোঝাতে পারবে না। ...মা, নীপা কোথায়?”

“এই বিকেলের পর অবেলা করে ঘুমোল। ওই যে, পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে এখনও। ডাকব?”

“না, আর একটু ঘুমিয়ে নিক। যাওয়ার আগে দেখা করে যাব।”

ঘরে তৈরি কিছু মিষ্টির থালা সাজিয়ে ওদের খেতে দিলেন নিধির মা, জল দিলেন পিতলের ঘটিভরে। ওরা খাওয়া শুরু করল।

নিধির বাবা বসে আছেন চুপ করে জানালার দিকে তাকিয়ে। নিধির মা বললেন, “ওঁর কথায় দুঃখ পেয়ো না তোমরা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি খিটখিটে হয়ে যাচ্ছেন আরও। তবে কী জানো, অর্ধরাক্ষসদের বেশিরভাগ মানুষই পছন্দ করে না, এটা কিন্তু ঠিক।”

নিধি বলল, “মা, অর্ধরাক্ষসরাও অনেকেই মানুষদের পছন্দ করে না, এটাও কি ঠিক নয়? আমাদের জাতেরও কি কোনো দোষ নেই?”

“হয়তো আছে। কিন্তু আমাদের তারককে কীরকম নিষ্ঠুরভাবে অকারণে খুনি সন্দেহে মারা হয়েছিল, বলো তো লীনা? কীই বা এমন অপরাধ ছিল বেচারার? মড়ার খুলির মতো জিনিস তোমাদের সমাজে হয়তো খুব নিন্দনীয়, কিন্তু আমাদের সমাজে আমরা ওইধরনের জিনিস নিত্য ব্যবহার করি। শুধু ওইটুকু রীতিনীতির পার্থক্যের জন্য নির্দোষ বেচারাকে সেদিন ওরা মেরেই ফেলত, যদি না অধিনায়ক বজ্রধর বাধা দিতেন। কিন্তু এ-কথাও তো সত্যি, চাইলে সমরোত্তমরা সেদিন ওর মার খাওয়া আটকাতে পারতেন।”

অভী বলল, “ওঁরা চেষ্টার ক্রটি রাখেননি।”

“হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু ভেবে দেখো, ওই আয়তনে তোমাদের রাক্ষস মারার জন্য যুদ্ধ করতে শেখায় না? আমাদের মতো অর্ধরাক্ষসদেরও তো অনেক মানুষ ‘রাক্ষস’ই মনে করে। ভেবে দেখো অভী, আমরা যে প্রতিবেশীর সঙ্গে বাস করি, তারা এক-একজন মহাশক্তিশালী যোদ্ধা, আর তাদের চিন্তার মূলে আছে কী কী উপায়ে রাক্ষসদের মারা যায়। আমরা কীভাবে এই সুদক্ষিণসারিতে বেঁচে আছি, ধারণা করতে পারো তুমি? কেন আমাদের এত যত্নগা? আমরা ‘মানুষ’ নই বলে?”

হঠাৎ গর্জন করে একটা ভারী কিছু ওদের সামনে লাফিয়ে পড়ল। সবাই চমকে উঠেছিল। অভীর হাত আপনা থেকেই চলে গিয়েছিল কোমরে ঝোলানো তরবারির মুষ্টির দিকে।

নিধি চোঁচিয়ে উঠল, “উঃ নীপা! তুই কি কোনোদিন একটু ভদ্রতা-সভ্যতা শিখবি না?”

নিধির বোন! অভী চুপিসারে তরবারি থেকে হাত সরিয়ে নিল।

সেটা খেয়াল করেছিলেন নিধির মা। একটা করুণ হাসি হেসে তিনি বললেন, “তুমিও বাকিদের থেকে আলাদা কিছু নও, অভী। অর্ধরাক্ষসদের মধ্যে থাকলে বিপদের চিন্তা, শত্রুর চিন্তা – এইসবই আগে মাথায় আসে মানুষদের।”

অভী লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করল। নিধির বোন নীপা বলল, “তুমি আমার দিদির বন্ধু?”

ভারী মিষ্টি দেখতে মেয়েটাকে। নিধির সঙ্গে মুখের মিল আছে, তবে এ বেশ মোটাসোটা। অভী বলল, “হ্যাঁ।”

একটা ছোটোমতো জিনিস তার হাতে তুলে দিল নীপা। অভী অবাক হয়ে দেখল, জিনিসটা একটা শঙ্খ। একটু অদ্ভুত, কারণ এর রং ঘন নীল। এরকম শাঁখ সে আগে কখনও দেখেনি। অবাক হয়ে তাকাল সে।

নিধির মা বললেন, “এ আমাদের রীতি। নতুন কেউ প্রথম আমাদের বাড়িতে এলে তাকে কিছু উপহার দিই আমরা।”

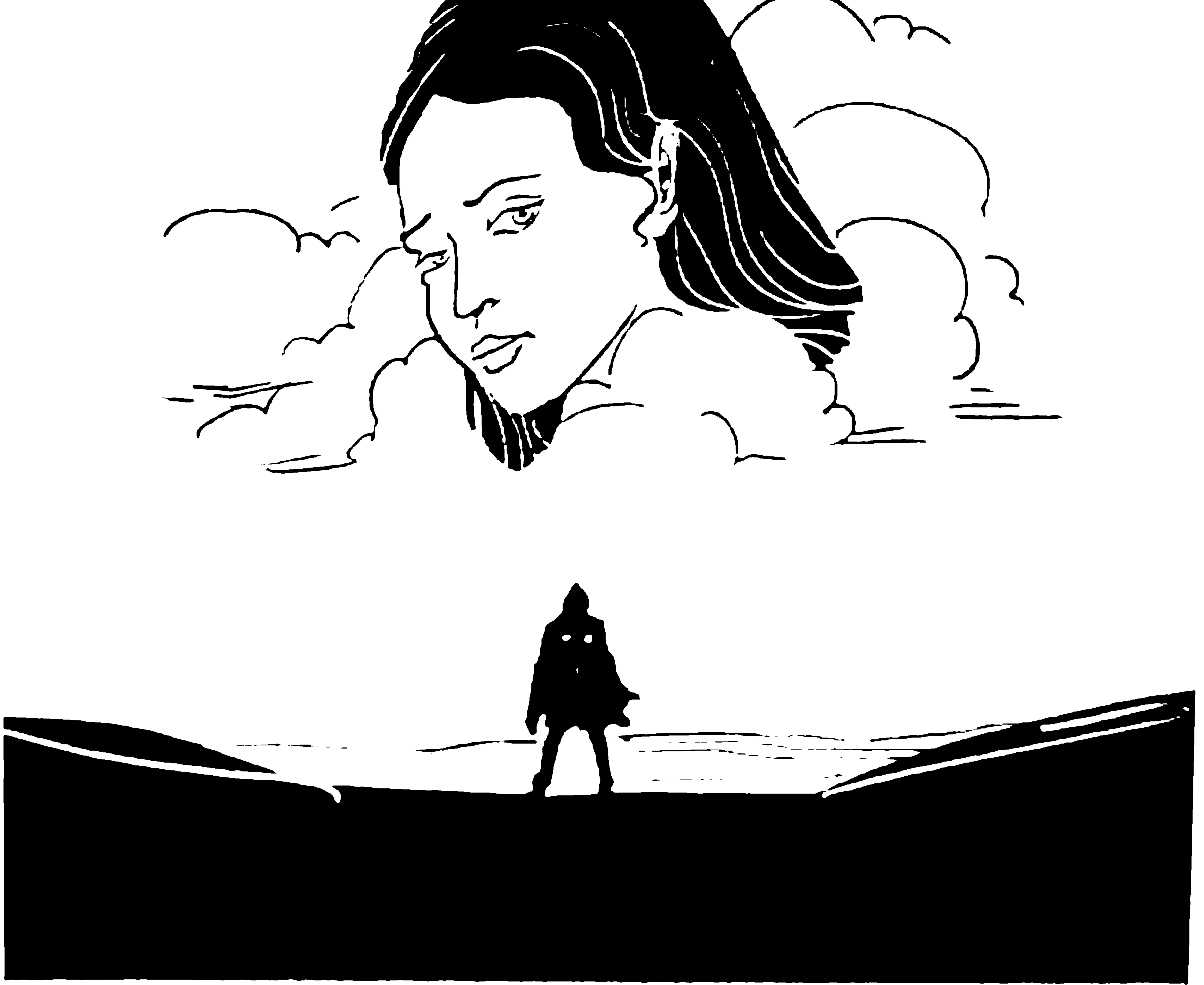
দু’হাতে ধরে শাঁখটি কপালে ঠেকাল অভী; নীপাকে বলল, “অনেক ধন্যবাদ।”

নীপার গোলমতো মুখটা ভরে উঠল নির্মল হাসিতে। সে বলল, “তোমার কপালে আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি অনেক বড়ো বড়ো বীরত্বের কাজ করবে। এই শঙ্খ সেইসব কাজে তোমাকে সাহায্য করবে। সবসময় আমাদের রক্ষা করো তুমি, অভীদাদা।”

অভীদাদা!

মেয়েটার খুশিভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে অভীর কেমন যেন লজ্জাবোধ হল। একটা বাচ্চার দুষ্টুমি বুঝতে না পেরে সে তরবারি বার করতে যাচ্ছিল! ছি ছি!

শঙ্খটাকে শ্রদ্ধাভরে আবার মাথায় ঠেকাল সে; তারপর স্পষ্টস্বরে বলল, “করব।”



।। দশম অধ্যায় ।।

স্বপ্নসরোবর

ফেরার পথে ওরা দেখল, মেঘবর্ণ এখনও গল্প করছে অর্ধরাক্ষস সুচিত্রর সঙ্গে। চার-পাঁচখানা বড়ো বড়ো কাচের পাত্র রাখা আছে তাদের সামনে— তলানি কমলার রস এখনও জমে আছে পাত্রগুলোতে।

অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও এসে উপস্থিত হয়েছিল। সুচিত্রর কাছে বিদায় নিয়ে মেঘবর্ণ ফিরে চলল ওদের নিয়ে।

আয়তনের কাছাকাছি ওরা যখন এসে পড়েছে, তখন অভী দেখতে পেল, পর্বত কথা বলছে সহকারী নিয়ামক নারদের সঙ্গে। নারদের শেষ কথাটা শোনা গেল আক্ষেপের সুরে। “কিন্তু উনি কি আর ভালো কথায় কান দেওয়ার পাত্র?”

কার কথা হচ্ছে, বুঝতে মোটেই অসুবিধা হল না ওদের। নারদ অভীকে দেখে বললেন, “আজ তোমার প্রথম ভ্রমণ ছিল না, অভী? কেমন লাগল মানবমন্দির আর সুদক্ষিণসারি?”

অভী ভাবল একবার ওই প্রচণ্ড দারিদ্রের কথাটা বলে, কিন্তু তারপর মনে হল, বলে লাভ নেই। নারদ নিজেই তো সহকারী নিয়ামক – মানে বিনীতেশের দলের লোক। উনি কি জানেন না ওখানের বাসিন্দাদের অবস্থা?

সে সংক্ষেপে বলল, “ভালো।”

লীনা বলল, “সহকারী নিয়ামক মহোদয়, যুদ্ধ কি আসন্ন?”

পর্বতের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন তিনি, তারপর বললেন, “লীনা, এসব কথা তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করার অনুমতি নেই আমার।”

তিনি দেখলেন, মেঘবর্ণ আসছে এদিকেই। সংকুচিতভাবে তিনি বললেন, “আজ্জ সমরোত্তম মেঘবর্ণ খুব রেগে গিয়েছিলেন। মাননীয় নিয়ামক মহোদয় কথাগুলো অন্যায়ই বলেছিলেন।”

পর্বত বলল, “সমরোত্তমদের অন্যায় কারণে রাগাতে নেই, এই সত্যটিই আমাদের নিয়ামক বিনীতেশ বোঝেন না। এই সমরোত্তমদের মতো বীরদের বিমোহক রাক্ষসরা পর্যন্ত সমঝে চলে। নিয়ামক বোঝেন না, কী ভয়ংকর শক্তি ওঁকে সুরক্ষা দিচ্ছে। সমরোত্তমরা না থাকলে ওঁকে রাক্ষসরা ওঁর ওই সাধের নিয়ামক পদে একটা দিনও টিকতে দিত?”

অন্য কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে মেঘবর্ণ। সেদিকে তাকিয়ে অতীত হঠাৎ একটা প্রশ্ন মাথায় এল।

“পর্বতদা, সমরোত্তমরা তো এত বড়ো যোদ্ধা। শর্বর তাহলে গতবারে সবাইকে হারিয়ে দিয়েছিল কীভাবে?”

পর্বত বলল, “দৈবাস্ত্র বস্তুটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে নিশ্চয়ই?”

ওরা তিনজন মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলল। পর্বত বলল, “শর্বরের কাছে এ অস্ত্র কোথা থেকে এসেছিল, কেউ জানে না। কিন্তু যুদ্ধে তার দলের অনেকে মারা পড়বার পর শর্বর বুঝতে পারছিল, তার পরাজয় আসন্ন। তখন সে দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করেছিল আমাদের ওপর।”

“কী দৈবাস্ত্র?”

“নাগপাশ। যে অস্ত্র একসময় ইন্দ্রজিৎ প্রয়োগ করেছিল রাম-লক্ষ্মণের ওপর। নাগপাশ মারণ অস্ত্র নয় – বন্ধন অস্ত্র; ‘পাশ’ মানে বাঁধন, জানো তো? সেই বাঁধনে আমরা সবাই বাঁধা পড়েছিলাম। নাগপাশ অবশ্য পাশুপতের মতো পুরোপুরি দৈবাস্ত্র নয় – তাই শর্বর ওটা প্রয়োগ করতে পেরেছিল। কিন্তু সে যাই হোক, নাগপাশের বাঁধন থেকে মুক্তি পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। তাও নীলাদ্র পেরেছিল।”

“কী করে?”

“নাগপাশ যার ওপর প্রয়োগ করা হয়, অজস্র সাপ অসম্ভব শক্ত বাঁধনে আটকে ফেলে তাকে। কিন্তু নীলাদ্র ছিল আমাদের মধ্যে একমাত্র হিমকুশল। ওকে বন্দি করেছিল যে সাপগুলো, সেগুলোকে বরফের মতো ঠান্ডা করে ও অবশ্য করে দিতেই ওর বাঁধন খসে গিয়েছিল। তরবারি নিয়ে লাফিয়ে উঠেছিল নীলাদ্র। তারপরেই শর্বর ওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল, আর ও...।”

তারপর নীলাদ্র কী করেছিল, ওরা সবাই জানে। সমরগরিমা আয়তনের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক ঘটনা।

নারদ মাথা নেড়ে বললেন, “থাক, সে লজ্জার কথা আর বারবার বলে কাজ নেই। তোমরা গল্প করো, আমি যাই। প্রভু নিয়ামক মহোদয়ের মেজাজটা আজ বিশেষ ভালো নেই। তাঁকে সামলে রাখতে হবে।”

নারদ চলে গেলেন। মেঘবর্ণ এসে পর্বতের সঙ্গে দু’একটা কথা বলে ওদেরকে বলল, “এখান থেকে মিত্রভাবে চলে যেতে পারবে তোমরা। আমি আয়তনে যাচ্ছি। গ্রন্থাগারে যাব একবার, সংগ্রহশালাতেও যাব। কাল দেখা

হবে সকালে।”

ওদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে মেঘবর্ণ চলে গেল। অভী দেখল, চাঁদের আলোয় তাকে যেন হঠাৎ করেই খুব ক্লান্ত লাগছে।

কী একটা ভাবনায় ডুবে আছে মেঘবর্ণ।

পর্বত বলল, “অভী, দেখি দেখি তোমার হাতের জিনিসটা।”

অভীর হাতে ধরাই ছিল নীপার দেওয়া নীলশঙ্খ। সে বলল, “নিধির বোন উপহার দিয়েছে আমাকে। দারুণ জিনিস, না?”

পর্বত বস্তুটা হাতে নিয়েই চমকে উঠেছিল। “এ যে অমূল্য জিনিস! নিধি, কোথায় পেলে এটা?”

নিধি বলল, “কী জানি! বোনটা একটু স্ক্যাপাটে আছে। বনজঙ্গল থেকে কত কী কুড়িয়ে এনে জমিয়ে রাখে! এটা বোধহয় ও পেয়েছিল মৃত দেবতার নদীর তীরে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে। অনেকদিন আগে এটা নদীর তীরের বালিতে খুঁজে পেয়েছিল ও। আমরা কখনও বাজিয়েও দেখিনি।”

“আর এতদিন পরে এটা উপহার হিসাবে এল অভীর কাছে! নিয়তির খেলা আর কাকে বলে?”

লীনা অবাক হয়ে বলল, “কী এমন জিনিস এটা?”

পর্বত বলল, “এটা নীল দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ। আয়তনে সমরোস্তুমদের জটায়ুবাহিনীকে দেখেছ?”

“হ্যাঁ। শাঁখ বাজিয়েই তো ডাকেন তাঁরা শকুনগুলোকে। অনেক যোদ্ধানায়কেরও নিজস্ব গৃধ্র আছে। এটা সেই জিনিস নাকি?” – লীনা জানতে চাইল।

পর্বত বলল, “এটা তার চেয়েও অদ্ভুত জিনিস। এই দেখো আমার জটায়ু শঙ্খ। আমারটা, বা অন্য যাদের কাছে এই শঙ্খ আছে, সবগুলিই ধূসর দক্ষিণাবর্ত। কিন্তু অভীর এই শাঁখটি নীল রঙের। এর মানে জানো?”

ওরা তিনজনেই বোকার মতো মাথা নাড়ল। পর্বত বলল, “এর মানে, এই শঙ্খের সঙ্গে সংযোগ আছে এক মহানীলগৃধ্রের। মহানীলগৃধ্র মায়াজগতের প্রাণীদের মধ্যেও ভীষণ দুর্লভ এবং ভীষণ শক্তিশালী মায়াবাহক। অনেক বড়ো মায়াদরও যে স্থানে নিজের মায়াবলে যেতে পারেন না, সেই অগম্য স্থানে এই পাখি নিয়ে যেতে পারে তার আরোহীকে।”

মেঘবর্ণের আহুতির কথা মনে পড়ে গেল অভীর। সে বলল, “‘অগম্য স্থান’ মানে?”

“মানে স্বপ্ন-সরোবর। যে সরোবরের তীরে অভিযাত্রী খুঁজে পায় স্বপ্ন-উপল। বা স্বপ্ন-উপল খুঁজে নেয় অভিযাত্রীকে।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “বুঝলাম না তো।”

পর্বত বলল, “বুঝবে। যখন ফাঁকা থাকবে, তখন একবার এই শাঁখে ফুঁ দিয়ে দেখো। এই মহানীলগৃধ্র পাখিদের লোকে বলে ‘নিয়তির দূত’। যদি দেখো, এ পাখি তোমাকে কোথাও নিয়ে যেতে চাইছে, তাহলে তাকে মান্য কোরো। নয়তো আকাশ থেকেই হয়তো তোমাকে পিঠ থেকে ফেলে দিতে

পারে মহানীলগৃধ্র। সে যদি তোমাকে কোথাও নিয়ে যেতে চায় বা নামিয়ে দিতে চায়, জানবে তার পেছনে আছে নিয়তির ইঙ্গিত। কিন্তু শঙ্খটি সবার সামনে দেখিয়ে বেড়িয়ে না যেন। এ মহামূল্য সম্পদ। প্রথমবার তার সঙ্গে দেখা হলে তার একটা নামকরণ কোরো; সে তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।”

পর্বত চলে যাওয়ার পর নিধি আর লীনা দু'জনেই শাঁখটা নিয়ে বাজানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তার মধ্য থেকে কোনো শব্দই বেরোল না। লীনা বলল, “অভী, একবার বাজাও, শুনি।”

অভী বলল, “আজ থাক। কাল হবে।”

মিত্রভবনের দিকে হাঁটা দিয়েছিল ওরা, হঠাৎ একজনকে দেখে অভী থমকে দাঁড়াল।

ছায়ার সঙ্গে মিশে চুপিচুপি সে যাচ্ছে যেদিক থেকে ওরা এল, সেইদিকে – সুদক্ষিণসারির অর্ধরাক্ষস জনবসতির দিকে।

তরুণ!

অভী তার বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। লীনা বলল, “ব্যাটার সাহস তো খুব! এত রাতে যাচ্ছে অর্ধরাক্ষসদের এলাকায়!”

অভী বলল, “আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখন কিন্তু দলের সঙ্গে ও ছিল না, আমার মনে আছে। এইভাবে চোরের মতো যাচ্ছে কী করতে ও?”

নিধিও বেশ অবাক হয়েছে। সে বলল, “অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর সাধারণ মানুষ খুব একটা যায় না আমাদের এলাকায়। অন্ধকার হয়ে গেলে অর্ধরাক্ষসদের সবাই একটু ভয় পায়। এর কোনো ভিত্তি নেই ঠিকই, কিন্তু আমরা ভেতরে ভেতরে এতে বেশ মজাই পাই। কিন্তু এই বদমাশটা এইরকম লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের ওখানে যাচ্ছে কী করতে? আচ্ছা, আমি নীপাকে বলব নজর রাখতে।”

বন্ধুদের সামনে আর কিছু না বললেও অভীর মনটা খচখচ করতে লাগল। অর্ধরাক্ষসদের মধ্যে শর্বরের চর থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাদের এলাকায় এত সংগোপনে যাচ্ছে তরুণ – ও-ও গুপ্তচরবৃত্তি করছে না তো?

ভাবতে ভাবতে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে সামনের লালচে বর্মপরা দাড়িওয়ালা মানুষটাকে সে খেয়ালই করেনি। তিনি ডাকলেন, “অভী!”

চমকে উঠে সে দেখল, অধিনায়ক বজ্রধর এসে দাঁড়িয়েছেন তার সামনে।

লীনা আর নিধি সসম্মানে নমস্কার জানাল তাঁকে। অভীও হাতজোড় করে কপালে ঠেকাল।

বজ্রধরও প্রতিনিমস্কার করলেন; বললেন, “অভী, যদি বিশেষ কোনো ব্যস্ততা না থাকে, আমার সঙ্গে একবার আসবে?”

ওরা তো অবাক। বজ্রধর সাধারণত ছাত্রছাত্রীদের আলাদাভাবে ডেকে বিশেষ কথাবার্তা বলেন না। অভী বলল, “অবশ্যই, অধিনায়ক বজ্রধর।”

লীনা আর নিধি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে গেল মিত্রভবনের দিকে। তবে মেয়েদুটোর মুখ দেখে অভী স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, সে ফিরলেই তাকে ঘিরে ধরবে ওরা।

বজ্রধর বললেন, “আমরা জঙ্গলে যাচ্ছি। ভয় পাবে না তো?”

অভী বলল, “না, আমার কাকার সঙ্গে এর আগে রাতের জঙ্গলে ঘোরার অভিজ্ঞতা আছে আমার।”

“তোমার কাকা! হুম্! কেমন আছেন তিনি?”

“রবিকাকা? ভালোই তো আছে। তবে আমার কথা মনে করে খুব কষ্ট পাচ্ছে বোধহয়।”

বজ্রধর হাঁটছেন সুদক্ষিণসারির রাস্তা দিয়ে। অভী সতর্ক থাকল, যদি তরুণকে ফিরতে দেখা যায়। ওকে তো আসতে হবে এই পথ দিয়েই। কিন্তু না, তার চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না।

বজ্রধর বললেন, “অভী, মেঘবর্ণের কাছে শুনেছি, তুমি স্বর্ণখেচর দেখতে পাও?”

অভী বলল, “হ্যাঁ।”

“সেইজন্যই তোমাকে আজ ডাকলাম। গভীর অরণ্যে এইরকম অন্ধকারে আমি মাঝেমধ্যেই যাই। তুমি সাহসী ছেলে – আশা করি ভয় পাবে না। অনেক কিছু দেখতে পাবে ওখানে।”

সুদক্ষিণসারির রাস্তাটা বেকেছে ডানদিকে। বজ্রধর তার উলটোদিকের পথটা ধরলেন। জঙ্গল শুরু হল কিছুক্ষণ হাঁটার পরেই।

উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় গাছের মাথাগুলো ধূসর লাগছে। বজ্রধরের হাতে তাঁর মধ্যমাকৃতির ধাতব দণ্ড; তার গায়ে চাঁদের আলো যেন পিছলে পড়ছে। অরণ্যের আরও গভীরে যাচ্ছেন তাঁরা। আলো এখানে অনেক কম। সারি সারি অন্ধকার গাছ দাঁড়িয়ে আছে – তাদের শরীর থেকে যেন বেরিয়ে আসছে শীতল বাষ্প।

তাঁদের পায়ের নীচে জমে আছে হাজার হাজার শুকনো হলুদ পাতা – চাঁদের আলোয় তাদের কেমন যেন বিবর্ণ লাগছে। তাঁরা হেঁটে যাচ্ছেন সেই মরা পাতার ওপর দিয়ে – খচমচ শব্দ উঠছে প্রতি পদক্ষেপে।

অভী বুঝতে পারছে, বৈকালির জঙ্গলের থেকে এই পীতপত্রবন অনেকটাই আলাদা। এর মধ্যে একটা অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার আছে। এখানের গাছগুলোর ভেতর থেকে যেন হালকা হলদে একটা আভা বেরিয়ে আসছে, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায়। বজ্রধর হঠাৎ বললেন, “স্বর্ণশেখর খুব ভালোবাসত এই বনে আসতে।”

অভী চুপ করে রইল। জঙ্গলের মাঝখানে কিছু কিছু জায়গা থাকে একদম ফাঁকা। সেইরকম একটা জায়গায় এসে বজ্রধর বললেন, “এসো, বসি।”

ওঁদের সামনে একটা বড়ো পুকুর। বাতাস বইছে না খুব একটা। পুকুরের নিস্তরঙ্গ জলে চাঁদের ছায়া স্থির হয়ে আছে।

ওঁরা বসলেন। পেছনে গভীর জঙ্গল, সামনে পুকুর। তার ওপারে আবার জঙ্গল। শান্ত রাত্রি যেন চেয়ে আছে চাঁদের চোখে।

বজ্রধর বললেন, “যারা পশুপাখি ভালোবাসে এবং যাদের মধ্যে মায়াবিদ্যা অর্জন করার সক্ষমতা আছে, কেবল তারাই স্বর্ণখেচর দেখতে পায়, শুধু এইটুকু বললে ভুল হবে। ওই দুটি গুনের সঙ্গে অরণ্যকেও গভীরভাবে ভালোবাসলে

তবে একজন ব্যক্তি স্বর্ণশেখরকে দেখতে পায় গাছগাছালির মধ্যে। তুমি ওই পাখি দেখতে পাও শুনেই আমি বুঝেছিলাম তোমার মধ্যে প্রকৃতিদত্ত মায়াবিদ্যার আধার আছে, আর তার সঙ্গে আছে কোমল হৃদয়। তাই তোমাকে আনলাম আজ এখানে। যখন আমার ওই আয়তনে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, তখন আমি চুপ করে এসে বসে থাকি এই জঙ্গলের মধ্যে। শান্ত হয়ে বসে দেখো আর শোনো রাতের অরণ্য কীভাবে কথা বলে।”

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল অভী। মাঝে মাঝে পুকুরের স্বচ্ছ জলে এসে পড়ছে দু’একটা ধূসর-হলদেটে পাতা, আর গোল গোল তরঙ্গ এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে কিনারা। এক সুরে ঝিঁঝিপোকারা ডেকে যাচ্ছে একটানা। অনেক দূরে দুটো চোখ জ্বলছে – মাটি থেকে তার উচ্চতা দেখে অভী অনুমান করল, সম্ভবত খরগোশ।

বজ্রধর কতক্ষণ পরে বললেন, “জানো, ঐশিকশ্রেষ্ঠের প্রথম ছাত্র ছিলাম আমি। খুব ভালোবাসতেন তিনি আমাকে। তারপর একে এসেছিল স্বর্ণশেখর, নীলাদ্র, মেঘবর্ণ। ঐশিকশ্রেষ্ঠ আমাকে বলতেন, ‘বজ্রধর, অস্ত্রবিদ্যা এমনভাবে শিক্ষা করো, যেন তোমার সমরগরিমা কখনও বিচলিত না হয়, যেন গোটা বিশ্ব তোমার পায়ের তলায় থাকে।’ তখন বয়স কম ছিল। পৃথিবীতে হেন অস্ত্র নেই, যা চালনায় চূড়ান্ত দক্ষতা অর্জন করিনি এবং তার জন্য তুমুল গর্ব অনুভব করিনি। একবার তো স্বয়ং মৃত্যু... আচ্ছা, সে কথা এখন থাক। কিন্তু এখন যত বয়স বাড়ছে, ততই বুঝতে পারছি, কাউকেই পায়ের তলায় রাখতে আমি চাই না। অস্ত্রবিদ্যা আমাকে ক্ষমতা দিয়েছে প্রচুর, কিন্তু শাস্তি দেয়নি। আমার জীবনের সার্থকতা আমি খুঁজতে গেছি যুদ্ধে; কিন্তু যুদ্ধ কি আজ পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিতে পেরেছে? আমাকে? স্বর্ণশেখরকে? নীলাদ্রকে? মেঘবর্ণকে? শ্যামশ্রীকে?”

শান্তভাবে কথা বলে চলেছেন বজ্রধর, যেন চন্দ্রালোকিত স্থির জলে নিজের জীবনের ছায়া দেখছেন। “যুদ্ধ করার জন্যই আমার গুরু ঐশিকশ্রেষ্ঠ বেছে নিয়েছিলেন আমাকে। আমার ওপর এই আয়তনের দায়িত্ব ন্যস্ত করে গেছেন তিনি। তাঁর দেওয়া কাজ যতক্ষণ দেহে জীবন আছে আমি করে যাব। কিন্তু অভী, আয়তনে আমি যা করি, তা আমার দায়িত্ব। আর এখানে... এখানে আমার শাস্তি। এই খোলা বাতাসে, গাছপালা-জন্তুজানোয়ারের মাঝে আমার মুক্তি। শুধু শ্যামশ্রী জানে আমি এখানে আসি, আর কেউ না।”

অভী অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল তার পাশে বসা মানুষটার দিকে। এই সেই দুর্ধর্ষ সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর? এর ভয়েই মাল্যপর্বতের রাক্ষসরা পর্যন্ত জড়োসড়ো হয়ে থাকে? আয়তনের সেই কঠোর নিয়মানুবর্তী মানুষটার চরিত্রের আর একটা দিক তার চোখের সামনে যেন হঠাৎ করে খুলে গেল।

অভী গুনল, উনি আস্তে আস্তে বলছেন, “আমি যোদ্ধা। আমি জানি, যুদ্ধক্ষেত্রেই আমার মৃত্যু হবে। নানা কারণে, অভী, তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছে, তুমি তোমার শিক্ষকদের নাম উজ্জ্বল করবে ভবিষ্যতে। তোমার কাছে আমার একটিই অনুরোধ, আমার মৃত্যু হলে আমাকে এই জায়গায়, এই

পুকুরের পাশে বটের তলায় সমাধিস্থ কোরো। শ্যামশ্রীকে বোলো, ও আমার এই ইচ্ছার কথা জানে। ও তোমাকে সাহায্য করবে।”

অভীর চোখে হঠাৎ জল চলে এল। আলতোভাবে বজ্রধরের হাত একবার স্পর্শ করেও সরিয়ে নিল সে। উনি বোধহয় বুঝতেও পারলেন না; শুধু একবার ফিশফিশ করে বললেন, “ওরা আসছে।”

কারা আসছে? অভী চারদিকে তাকিয়েও অন্ধকার বনের মধ্যে কিছুই দেখতে পেল না।

কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারল সে। একসার কালো পিঁপড়ে আসছে। বজ্রধর হাত পেতে দিলেন – তাঁর হাতে উঠে কিছুক্ষণ চলাফেরা করে আবার নেমে গেল পিঁপড়ের দল।

তারপর এল একজোড়া খরগোশ। তারা এসে সোজা উঠে পড়ল কোলে। তাদের পিছু পিছু এল একটা বনবেড়াল, তিনটে হরিণ, একটা চিতা-মা আর তার দুটো ছানা, একটা লক্ষ্মীপ্যাঁচ। অভী অবাক হয়ে দেখল, হিংস্র জন্তুগুলোর মধ্যে এতটুকু হিংস্রতা নেই। বজ্রধর ওদের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিচ্ছেন। চিতার ছানাদুটো লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে। একটা হরিণ অভীর কানের পাশে চেটে দিল।

বজ্রধর বললেন, “আমি এলে এরা বুঝতে পারে। আরও অনেক জন্তুই আসে। শ্যামশ্রী বলে, আমার মধ্যে নাকি জন্মগত জীবনীয়জ্ঞান মায়া আছে, তাই যে কোনো জন্তু আমার এত পোষ মেনে যায়। আমি কিন্তু ওই ধরনের কোনো মায়ার অস্তিত্ব বুঝতে পারি না নিজের মধ্যে। শুধু এইটুকু অনুভব করি, এ পৃথিবীতে আমার কারও ওপর ঘৃণা নেই, বিদ্বেষ নেই। আর এই প্রাণীগুলোকে, এই অরণ্যকে আমি ভীষণ ভালোবাসি।”

ভয়ে ভয়ে একটা চিতার ছানার দিকে হাত বাড়াচ্ছিল অভী। বজ্রধর উৎসাহ দিলেন, “দাও, হাত দাও; কিছু বলবে না। কার মনে সত্যিকারের ভালোবাসা আছে, ওরা বুঝতে পারে।”

ছানাটার মাথায় দিব্যি হাত বুলিয়ে দিল অভী, গলা চুলকে দিল। কী মিষ্টি বাচ্চাটা! সে কেবল গলার মধ্যে একটা আদরের ‘গর্গ’ শব্দ করল।

কিছুক্ষণ পরে বজ্রধর বললেন, “নীলাভ্রও মাঝে মাঝে আসত আমার সঙ্গে। অরণ্যকে ভালোবাসত ও-ও।”

বজ্রধর যে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, সেটা অভী বেশ কিছুক্ষণ পরে খেয়াল করল। একটু অস্বস্তিভরে সে বলল, “কিছু বলবেন আমাকে, অধিনায়ক বজ্রধর?”

বজ্রধর বললেন, “কার হাতে কোন্ অস্ত্র উপযুক্ত হয়ে উঠবে, তা আমি যোদ্ধার দু’একটা হাত-পা নাড়া দেখলেই বলে দিতে পারি। তোমার জন্য অসিবিদ্যা আর মায়াযুদ্ধ – এই ছিল আমার নির্দেশ। মায়াযুদ্ধের ব্যাপারে আমি ভুল করিনি। তোমার মধ্যে ও বিদ্যায় দক্ষ হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু অসিবিদ্যা? তোমার কবজির জোর আছে ভালো, তোমার পায়ের নড়াচড়া দক্ষ অসিযোদ্ধার মতো – তাও তুমি অসিযুদ্ধে আশানুরূপ করতে পারছ না–

এই রহস্যটা আমাকে বেশ চিন্তায় রেখেছে। আমার কিন্তু অস্ত্র বাছাইয়ে আজ পর্যন্ত এমন ভুল কখনও হয়নি।”

উঠে পড়লেন তিনি। “চলো, এবার ফেরা যাক। আয়তন ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকতে ভরসা হয় না। অবশ্য শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণ দু’জনেই আছে ওখানে – ওরা থাকতে আয়তন অরক্ষিত নয়। কোনো সমস্যা হলে ওরা সামলে নেবে, জানি। তবুও...”

জন্তুগুলো একে একে ফিরে গেল গভীর অরণ্যে। সেদিকে মুগ্ধচোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বজ্রধর। তারপর হাঁটতে শুরু করলেন যে পথ দিয়ে ওঁরা এসেছিলেন সেই পথে। আয়তনের কাছাকাছি এসে কয়েকজন ছাত্রকে তখনও অনুশীলন মঞ্চে বসে গল্প করতে দেখে তাদের সামনে এসে রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন, “হুম! ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না।”

ছেলেগুলো ছড়মুড় করে যে যার গৃহে পালাল। অতীও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এই তো সেই চেনা মেজাজের কড়া অধিনায়ক বজ্রধর!

একটা মানুষের শরীরের মধ্যে কতরকম সত্তা লুকিয়ে থাকে, ভাবতে ভাবতে অতী মিত্রভবনের পথ ধরল যখন, তখন চাঁদ প্রায় মাথার ওপরে উঠে এসেছে।

ঘরে এসে ঢুকতেই প্রত্যাশিতভাবেই লীনা আর নিধি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর, সঙ্গে যোগ দিলেন মিত্রমাসিও। “ওরে বাবা! একদম খোদ অধিনায়ক বজ্রধরের ডাক! বলো, বলো শুনি।”

অতী সুযোগ পেয়ে নিধির কথা বলার ভঙ্গি নকল করে বলল, “উহুঃ, বলা যাবে না! আয়তনের নিরাপত্তার ব্যাপার!”

লীনা হেসে উঠল। নিধি হাত বাড়িয়ে তার মাথায় সজোরে চাঁটি মারল। “ইয়ার্কি পরে হবে, আগে বলো কী হল আজ!”

মিত্রমাসি বললেন, “বলো, বলো, আমিও শুনব। অধিনায়ক বজ্রধর তোমাকে নিয়ে নৈশ অভিযানে জঙ্গলে গেলেন! রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ-টুদ্ধ হল নাকি?”

অতী সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল, শুধু বজ্রধরের শেষ ইচ্ছার কথাটা বাদ দিয়ে গেল। মিত্রমাসি বললেন, “দেখছ তো, ওঁর এমনই প্রভাব যে বনের জন্তুরাও ওঁর কাছে এলে শান্ত হয়ে যায়।”

তারপর আরও কিছুক্ষণ কথা হল। নিয়ামক বিনীতেশের সমালোচনা হল কিছুক্ষণ। তারপর মিত্রমাসি উঠে গেলেন কী একটা কাজ করতে।

অতী বলল, “তরুণের আর কোনো খবর পাওনি তোমরা?”

লীনা বলল, “কী করে পাব? আমরা তো সেই তখনই ঢুকে গেছি ঘরে। তুমি দেখোনি ওকে ফিরতে?”

অতী মাথা নেড়ে ‘না’ বলল। আরও কিছুক্ষণ গল্প করল ওরা। লীনা আর নিধি তাদের বাড়ির কথা, বাবা-মায়ের কথা বলছিল। লীনা বলল, “আমার মা বড্ড বেশি ভালোমানুষ। ওইরকম হওয়ার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই। আমি হব সমরোত্তম শ্যামশ্রীর মতো বীর – মায়ের মতো দরিদ্র জীবনে ধুঁকে মরার

ইচ্ছা আমার নেই। আমি যুদ্ধে যাব, আর প্রচুর টাকা উপার্জন করব। তখন আর ওই ভাঙা ঘরে থাকতে হবে না আমাদের।”

নিধি বলল, “গরিব তো আমরাও। কিন্তু আমার অত যুদ্ধে যাওয়ার সাধ নেই বাপু। তবে টাকাপয়সার মুখ দেখতে আমারও আপত্তি নেই। কিন্তু আমি ওড়িয়ে সংসার করতে চাই। একটা ভালো অর্ধরাফস ছেলেকে বিয়ে করব, মনের সুখে ঘরদোর গোছগাছ করব, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সুখে সংসার করব আমার মায়ের মতো। ওইটুকু হলেই আমি খুশি। ...তোমরা জানো, আমাদের অর্ধরাফস বাস্তুশাস্ত্রমতে শোবার ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গিরগিটির কঙ্কাল রাখা অতি শুভফলদায়ক?”

অভী আর লীনা একসঙ্গে হেসে উঠল। লীনা বলল, “অভী, তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা শুনি।”

অভী বলল, “আমার সেরকম কোনো পরিকল্পনা কোনোদিনই ছিল না। তবে এখানে যাদেরকে দেখছি, তাদের মধ্যে যদি বাছতে বলো তো আমি অধিনায়ক বজ্রধরের মতো হতে চাই। ওইরকম আত্মবিশ্বাস, ওইরকম ব্যক্তিত্ব – যার কোনো কিছুতে ভয় নেই, কিন্তু কাউকে ছোটো করেন না। অবশ্য নিয়মের ব্যাপারে অতটা কঠোর হতে আমি পারব না। আর নিয়ামক বিনীতেশের মতো লোকের জন্য তো আদৌ শক্তি খরচ করতে পারব না।”

আরও কিছুটা হাসাহাসি পর লীনা বলল, “আমরা কী বোকা, না? অতদিন বাঁচব কিনা, তারই ঠিক নেই তো!”

নিধি বলল, “হ্যাঁ, একটা যুদ্ধ যদি লাগে, তাহলে কে বাঁচবে আর কে মরবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।”

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল অভী।

সে ভেবেছিল, দিনভর পরিশ্রমের পর বোধহয় শুলেই ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু ঘুম আর কিছুতেই আসে না। সারাদিনের বিচিত্র ঘটনাগুলো তপ্ত মস্তিষ্কে বারবার যাতায়াত করতে লাগল।

অবশেষে অস্থির হয়ে সে উঠে গিয়ে বসল জানালার পাশে।

চাঁদের আলো এসে পড়েছে জানালা দিয়ে, ঝিরঝিরে হাওয়া এসে লাগছে গায়ে। মুখে একটু জলের ঝাপটা দিয়ে বাইরের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইল সে কিছুক্ষণ।

কী অদ্ভুত দিনটা কাটল আজ! সকালের অনুশীলন, হিমকুশলতা, মানবমন্দির, নিয়ামক বিনীতেশ, সুদক্ষিণসারি, বজ্রধরের সঙ্গে অরণ্যে – ঘটনাগুলো ভাবতে ভাবতেই তার মনে পড়ে গেল নীপার দেওয়া নীলশঙ্খটার কথা।

একবার বাজিয়ে দেখলে তো হয় জিনিসটা!

শাঁখটা রাখা ছিল পাশেই। হাতে তুলে নিয়ে নেহাত কৌতূহলভরেই ফুঁ দিল সে। সুতীক্ষ্ণ শিস দেওয়ার মতো শব্দ বেরিয়ে এল নীল দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ থেকে।

আর তার কয়েক মুহূর্ত পরেই শোনা গেল বিরাট ডানার ঝটপট শব্দ। জানালার চাঁদের আলো ঢাকা পড়ল বিশাল এক কালো ছায়ায়। অভী দেখল, তার জানালার ঠিক বাইরেই নেমে এসেছে মহানীলগৃধ্র।

জানালায় গরাদ নেই; সহজেই ওপারে বেরিয়ে যেতে পারল অভী। নীল রঙের বিরাটাকৃতির শকুনটা তাকে দেখছে ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে; মিটমিট করছে তার চোখ।

অভীর মনে পড়ল, মেঘবর্ণ বলেছিল এই পাখিদের এখানে ‘জটায়ু বাহিনী’ বলা হয়। পর্বতও বলেছিল।

হ্যাঁ, এবার এর একটা নাম দিতে হবে।

কী চমৎকার নীল গায়ের রং! চাঁদের আলোতে সে নীল কিন্তু এতটুকু স্নান হয়নি, বরং আরও চকচকে হয়ে উঠেছে। অভী বলল, “আমি তোমার নাম দিলাম ‘অপরাজিতা’। পছন্দ হয়েছে?”

নাম শুনে শকুনটা ‘কং-অং-অং’ শব্দ করে একপায়ে ভর দিয়ে মাটির ওপর এক পাক ঘুরে গেল। অভী বুঝল, এটা খুশির বহিঃপ্রকাশ, অর্থাৎ নামটি পছন্দ হয়েছে তার।

আস্তে আস্তে মহানীলগৃধ্রের মাথায়, গলার পালকে, পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল অভী। বিশাল পাখিটা চোখ বন্ধ করে রইল, কোনো আওয়াজ করল না। তারপর ঝুঁকে পড়ল সে অভীর সামনে, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, যেন বলতে চাইছে, “উঠে পড়ো এবার।”

গতবার মেঘবর্ণকে দেখে ওঠার কায়দাটা জানা ছিল তার, তাও অভীর বুক দূরদূর করতে লাগল। সে বিড়বিড় করে বলল, “অপরাজিতা, ফেলে দিয়ো না যেন।”

সেই শুনে অপরাজিতা চোখ বন্ধ করে মাথা দুলিয়ে ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ করতে লাগল, যেন হাসি আর থামাতেই পারছে না।

অভীর মনে পড়ল, মেঘবর্ণ বলেছিল এই জটায়ুবাহিনীর পিঠ থেকে কেউ পড়ে যায় না। তাই বোধহয় তার কথা শুনে হাসছে অপরাজিতা।

বেশ বুদ্ধিমান পাখি তো!

নাকি বুদ্ধিমতী? কে জানে!

অভী উঠে বসল অপরাজিতার পিঠে, হাত দিয়ে জড়িয়ে রাখল তার গলা; বলল, “স্বপ্ন-সরোবর নিয়ে যাবে আমাকে?”

মাথা নাড়ল অপরাজিতা, তারপর এক ঝটকায় উঠে পড়ল আকাশে। আরও উঁচু, আরও উঁচুতে উঠছে ওরা। নিচে দেখা যাচ্ছে জ্যোৎস্নাধৌত সমরগরিমা আয়তন, মানবমন্দির, সুদক্ষিণসারি, পীতপত্রবন।

আরও উঁচুতে উঠছে অপরাজিতা – চাঁদটাকে যেন আরও বড়ো লাগছে অভীর। অপরাজিতার নরম পালক থেকে আসছে আপেলের মতো গন্ধ। ডানা ঝাপটাচ্ছে সে, অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছে ওরা। ওই যে দেখা যাচ্ছে দূরের মাল্যপর্বতের কালো গায়ে চকচকে চাঁদের আলো। অনেক নীচে বয়ে যাচ্ছে মৃত দেবতার নদী, তার জলে ঝিলমিলিয়ে উঠছে জ্যোৎস্না। হু হু করে নৈশ

হাওয়া এসে লাগছে অভীর চোখে মুখে; হাওয়া এসে বয়ে যাচ্ছে অপরাজিতার পালকের ওপর দিয়ে। কী আনন্দ! কী আনন্দ! কত উঁচুতে উঠে এসেছে ওরা! অভীর যেন খুশিতে ফেটে পড়তে চাইছে প্রাণ। এমন সময় হঠাৎ করেই চারপাশটা অন্ধকার হয়ে গেল।

চাঁদটা যেন হঠাৎ নিভে গেছে। কোথাও কোনো আলো নেই। অভীর চুলগুলো আর উড়ছে না; মুখে এসে লাগছে না কোনো বাতাস। চতুর্দিকে কেবল নিশ্চিহ্ন অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের মধ্যেই অভী বুঝতে পারল, অপরাজিতা নামছে। কোথায় নামছে? ও কি দেখতে পাচ্ছে আদৌ কিছু?

হয়তো পাচ্ছে। অপরাজিতা মায়াজগতের প্রাণী। তার পক্ষে এ হয়তো অসম্ভব কাজ নয়।

অভীর ভয় করছে। এই নিঃসীম অন্ধকারে কোথাও কোনো শব্দ নেই। আকাশে তারা নেই - আকাশটাই নেই; তার বদলে মনে হচ্ছে সে যেন কোন্ নিষিদ্ধ পুরীর অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছে।

নামতে নামতে এতক্ষণে পায়ের তলায় মাটি পেয়েছে অপরাজিতা। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না অভী, কিন্তু স্পর্শে বুঝতে পারল, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে অপরাজিতা - অর্থাৎ তাকে নামতে বলছে।

নামল সে। পা মাটি স্পর্শ করছে কিনা, অভী বুঝতে পারল না। অন্ধকারটা ধীরে ধীরে হালকা হচ্ছে, সূর্যোদয়ের আগে যেরকম দেখা যায় আকাশে।

কিন্তু সূর্য উঠল না, চাঁদও না। তার বদলে একটা খুব হালকা লালচে বেগুনি আভা জেগে রইল আকাশজুড়ে। একবার মনে হল, ওই আকাশের গায়েই ঝলসে উঠল আঁকাবাঁকা সাদা বিদ্যুতের রেখা, কিন্তু কোনো শব্দ হল না। চতুর্দিক কী অসম্ভব নিস্তব্ধ - যেন ঘুমের জগতে চলে এসেছে সে।

ঘুমের জগৎ! স্বপ্ন-সরোবর!

কথাটা মনে হতেই অভী বুঝতে পারল বিরাট এক জলরাশির সামনে সে এসে দাঁড়িয়েছে। আদিগন্তবিস্তৃত শুধু জল আর জল। বিন্দুমাত্র হাওয়া নেই - কোনোভাবেই সামান্য ঢেউটুকুও উঠছে না সেই অসীম গম্ভীর জলরাশির বুকে। সরোবর যে এত বড়ো হয়, অভীর জানা ছিল না। যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর জল - তাতে ওই হালকা লাল আভাযুক্ত আকাশের ছায়া পড়েছে। কোথায় যে জলের আরম্ভ আর কোথায় যে আকাশের শুরু, অস্পষ্ট দিগন্তরেখা দেখে বোঝার উপায় নেই। এই অদ্ভুত, অচেনা জগতে দাঁড়িয়ে অভী বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

পায়ে কী একটা লাগল যেন। অভী ঝুঁকে পড়ে দেখল, নুড়ি পাথর। সরোবরের তীরভরতি ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নুড়ি।

চ্যাপটা আকারের লালচে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেটাকে ভালো করে দেখতে গেল সে, কিন্তু তার আগেই পাথরটা তার হাত থেকে ভেসে উঠল শূন্যে; ভাসতে লাগল তার মুখের সামনে।

স্বপ্ন-উপল!

সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছোটো নুড়িটা। এখানের আকাশের যেরকম রং, সেইরকম লালচে আভা বেরোতে লাগল তার গা থেকে। অতীত মনে পড়ল, কোনো দৃশ্য বা কোনো শব্দকে নিজের মধ্যে ধারণ করে রাখতে পারে স্বপ্ন-উপল।

বিচ্ছুরিত আলোর রঙ বদলাচ্ছে - লাল, কমলা, হলুদ, নীল, সবুজ, বেগুনি, গোলাপি। অতীত তাকিয়ে রইল, তারপর পাথরটা থেকে আলো ছড়িয়ে গেল বিষণ্ণ রঙের আকাশের গায়ে - অতীত দেখল, বিরাট আকাশজুড়ে ফুটে উঠছে একটা দৃশ্য।

ও কী? ওটা কীসের ছবি দেখা যাচ্ছে আকাশে? একটা... একটা হাত! কনুই থেকে আঙুল পর্যন্ত একটা হাত।

লম্বা লম্বা আঙুলগুলো নড়ছে হাতটার। তার ওপর ছুটে বেড়াচ্ছে অজস্র জলবিন্দু - দেখলে মনে হয়, ওগুলো জীবন্ত! কী অদ্ভুত দৃশ্য সে দেখছে এই স্বপ্নসরোবরের তীরে, অতীত ভাবল।

ওটা কী? একটা মনুষ্য-আকৃতি। একটি মেয়ে। লম্বা, খোলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে তার পিঠে। পেছন থেকে অতীত দেখছে, সেই মেয়েটির ছবি দাঁড়িয়ে আছে আকাশজুড়ে।

তার থেকে একটু দূরে ওই হাতটা কী করছে?

হাতটার ওপরে যে জলবিন্দুগুলো খেলা করছিল, সেগুলো জমাট বাঁধছে একজায়গায় - বরফ হয়ে যাচ্ছে। অতীত বুঝতে পারছে, এটা যার হাত, সে একজন হিমকুশল।

জমাট বরফটা একটা আকার নিচ্ছে। একটা চেনা আকৃতি। একটা... একটা তীক্ষ্ণগ্রন্থ ছুরি! ছুরিধরা হাতটা এগিয়ে আসছে মেয়েটার দিকে। মেয়েটা এখনও দেখতেই পায়নি; বুঝতেই পারেনি কিছু।

আতঙ্কে অতীত দমবন্ধ করে তাকিয়ে রইল আকাশজোড়া দৃশ্যটার দিকে।

পেছন থেকে এসে হাতটা ছুরি বসিয়ে দিল মেয়েটার পিঠে। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে পড়ে গেল মাটিতে। এইবার তার মুখটা দেখতে পেল অতীত।

সুশ্রী মেয়েটি, মুখে লাবণ্য আছে। কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণায় মুখের রেখাগুলো বেঁকে যাচ্ছে তার - দু'চোখে অবিশ্বাস, আতঙ্ক।

হাতটা পিছিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। একটা জলদগম্বীর স্বর শুনতে পেল সে। - “আমার পথে যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাকে সরে যেতেই হবে। তুমিই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?”

দৃশ্যটা মুছে যাচ্ছে। আকাশজুড়ে জেগে রইল কিছুক্ষণের জন্য সেই অপরিচিত মেয়েটির যন্ত্রণাকাতর চোখদুটো, তারপর ধীরে ধীরে তাও মিলিয়ে গিয়ে সেই বিষণ্ণ লালচে আভা ফিরে এল।

এ কী ভয়ংকর ঘটনা তাকে দেখাচ্ছে স্বপ্নসরোবর? কেনই বা দেখাচ্ছে?

আকাশের গায়ে জেগে উঠছে আর একটা দৃশ্য। একটা দৈত্যাকৃতি লোক অদ্ভুত একটা মন্ত্র বলার সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠল লেলিহান শিখায়। পৃথিবীর মাটি ফেটে গিয়ে হাঁ করে আছে, সেই সুবিশাল গহ্বরের মধ্য থেকে

উঠে আসছে হিংস্র অগ্নিশিখা। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে একটা লোক।

অভী চিনতে পারল তাকে - ছবিতে দেখেছে সে। নীলাভ্র!

যে নিষ্ঠুর মুখের দৈত্যাকৃতি লোকটা দাঁড়িয়ে আছে বিজয়ীর মতো, সেই যে শর্বর, অভী বুঝতে পারল। তার ডান গালে একটা বিরাট সিংহের ছবি উল্লি করা আছে। নীলাভ্রর পাশে রাখা তরবারিটাও চিনতে পারল সে। বিশ্বাসহস্তার অসি!

পলকের মধ্যে একটা বর্শা নীলাভ্রর কাঁধে ঢুকিয়ে দিল শর্বর। চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে দেখছে দৃশ্যটা, তাদেরও দেখতে পেল অভী। বজ্রধর। পর্বত। মেঘবর্ণ। কারও মুখে কোনো কথা নেই, কেবল নির্বাক আতঙ্ক।

তারপর নীলাভ্রকে লাথি মেরে সেই আগুনের মধ্যে ফেলে দিল শর্বর। এতগুলো অসহায় চোখের সামনে হারিয়ে গেল সে। শর্বর হা হা করে হেসে উঠল।

বজ্রধর অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছেন সেই দিকে, বিড়বিড় করে কীসব যেন বলছেন। মেঘবর্ণ যেন পাথর হয়ে গেছে।

তারপর আকাশটা ফেটে পড়ল সূর্যের মতো উজ্জ্বল আলোতে। নেমে এলেন ঐশিকশ্রেষ্ঠ।

তাকেও ছবিতে দেখেছিল অভী, তাই চিনতে অসুবিধা হল না। সর্বাঙ্গ থেকে যেন দৈব জ্যোতি বেরোচ্ছে তাঁর। ডান হাত বাড়ালেন তিনি - সে হাতে জ্বলজ্বল করছে তরবারি ও সূর্যের গৌরবময় চিহ্ন।

ভয়ে বিহ্বল চোখ নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে শর্বর। সে যেন বুঝতে পেরেছে, এঁর সামনে তার কোনো যুদ্ধবিদ্যাই আর কাজ করবে না।

দৃশ্যটা আবার মিলিয়ে যেতে লাগল আকাশ থেকে। অভী বলে উঠল, “না, না! তারপর কী হল?”

কিন্তু আর কিছু বোঝা গেল না। বিরাট স্বপ্নসরোবরের ওপর লালচে বেগুনি আকাশের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। আবার যেন একবার নিঃশব্দ বিদ্যুৎরেখা দেখা গেল আকাশের গায়ে; তার ছায়া পড়ল স্থির জলে।

অভীর ভয় করছে, কিন্তু তবু তার এখান থেকে যেতে ইচ্ছা করছে না। নিজের মনেই সে বলে উঠল, “আর কিছু দেখার নেই?”

যেন তার কথার উত্তরেই দপ্ করে আকাশে আবার জ্বলে উঠল আলো। আবার সেই দৃশ্য। শর্বর মস্ত্রটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফেটে গিয়ে তৈরি হয়েছে অগ্নিশিখাপূর্ণ ‘নরকগহ্বর’। তার পাশে বসে আছে একজন। শর্বরকে দেখা যাচ্ছে বর্শা হাতে। ভীত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সবাই সেদিকে - বজ্রধর, শ্যামশ্রী, মেঘবর্ণ, পর্বত।

কিন্তু ওরা কারা?

সমরোত্তমদের পাশে ওরা কারা? লীনা! মিত্রমাসি! সন্দীপ! নিধি! অরিত্র! মৃগেন্দ্র! ওরা কী করছে এই দৃশ্যে? এসব কী দেখছে সে?

আপনা থেকেই তার চোখ চলে গেল নরকগহ্বরের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে থাকা মানুষটার দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ময়ে, আতঙ্কে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল

তার।

শর্বরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সে নিজে!

বুকের মধ্যে যেন দুম দুম শব্দে হাতুড়ি পিটছে তার। এসব কী অবাস্তব, ভয়াবহ ঘটনা!

শর্বর সজোরে একটা লাথি মারল। সে গড়িয়ে পড়ে গেল অগ্নিময় নরকগহ্বরে। আর সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটা মিলিয়ে গিয়ে আকাশটা আবার হালকা লালচে বেগুনি রং ধারণ করল। যে পাথরটা শূন্যে ভাসছিল, সেটা টুপ করে ঝরে পড়ল মাটিতে।

অভী বুঝতে পারছে, এ অতি ভয়ংকর জায়গা। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা মোটেই নিরাপদ নয়; থাকলে সে উন্মাদ হয়ে যাবে। যা সে দেখছে, তা তার উপলব্ধির অনেক বাইরের জিনিস।

কী সব অর্থহীন দুঃস্বপ্ন তাকে দেখাচ্ছে এই মায়াময় সরোবর!

অপরাজিতা গেল কোথায়? তাকে দেখা যাচ্ছে না কেন? অভীর এবার ভয় করছে। অপরাজিতা না থাকলে এখান থেকে ফিরবে কী করে সে?

ঠিক। শাঁখটা বাজাতে হবে নিশ্চয়ই।

নীল দক্ষিণাবর্ত শঙ্খটা বার করে ফুঁ দিল সে। কয়েক মুহূর্তের উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা। তারপরেই তার সামনে এসে দাঁড়াল নীলবর্ণ মহাগৃধ্র।

“অপরাজিতা! লক্ষ্মীসোনা, ফিরিয়ে নিয়ে চলো আমাকে এখান থেকে!”

পাখিটার পিঠে উঠে পড়ল সে। পেছনে রয়ে গেল সেই অদ্ভুত লালচে আভাময় অন্ধকার আর তরঙ্গহীন, বিরাট জলরাশি।

স্বপ্নসরোবরের তীর থেকে যখন সে বাস্তব জগতের আকাশে ফিরে এল, তখন সামনে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চাঁদকে দেখে তার মনে হল, এর চেয়ে প্রিয় দৃশ্য সে জীবনে কখনও দেখেনি। মুখে ঠান্ডা হাওয়া লাগতে সে বুঝতে পারল, ঘামে তার সর্বশরীর ভিজে রয়েছে।

বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানিটা এখনও হচ্ছে, তবে তার তীব্রতা কমেছে।

ওঃ, কী ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হল একটা!

অপরাজিতা নামছে। কিন্তু আয়তনের দিকে নামছে কেন সে? অভী বলল, “মিত্রভবনের দিকে চলো না!”

কিন্তু অপরাজিতা সে কথায় কান দিল না। সমরগরিমা আয়তনের ছাদের ওপর পাক খেতে লাগল সে।

অভী তাকে জোরাজোরি করতে সাহস পেল না। যদি ফেলে দেয়!

তাকে সমরগরিমা আয়তনের ছাদেই নামিয়ে দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল অপরাজিতা। অভী বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল,

কী যেন বলেছিল পর্বত? মহানীলগৃধ্র যদি তাকে কোথাও নামিয়ে দিতে চায়, তার পেছনে থাকে নিয়তির ইঙ্গিত?

এই গভীর রাতে সমরগরিমা আয়তনের ছাদে তাকে এনে নিয়তির কোন্ উদ্দেশ্যই বা সিদ্ধ হবে?

চাঁদ তাকিয়ে আছে তার দিকে। অভী সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল।

এই বিশাল আয়তন পেরিয়ে অতটা রাস্তা হেঁটে তবে সে পৌঁছাতে পারবে মিত্রভবনে।

সিঁড়ি বেয়ে আয়তন-ভবনের অভ্যন্তরে নেমে এল সে, হাঁটতে লাগল অলিন্দপথে। দেয়ালে মশালগুলো এখনও জ্বলছে বটে, তবে নিভু নিভু হয়ে এসেছে।

সারি সারি বন্ধ কক্ষের পাশ দিয়ে এই আলো-আঁধারির মধ্যে যেতে যেতে অতীত হঠাৎ কেমন অস্বস্তি হতে শুরু করল।

কী যেন ঘটছে এখানে! একটা শব্দ আসছে – খুব মৃদু, কিন্তু শব্দটা হচ্ছে এখানেই কোথাও।

অতী দেখল, সংগ্রহশালার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

দরজায় হাত রেখে অল্প চাপ দিতেই দরজাটা ভেতর দিকে একটু খুলে গেল।

এ দরজা তো সবসময় চাবি দেওয়া থাকে! মহামূল্যবান সব সম্পদ আছে এ-ঘরে। এত রাতে চাবি খোলা কেন?

শব্দটা এই ঘরের মধ্য থেকেই আসছিল। ভেতরে কেউ তো আছেই।

চুপিচুপি ভেতরে ঢুকল অতী। ঘরের মধ্যে বেশিরভাগ মশালই নিভে গেছে, দু'তিনটি কেবল জ্বলছে। একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল সে।

গুঁড়ি মেরে সে সরে এল পরশুরামের কুঠার, শিবের চন্দ্রহাস যদিকে আছে, সেই কাচের বাক্সগুলোর দিকে। বিশ্বাসঘাতক নীলাদ্রের তৈলচিত্রটার দিকে এগিয়ে গেল সে। ওই থামটার আড়ালে দাঁড়িয়ে রহস্যময় ব্যক্তিটিকে কাছ থেকে দেখার সুবিধা হবে।

লোকটা একটা মস্ত বলছে, আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই মাটির কিছুটা অংশ উত্তপ্ত লাল বর্ণ ধারণ করছে। অতী সভয়ে উপলব্ধি করল, এ সেই নরকগহ্বর আহ্বান করার মন্ত্র। একটু আগেই স্বপ্নসরোবরের তীরে শর্বরকে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুনেছে সে।

কে এই লোকটা? অতী আর একবার ভালো করে দেখেই চমকে উঠল।

সমরোত্তম মেঘবর্ণ!

এই নিষিদ্ধ রাক্ষসমায়া এমন চুপিসারে এখানে অভ্যাস করছে কেন ও? অতী সর্বসত্তা কেঁপে উঠল। তবে কি মেঘবর্ণও শর্বরের দলে?

না, এ হতেই পারে না!

মায়াপ্রয়োগটা ঠিকমতো করতে পারছে না সে। তাই মেঝেটা লাল হয়ে উঠলেও গহ্বরের মুখ খুলছে না। বিরক্ত হয়ে কপালের ঘাম মুছে সোজা হয়ে দাঁড়াল মেঘবর্ণ।

আর সেই মুহূর্তেই যেন প্রলয়ের তাণ্ডব শুরু হল।

অতী সভয়ে দেখল, কম করেও পঁচিশজন বিশালদেহী সশস্ত্র ভয়ংকর রাক্ষস বন্যার জলের মতো হুংকার দিয়ে ঢুকে পড়ছে দরজা খুলে সংগ্রহশালায়। “অস্ত্র নে! একটা ধারালো অস্ত্র তুলে নে!” – গর্জন করছে তারা। মশালের আলোয় তাদের লাগছে এক-একজন মূর্তিমান যমদূতের মতো।

অসহায়ভাবে মেঘবর্ণ তাকাচ্ছে চারদিকে। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র সে। রাক্ষসগুলো ঘিরে ফেলেছে তাকে।

অভীও তো নিরস্ত্র। তার পেছনে নীলাভর তৈলচিত্র। তার পাশেই কাঠের বেদিতে রাখা আছে...

বিশ্বাসহস্তার অসি!

চিৎকার করে বলে উঠল সে, “মেঘবর্ণ! এটা ধরো।”

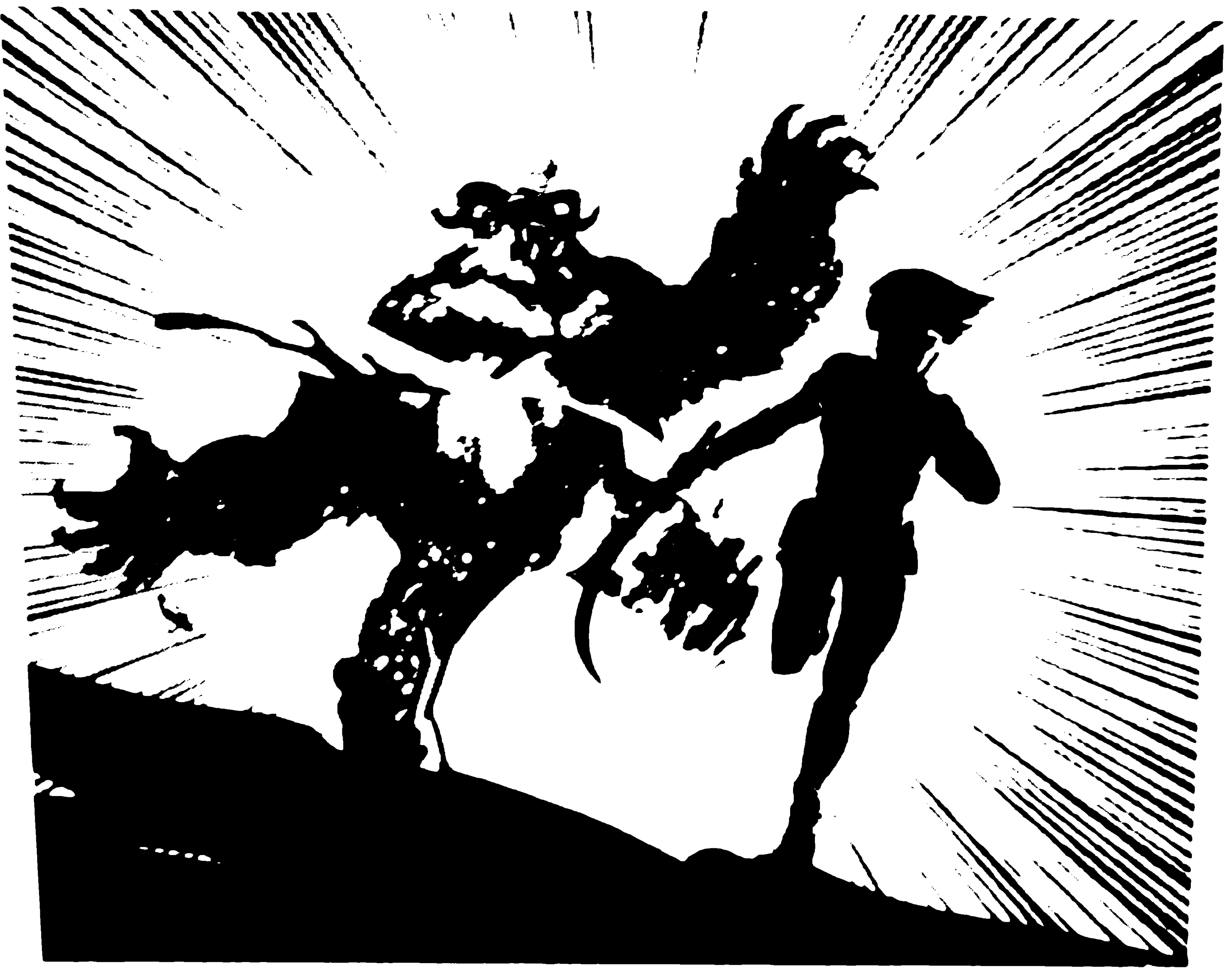
চমকে ওঠার পরেও তার ছুঁড়ে দেওয়া অস্ত্রটা অসম্ভব দক্ষতায় ধরে ফেলল মেঘবর্ণ। অস্ত্রহাতে সমরোত্তমকে এবার কে আটকায়?

রাক্ষসরা তাও এগিয়ে এল গর্জন করে। নিভীকভাবে লড়াই শুরু করল মেঘবর্ণ।

রাক্ষসগুলো দেখতে পেয়েছে অভীকে; তার দিকে এগিয়ে এল তারা। অভী কিছু না ভেবেই হাত বাড়িয়ে দিল। তার হাত ঠেকল কাঠের বাক্সে।

বাক্সের আবরণটা যেন গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। শিবের বাঁকানো তরবারি চন্দ্রহাস যেন নিজে থেকেই উঠে এল তার হাতে; झুলে উঠল তীব্র সাদা আগুনের মতো।

সেই তরবারি হাতে নিয়ে অভী কাঁপিয়ে পড়ল রাক্ষস-সমূহের মাঝখানে।



।। একাদশ অধ্যায় ।।

গুপ্তচর

কয়েক মুহূর্তের জন্য অভী যেন বুঝে উঠতে পারছিল না, সে কী করছে। তার হাতের বাঁকা চাঁদের মতো তরবারিটা থেকে যেন আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। তরবারি তাকে টেনে আনছে যুদ্ধক্ষেত্রে - ঠেলে দিচ্ছে শত্রুর সামনে।

পরিস্থিতিটা যখন সে একটু বুঝতে পারল, তখন দেখল অন্তত দশ-বারোজন অস্ত্রধারী রাক্ষস তার চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখে ভয়, বিস্ময়। চার-পাঁচটা রাক্ষস পড়ে আছে মাটিতে। মেঝেতে মশালের আলোয় দেখল সে, চাপ চাপ কালচে রক্ত!

অভী দেখল, তার হাতে ধরা চন্দ্রহাস থেকে ঝরে পড়ছে রক্তের বিন্দু!

সে মেরেছে এই রাক্ষসগুলোকে!

অভী অনুভব করল, তার শরীরের শিরায় শিরায় যেন ছুটে বেড়াচ্ছে প্রবল শক্তির তরঙ্গ। তরবারিটা এত হালকা লাগছে যে মনেই হচ্ছে না সে ওটাকে ধরে আছে। চন্দ্রহাসের আলো এসে পড়েছে সারি সারি সাজানো কাচের বাক্সের মধ্যে রাখা অস্ত্রগুলোতে, দেয়ালের তৈলচিত্রগুলোতে। সেই আলোতে অভী স্পষ্ট দেখল শত্রুর চোখে ভয়।

চন্দ্রহাস যেন আবার টেনে আনল তার হাত - একটা রাক্ষস দীর্ঘ তরবারি দিয়ে আক্রমণ করেছিল; চন্দ্রহাসের ফলকে ঠেকতেই সে তরবারি দুটুকরো হয়ে গেল।

মেঘবর্ণ চিৎকার করল, “অভী! পেছনে!”

পেছন থেকে গদা তুলে লুকিয়ে তাকে মারতে আসছিল একজন - অতী অবিশ্বাস্য গতিতে ঘুরে গেল গোড়ালিতে ভর দিয়ে। তার তরবারির স্পর্শমাত্র দুটুকরো হয়ে গেল রাক্ষসটা - গদাটা আছড়ে পড়ল মাটিতে।

অতী দেখতে পাচ্ছে, মেঘবর্ণের হাতে অস্ত্র যেন কথা বলছে। অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘাতের ধাতব শব্দে ভরে উঠেছে সংগ্রহশালা। অতগুলো রাক্ষস যেন কিছুতেই পেরে উঠছে না ওই একটা লোকের সঙ্গে।

এক মুহূর্তের জন্য অসতর্ক হয়েছিল সে - একটা মুষলের আঘাত প্রায় এসে পড়ল তার মুখে। শেষ মুহূর্তে মাথাটা একটু সরিয়ে নিতে পেরেছিল অতী - তাই প্রাণটা বেঁচে গেল; অস্ত্রটা তাও ভোঁতা একটা আঘাত করে গেল তার ঠোঁটে। চোয়ালটা যেন ঝনঝন করে উঠল।

ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে, মুখে তার লবণাক্ত স্বাদ পাচ্ছে অতী। ছায়া ছায়া রাক্ষসগুলো আবার ঘিরে ধরছে তাকে। নাকে আসছে বন্ধ ঘামের গন্ধ। অতী অনুভব করল, রক্তের স্বাদ জিভে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে।

মেঘবর্ণের হাতে তরবারি যেন শিল্পীর হাতে তুলি। একের পর এক শত্রুনিধন করছে সে। কিন্তু রাগে অতী যেন উন্মত্ত হয়ে উঠছে। তরবারিটা যেন তাকে বলছে সামনে যা কিছু আছে সব ধ্বংস করে ফেলতে। মেঘবর্ণ শিল্পী হতে পারে, কিন্তু সে নয় - তার হাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সর্বনাশী মারণাস্ত্র চন্দ্রহাস। ধকধক করে সাদা অগ্নিশিখার মতো জ্বলছে তার বক্ষিম দেহ।

ঝনঝন করে তরবারি ঘোরাতে লাগল অতী। মনে হতে লাগল, আবছা অন্ধকার কক্ষের মধ্যে ঘুরছে একটা উজ্জ্বল সাদা চক্র, আর তার স্পর্শ যার শরীরে সামান্য হলেও লাগছে, সেই দু'খণ্ড হয়ে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে। কাচের বাক্সগুলোর গায়ে ছিটকে ছিটকে এসে লাগছে রক্ত। রাক্ষসদের অস্ত্রশস্ত্র ঝনঝন শব্দে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে। অনেকে ছুড়ে মারছে মুষল, ভিন্দিপাল, তোমর - কিন্তু অস্ত্রগুলো সেই সাদা আগুনের চক্রে ঠেকেই কয়েক টুকরোয় ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। আগুনের চক্রটা ছুটছে সারা ঘরে - এক এক করে মারছে শত্রুদের। অতীর শরীরে যেন এক অমানুষী শক্তি ভর করেছে - তার মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে লাল, চক্ষু বিস্ফারিত, সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। সে রক্ত নিজের, না শত্রুর - অতীর আর কোনো হুঁশ নেই। সে যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। এই সর্বধ্বংসী অস্ত্রচালনাই যেন তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

“শান্ত হও! অতী, শান্ত হও!” চিৎকার করে বলল মেঘবর্ণ।

আরও কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল অতীর কথাটা বুঝতে। কী যেন বলছে মেঘবর্ণ? তার চোখের দৃষ্টি এরকম ঝাপসা লাগছে কেন? যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে।

মেঘবর্ণ বলছে, সে শুনতে পেল, “অতী, থামো, থামো! আর কেউ বেঁচে নেই! এবার থামো!”

আর কেউ বেঁচে নেই!

কথাটা উপলব্ধি করতেই আপনা থেকেই অভীর অঙ্গহাতে পাগলের মতো ঘোরা বন্ধ হয়ে গেল। তার হাতের চন্দ্রহাস থেকে তখন ঝরে পড়ছে ধোঁয়াওঠা গরম রক্ত।

আস্তে আস্তে চন্দ্রহাস থেকে ঝরে গেল সব রক্ত – একটু দাগও রইল না তার উজ্জ্বল বন্ধিম ফলকে। তারপর নিভে গেল তার সাদা আলো।

এইবার বেশ ভারী লাগছে অঙ্গটা। অভী সেটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে গিয়ে বুঝতে পারল, মাথা টলছে তার।

মেঘবর্ণ ধরে ফেলল তাকে; বলল, “এই পরিমাণে ভয়ংকর দৈবশক্তি নিজের দেহ দিয়ে চালনা করেও তুমি যে অজ্ঞান হয়ে যাওনি এখনও, তাতেই আমার অবাক লাগছে।”

চারপাশে ছড়িয়ে আছে কর্তিত দেহগুলো। অভীর জামাকাপড়, হাত, মুখ রক্তে মাখামাখি। দেওয়ালে, সংগ্রহশালার নিদর্শনগুলোতে, দরজার গায়ে – সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ছিটিয়ে যাওয়া রক্তের কুশ্রী ছাপ। এতক্ষণে অভী যেন পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারল, কী ভয়ংকর ঘটনা সে ঘটিয়েছে।

সে বিহ্বল কণ্ঠে বলল, “মেঘবর্ণ, আমি... আমি কী করে...?”

মেঘবর্ণ জ্রকুটি করে বলল, “হঁ। আমিও তো তাই ভাবছি।”

মাটিতে পড়ে আছে চন্দ্রহাস। সভয়ে সেদিকে তাকাল অভী। ওটা হাতে নিয়ে যেন একটা ভয়ংকর দৈত্য হয়ে গিয়েছিল সে।

অভী বলল, “আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কী করে এসব হয়ে গেল! মেঘবর্ণ, সত্যি বলছি, তরবারটা যেন আমাকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করছিল! নয়তো আমি কতটুকু অসিচালনা জানি, তুমি তো জানোই।”

মেঘবর্ণ বলল, “শুধু সেটাই নয়, আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, চন্দ্রহাস অতি শক্তিশালী দৈব অস্ত্র। স্বয়ং ঐশিকরাও এ দিয়ে যুদ্ধ করতে পারেন না। সেই অস্ত্র তোমার হাতে এরকম জীবন্ত হয়ে উঠল কেন, সেটাই আমাকে বেশ চিন্তায় ফেলেছে।”

দরজার এক কোণে একটা কাঠের চৌকো আকৃতির কাঠামোর ওপর একটা ঘণ্টার ছবি আঁকা ছিল লাল রঙে। তার ওপর হাত রাখল মেঘবর্ণ। মায়াঘণ্টার ধ্বনিতে ভরে উঠল সমরগরিমা আয়তন।

সবার আগে এসে পৌঁছোলেন অধিনায়ক বজ্রধর। দেখে বোঝাই যাচ্ছে, বিপদঘণ্টা শুনে যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি তৈরি হয়ে এসেছেন তিনি। তাঁর হাতের দণ্ডটা থেকে নীলচে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হচ্ছে, দেখতে পেল অভী। তারপরেই এসে পড়লেন শ্যামশ্রী, তাঁর সঙ্গে পর্বত।

মায়াঘণ্টার শব্দ ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। শিক্ষার্থীরা বিপদের আভাস পেয়ে অঙ্গহাতে ছুটে আসছে রাত্রিশয্যা ছেড়ে। বজ্রধর কক্ষ প্রবেশ করেই বুঝে ফেললেন পরিস্থিতি। তিনি বললেন, “এই দৃশ্য সবাইকে দেখতে দেওয়া যাবে না। পর্বত, তুমি দরজার বাইরে থাকো। শিক্ষার্থীরা এলে তাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে ফেরত পাঠাও। আমরা ভেতরের পরিস্থিতি সামলাচ্ছি। শ্যামশ্রী, দরজা লাগিয়ে দাও ভেতর থেকে – আমি না বলা পর্যন্ত খুলবে না।”

অভী একবার বাইরের জমায়েতটার মধ্যে নিধি আর লীনা কে দেখতে পেল। তাকে তার কক্ষে খুঁজে না পেয়ে এখানে আসার আগে ওরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর এখানে এসে তার রক্তমাখা বিধ্বস্ত রূপ এক পলকের জন্য দেখতে পেয়ে ওদের মুখ হাঁ হয়ে গেছে, নজরে পড়ল তার।

বজ্রধর যখন শ্যামশ্রীকে দরজা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন, তখন মেঘবর্ণ অভীকে টেনে আনল একপাশে; চাপা গলায় বলল, “তুমি এত রাতে এখানে কী করছিলে, আর আমি কী করছিলাম, এ-ব্যাপারে আমরা দু’জনেই আপাতত মুখ বন্ধ রাখব - ঠিক আছে? পরে সময়-সুযোগ বুঝে দু’জনে বিষয়টা আলোচনা করে নেব, বুঝতে পেরেছ?”

অভী মাথা নাড়ল। সত্যিই তো, সে এত রাতে আয়তনে কী করছিল, তার বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ত কীই বা দেবে সে? তার চেয়ে মেঘবর্ণই সামলাক ব্যাপারটা।

বন্ধ দরজার ওপার থেকে পর্বতের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে - ছাত্রছাত্রীদের সে আশ্বস্ত করছে যে সব ঠিক আছে, কোনো গণ্ডগোল হয়নি। ছাত্রছাত্রীরা তাও যেতে চাইছে না, একবার কথা বলতে চাইছে সমরোত্তমদের কারও সঙ্গে।

শোনা গেল, পর্বত বলছে, “তাহলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তোমাদের।”

কক্ষের মধ্যে বজ্রধর একবার নিরীক্ষণ করে নিলেন ধ্বংসলীলার পরের অবস্থাটা। তারপর তিনি ফিরলেন মেঘবর্ণের দিকে।

মেঘবর্ণ তৈরিই ছিল। সে বলল, “সকো থেকে গ্রন্থাগারে ছিলাম। বই পড়া আর রক্ষোবৈদ্য মহাশয়ের সঙ্গে গল্প - দুটোই চলছিল। তারপর এই কিছুক্ষণ আগে মনে পড়ল ভীমের গদা যে বাক্সে ছিল, তার সুরক্ষামায়া ঠিকমতো কাজ করছিল না। তাই এখানে এসেছিলাম মায়াসুরক্ষার বন্ধনটা ঠিক করে দিতে। এমন সময় অভী এসে ঢুকল ছুটতে ছুটতে।”

অভী অবাক হয়ে দেখছিল, কী দারুণ গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে মেঘবর্ণ। সম্ভবতঃ বজ্রধর এবং শ্যামশ্রী তা বিশ্বাসও করছেন।

সে বলে চলল, “অভীর ঘুম আসছিল না বলে ও বসে ছিল মিত্রভবনে ওর কক্ষের জানালার ধারে। হঠাৎ ওর চোখে পড়ে একদল রাক্ষস তাদের নিজস্ব জটায়ুবাহিনী নিয়ে উড়ে আসছে আয়তনের দিকে। রাক্ষসরা সংগ্রহশালাটা প্রথমে খুঁজে পায়নি। সেই অবসরে ও ছুটে এসে আমাকে খবর দেয়।”

অভী কিছু বলার ভাষাও যেন হারিয়ে ফেলেছে। কী দক্ষভাবে মিথ্যে কথা বলে মেঘবর্ণ তাকে বাঁচিয়ে দিল অনেক অবাঞ্ছিত প্রশ্নের হাত থেকে!

শ্যামশ্রী বললেন, “তারপর?”

মেঘবর্ণ তারপর যা বলল, তা অবশ্য নির্জলা সত্যি কথা। একটু আগে ঘটে যাওয়া যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিল সে। সব শুনে স্তব্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন বজ্রধর আর শ্যামশ্রী।

অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বাস না করে উপায় নেই। ঘরময় পড়ে থাকা শতখণ্ড রাক্ষসই বলে দিচ্ছে, কী তাগুব চলেছে এখানে।

“স্বচক্ষে কাউকে জ্বলন্ত চন্দ্রহাস নিয়ে যুদ্ধ করতে দেখব, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।” এই বলে তার কথা শেষ করল মেঘবর্ণ।

শ্যামশ্রী বললেন, “কীভাবে সম্ভব হল এ ঘটনা, অধিনায়ক বজ্রধর?”

বজ্রধর বললেন, “নিয়তিই পাঠিয়েছেন এই অস্ত্র আমাদের সংগ্রহশালায়। আবার নিয়তিই আজ অতীকে এই মোক্ষম মুহূর্তে এনে দিয়েছেন এখানে। এর চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা আর আমার মাথায় আসছে না। তবে অতী, তোমার মধ্যে অসম্ভব শক্তিশালী সমরগরিমা আছে। নয়তো ওই ভয়ংকর দৈবাস্ত্র তোমার হাতে উঠেও আসত না, আর যুদ্ধে তোমাকে বিজয়ী হতে সাহায্যও করত না।”

শ্যামশ্রী বললেন, “আমার জ্ঞানমতে এরকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি, যেখানে দৈবাস্ত্র নিজে থেকে উঠে এসেছে তার অধিকারীর হাতে।”

মেঘবর্ণ বলল, “আর এল কোন্ দৈবাস্ত্র? সবচেয়ে ভয়ংকর এবং সবচেয়ে অদ্ভুত অস্ত্রটি! যে অস্ত্রের ধারক একদিকে ছিলেন স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব এবং অন্যদিকে ছিলেন মহাপরাক্রমশালী রাক্ষসরাজ রাবণ! এই অস্ত্র অতী হাতে তুলে নিতে পারল কী করে, তাই তো বুঝতে পারছি না আমি। সাধারণ মানুষের এ ধরনের অস্ত্র একবার ব্যবহার করার জন্য হাতে নিলেই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা। আর কয়েকবার যদি করেও ফেলে জোর করে, তাহলে ওই অস্ত্রের শক্তিতেই তার মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা নিরানব্বই শতাংশ। সেখানে অতী...!”

বজ্রধর বললেন, “তবে একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পেরেছি। অতীর স্বাভাবিক অস্ত্র এই চন্দ্রহাসের মতো বহুমুখী ফলকের তরবারি। তাই অসিযুদ্ধে দক্ষতা থাকলেও আশানুরূপ ফললাভ হচ্ছিল না ওর।”

দরজায় টোকা দিল পর্বত বাইরে থেকে। “সহকারী নিয়ামক মহোদয় এসেছেন।”

শ্যামশ্রী বললেন, “ওঁকে তো আটকে রাখা যায় না বাইরে।”

বজ্রধর বললেন, “তার দরকারও নেই। এতবড়ো ব্যাপার ঘটেছে আয়তনে – রাক্ষসদের আক্রমণ ঘটেছে সংগ্রহশালায় – নিয়ামক বিনীতেশ জানতে পারবেনই। বরং সহকারী নিয়ামক নারদ ঠান্ডা মাথার মানুষ; ওঁকে বিষয়টা বিশদে অবহিত করে রাখলে ক্ষতি নেই।”

শ্যামশ্রী দরজা খুলে দিলেন। নারদ দাঁড়িয়ে ছিলেন বাইরে; তাঁর পাশেই অতী নিধির উৎকণ্ঠিত মুখটা একবার দেখতে পেল; একবার তার মনে হল, নিধির মুখে একটা দুষ্টমিমাখা হাসি। তারপরেই শ্যামশ্রী দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলেন।

ভেতরের দৃশ্যটা দেখে ক্ষণিকের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন নারদ। মুখে হাত চাপা দিয়ে বিস্ফারিত চোখে তিনি বললেন, “অধিনায়ক বজ্রধর! এসব কী? মানে কী এর?”

বজ্রধর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “এর মানে একটাই। চঞ্চলের দেওয়া খবর একদম সঠিক। সত্যিই শর্বরকে মুক্ত করার প্রবল প্রচেষ্টা চলছে।”

নারদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “তাহলে নিয়ামক মহোদয়ের সন্দেহই সত্যি?”

“হুম্। ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না। কিন্তু সত্যিকে অস্বীকার করে নিজেদের বিপদ বাড়িয়ে লাভ নেই। রাক্ষসরা একটা দৈবাস্ত্র চুরি করতেই এসেছিল, সে-কথা মেঘবর্ণ এবং অভী দু’জনেই ওদের বলতে শুনেছে। অতএব এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে কেউ একজন – সম্ভবত সেই উর্ণায়ু নামক রহস্যময় ব্যক্তিটি – শর্বরকে মুক্ত করতে খুবই আগ্রহী। আমার বিশ্বাস, সেই আছে আজকের এই আক্রমণের পেছনে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “নিতান্ত দৈববশে আজ ওদের একজনও বেঁচে ফিরতে পারেনি। কিন্তু একটা রাক্ষসও যদি কোনো একটা শক্তিশালী দৈবাস্ত্র নিয়ে পালাতে সক্ষম হত, তাহলে অনর্থ হয়ে যেত।”

নারদ একবার অস্বস্তিভরে অভীর দিকে তাকিয়ে নিলেন। বোঝা গেল, তার সামনে এসব গোপন আলোচনা করা তিনি পছন্দ করছেন না।

বজ্রধর বললেন, “অভী, তুমি যাও আপাতত। বিশ্রাম প্রয়োজন তোমার। তোমার বন্ধুদের কাছেও এ-বিষয়ে কোনো আলোচনা কোরো না যেন। আমি পরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে নেব। আর যাওয়ার আগে পর্বতকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ো।”

মেঘবর্ণ বলল, “চন্দ্রহাস এখানেই থাক। তোমার পক্ষেও ওই ভয়ংকর অস্ত্র বহন করা ঠিক নয়। আমাদের আয়তনের অস্ত্রাগার থেকে তোমার জন্য একটি বক্ষিম অসির ব্যবস্থা আমি করে দেব।”

অভী অনিচ্ছাসহকারেই বেরিয়ে গেল। আলোচনাটা শোনার ইচ্ছা ছিল তার, কিন্তু বজ্রধরের আদেশ তো আর অমান্য করা চলে না।

তবে বন্ধুদের সব বলবেই সে। সম্ভবত বজ্রধরও তা জানেন, শুধু নারদকে শুনিয়ে ওকথা বলেছিলেন।

বাইরে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা চলে গেছে, শুধু দূরে এক কোণে লীনা আর নিধি বসে বসে নিজেদের মধ্যে কীসব কথাবার্তা বলছে – দু’জনেরই মুখে হাসি।

পর্বত দাঁড়িয়েছিল দরজার বাইরে। অভী বলল, “পর্বতদা, অধিনায়ক বজ্রধর তোমাকে ডাকছেন।”

অভীর রক্তমাখা চেহারাটার দিকে একবার বিস্মিত চোখে দেখে নিল পর্বত; তারপর কিছু না বলে মাথা নেড়ে সে কক্ষের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ওকে দেখে মেয়েদুটো হাতের ইশারায় ডাকল ওকে। অভী গিয়ে দাঁড়াতেই লীনা বলল, “চুপ করে বোসো। তোমার গল্প পরে শুনব। আগে বড়োকর্তাদের গল্পটা শুনে নিই।”

একটা ছোট পাথর তুলে তাকে দেখাল নিধি। অভী বলল, “এটা তো একটা স্বপ্ন-উপল। কী হবে এ দিয়ে?”

লীনা চাপা গলায় বলল, “বেশি না বকে কাছে এসে বোসো। সব শুনতে পাবে।”

তার মুখের অবস্থা দেখে নিধি ব্যাখ্যা করে বলে দিল, “কোনো কোনো স্বপ্ন-উপল একসঙ্গে দুটো জুড়ে থাকে। সেগুলোকে মায়াবলে আলাদা করা যায়। তখন তাদের একটা শোনে, আর অন্যটা শোনায়।”

পাথরটা থেকে মেঘবর্ণের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। “চন্দ্রহাস থেকে আগুনের মতো শিখা বেরোচ্ছিল, এ দৃশ্য আমি যতদিন বাঁচব, ভুলব না।”

অভী অবাক হয়ে তাকাল ওদের মুখের দিকে। লীনা বলল, “এই স্বপ্ন-উপলের জোড়াটা এখন ওই সংগ্রহশালার মধ্যে। সে শুনছে ওদের কথাবার্তা, আর এইটি আমাদের শোনাচ্ছে সে যা শুনছে।” – নিধির হাতের স্বপ্ন-উপলটার দিকে আঙুল দেখাল সে।

অভী অবাক হয়ে বলল, “এর জোড়াটা ভেতরে গেল কী করে?”

নিধি মিষ্টি করে হাসল। “নারদের সঙ্গে। ওঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম একটু আগে। জানতাম উনি ভেতরে অবশ্যই যাবেন। তখনই ওঁর পোশাকের এক কোণে ওটা গলিয়ে দিয়েছি।”

অভী বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল। মেয়েটা পারেও বটে!

স্বপ্ন-উপল থেকে বজ্রধরের গলা শোনা গেল। “কোনো কোনো দৈব-অসি আছে, যারা রক্তপান করে। যত রক্তপাত তারা ঘটায়, ততই কালো হয়ে যায়। কিন্তু চন্দ্রহাসকে দেখো – সব রক্ত ঝরিয়ে ফেলে দিয়ে এ আবার কেমন ঝকঝকে হয়ে গেছে!”

কিছুক্ষণের নিঃশব্দতা। তারপর মেঘবর্ণ বলল, “আর এদিকে এই তরবারিটা খেয়াল করে দেখেছেন?”

শ্যামশ্রী বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, “এ তো...!”

মেঘবর্ণ বলল, “হ্যাঁ। অভী এটাই আমাকে ছুড়ে দিয়েছিল, আর সেই বিপদের মুহূর্তে আত্মরক্ষার আর কিছু না পেয়ে এটা দিয়েই আমি যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলাম।”

শ্যামশ্রী বললেন, “তা কী করে সম্ভব? এ অস্ত্রের সমরগরিমা তো অনেকদিন আগেই একে ছেড়ে চলে গেছে। আত্মাহীন অস্ত্র নিয়ে তোমার পক্ষে যে একটা আঘাতও ঠেকানো সম্ভব ছিল না, মেঘবর্ণ!”

মেঘবর্ণের কণ্ঠে উত্তেজনা স্পষ্ট। “সেই কথাই তো বলছি। কোনো গর্বিত যোদ্ধার অস্ত্র যেরকম স্পন্দিত হয়, সেইরকম স্পন্দন আমি এটা হাতে নিতেই অনুভব করেছি। ঠিক আগে যেরকম ছিল এ তরবারি, একদম সেইরকম।”

শ্যামশ্রী বললেন, “অধিনায়ক বজ্রধর, এই মায়া আমারও জ্ঞানের অতীত। সমরগরিমাহীন, বহু বছর আগে মৃত মানুষের এই তরবারির স্পন্দন হওয়া অসম্ভব – আপনিও জানেন, আমিও জানি। তাহলে আজ হঠাৎ কেন...? অভীর স্পর্শে?”

বজ্রধর বললেন, “হওয়া অসম্ভব নয়। ও ছেলে স্বয়ং শিবের চন্দ্রহাস নিয়ে যুদ্ধ করেছে। যতটা সাধারণ ওকে দেখায়, ততটা ও মোটেই নয়। ওর ইতিহাসও তো সেই কথাই বলছে।”

কক্ষের বাইরে এরা তিনজন অবাক হয়ে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করল। অতী অবাক হয়ে বলল, “আমার ইতিহাস? কীসের ইতিহাস আমার?”

নরদ হঠাৎ বলে উঠলেন, “তাহলে কি সেই গোপন ভবিষ্যদ্বাণীতে যার কথা বলা হয়েছিল...?”

বজ্রধর তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “জানি না। এখনই তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। আর, সেই প্রলয়যুদ্ধের কথা আলোচনার সময়ও এটা নয়।”

আরও কী যেন বলছিলেন তিনি, এমন সময় ওরা দেখল সেই ওগুর অর্ধরাক্ষস চঞ্চল আসছে এদিকে। তাকে আসতে দেখেই স্বপ্ন-উপলটা চট করে লুকিয়ে ফেলে নিধি অমায়িক হসি হেসে বলল, “চঞ্চলদা যে! কী খবর?”

চঞ্চল গোমড়ামুখে বলল, “খবর ভালো না। সমস্তেভমদের খুঁজছি। কোথায় তাঁরা?”

লীনা বলল, “ওই যে, ওখানে। সংগ্রহশালায়।”

আর কোনো কথা না বলে সংগ্রহশালার দরজায় গিয়ে টোকা দিল চঞ্চল। পর্বত দরজা খুলে দিল; সে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

লীনা বলল, “জলদি করো নিধি, পাথরটা বার করো। চঞ্চলদা কী গোপন খবর এনেছে, শুনতে হবে।”

নিধি পাথরটা বার করে আনতে আনতেই তার মধ্যে থেকে ভেসে এল বজ্রধরের গলা। “খবর দিতে দেরি হচ্ছে তোমার, চঞ্চল।”

চঞ্চল বলল, “আগে তো নিজের প্রাণ, তারপর তো খবর পাঠানো! উর্গায়ু যদি জানতে পারে যে আমি এইসব খবর আপনাদের নিচ্ছি, তাহলে আমার মৃতদেহটাও আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওই উর্গায়ুকে আমি শর্বরের থেকেও বেশি ভয় পাই। শর্বর ভয়ংকর যোদ্ধা, ভীষণ নিষ্ঠুর, সবই ঠিক; তবু শর্বরকে আমি বুঝতে পারি। কিন্তু উর্গায়ু যে কখন কী চায়, কখন কোন্ বুদ্ধি তার মাথায় খেলছে, কাকে সে কীভাবে ব্যবহার করতে চলেছে, কিছু বোঝার উপায় নেই, আর সেইজন্যই তাকে ভয় পায় না এমন কেউ নেই।”

একটু থেমে সে বলল, “আজ রাতের আয়তনের আক্রমণের সংবাদটা যে ক’জন এসেছিল, তারা ছাড়া কেউই জানত না। আমিও পাইনি খবরটা; পেলে অবশ্যই আপনাদের কাছে যেভাবেই হোক পৌঁছে দিতাম।”

বজ্রধর বললেন, “নতুন কোনো খবর আছে তাহলে নিশ্চয়ই?”

“আছে। উর্গায়ুর খবর আছে।”

বাইরে এরা তিনজন নড়েচড়ে বসল। উত্তেজনায় হাতের নখ কামড়াচ্ছে নিধি। অতীও চোখেমুখে উত্তেজনা। “উর্গায়ুর খবর? অবশেষে!”

চঞ্চল বলল, “আজ রাতে ছায়াভবনে রাক্ষসদের আর একটা গোপন সম্মেলন আছে। গত সম্মেলনে উর্গায়ু কথা দিয়ে গেছে, আজ সে বলবে কীভাবে আয়তনকে আক্রমণ করে সমরগরিমাকে দখল করা যায়।”

শ্যামশ্রী বললেন, “এ তো দারুণ খবর! আজ রাতেই ছায়াভবন আক্রমণ করে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারি আমরা। জীবিত হোক বা মৃত – উর্গায়ু ধরা

পড়বেই।”

মেঘবর্ণ বলল, “না শ্যামশ্রী, উর্গায়ু রূপান্তরে অত্যন্ত দক্ষ বলে শুনেছি। আমরা আসছি খবর পেলেই সে পালাবে, নতুবা এমন রূপ ধারণ করবে, যাকে আমরা চিনতেই পারব না। পুরো বাহিনী নিয়ে অন্ধকার গভীর পীতপত্রবনের মধ্য দিয়ে আমরা যেতে যেতেই ওরা খবর পেয়ে যাবে। তারপর পৌঁছে আমরা দেখব, পাখি পালিয়েছে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “তাহলে আর একটা কাজ করা যেতে পারে। আমরা সমরোত্তমরা ‘রাক্ষস’ সেজে দর্শকদের ভিড়ে মিশে থাকতে পারি। তারপর সুযোগ বুঝে উর্গায়ুকে...”

চঞ্চল বলল, “সেটা বোধহয় ঠিক হবে না, সমরোত্তম শ্যামশ্রী। রাক্ষসদের ঘ্রাণশক্তিও বেশ তীক্ষ্ণ। ছদ্মবেশ ধারণ করলেও আপনাদের দেহ থেকে সমরোত্তমদের বীরহৃদয়ঙ্গক কাঁঝালো গন্ধ পায় রাক্ষসরা। আপনারা শীঘ্রই ধরা পড়ে যাবেন।”

অভী আর লীনা হেসে উঠল। “বীরহৃদয়ঙ্গক কাঁঝালো গন্ধ!” কিন্তু নিধি বলল, “হেসো না। আমরা অর্ধরাক্ষসরা বেশ ভালমতই টের পাই গন্ধটা। রাক্ষসরা তো পাবেই। মানুষের গন্ধ, সমরোত্তমদের গন্ধ, বীরের গন্ধ, কাপুরুষের গন্ধ – সব বোঝা যায় কিছুদিন গন্ধবিচার অভ্যাস করলেই।”

লীনা বলল, “খুব হয়েছে একর শোনা মন দিয়ে।”

নারদের গলা শোনা গেল। “তাহলে উপায় কী?”

বজ্রধর বললেন, “তাই তো ভাবছি।”

চঞ্চল বলল, “আমি একটা উপায় বলতে পারি।”

বজ্রধর বললেন, “বলো।”

“যদি জনা দুই শিক্ষার্থীকে অনুমতি দেন, তাহলে তাদের আমি রাক্ষস সাজিয়ে ওখানে নিয়ে যেতে পারি। উর্গায়ুর পরিকল্পনাটা তাহলে তারা স্বকর্ণে শুনে এসে আপনাকে বলতে পারে।”

বজ্রধর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, “অসম্ভব। এই কাজের জন্য আমি শিক্ষার্থীদের বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না।”

শ্যামশ্রীও বললেন, “আমারও এতে একদম মত নেই। ধরা পড়লে ওদের মৃত্যু নিশ্চিত।”

মেঘবর্ণ বলল, “বা ওদেরকে পণবন্দি করে তখন উর্গায়ু হয়তো আয়তনের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করবে।”

নারদ বললেন, “তুমি তো নিজেই ওখানে আছ, চঞ্চল। কোনো সংবাদ থাকলে তো তুমিই এসে দিতে পারো আমাদের।”

চঞ্চল বলল, “ওখানে কী অবস্থায় আমাকে থাকতে হয়, জানেন না বলেই কথাটা বলছেন, সহকারী নিয়ামক মহোদয়। ছায়াভবন সরাইখানা যে সমরগরিমার অর্থে চলে, এ-কথা তো আর রাক্ষসদেরও অজানা নেই। আমি যে শুশুচর, সে-কথাও মাননীয় নিয়ামক মহোদয় প্রকাশ্য সভায় বলেছেন। তাও যে আমার তত্ত্বাবধানে চলা ছায়াভবনে রাক্ষসরা নিয়মিত আসে, তার দুটো কারণ।

প্রথমত, একমাত্র এইখানেই মানুষদের চোখের আড়ালে স্থানীয় অর্ধরাক্ষসরা নিজেদের মতো জমায়েত হতে পারে। আর দ্বিতীয়ত, রাক্ষসরা মনে করে, আমি সরকারিভাবে সমরগরিমা-নিযুক্ত গুপ্তচর হলেও আমার সহানুভূতি রাক্ষসদের দিকেই - অর্থাৎ সমরগরিমায় রাক্ষসদের সম্পর্কে ইচ্ছা করে আমি ভুল তথ্য দিই, আর সমরগরিমার খবর গোপনে পাচার করি রাক্ষসদের কাছে। শুধু এইটুকু বিশ্বাস ওদের আছে বলেই বেঁচে আছি এখনও। যখন ছায়াভবনে কোনো সম্মেলন চলে, তখন আমাকে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতে হয় অতিথিদের পান-ভোজনের ব্যবস্থা করার কাজে। তাই অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই আমার কান এড়িয়ে যায়।”

বজ্রধর বললেন, “ঠিক আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তুমি যতটুকু খবর আনতে পারো, তার ওপরেই আমাকে ভরসা করতে হবে, চঞ্চল। কোনো শিক্ষার্থীকে এভাবে আমি শত্রুশিবিরে পাঠাতে পারি না।”

কক্ষের বাইরে তিনজনের দ্রুত কথা হল চোখে চোখে। চঞ্চল বেরিয়ে এল একটু পরেই।

তার মুখ গম্ভীর। হনহন করে সে হেঁটে চলেছিল অলিন্দপথে। সকাল হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে এসে পড়ছে নরম আলো।

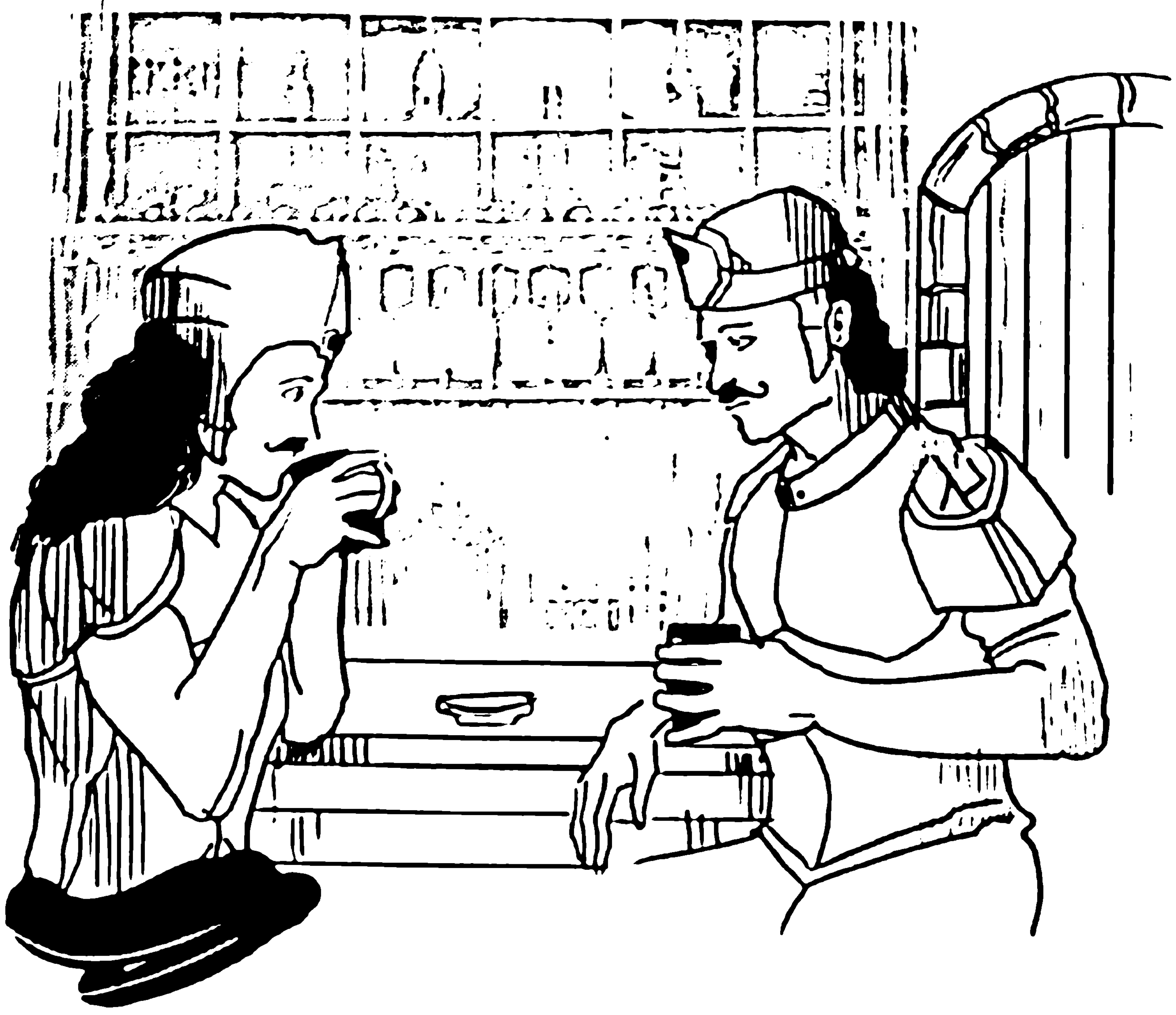
লীনা আর নিধি চলল তার পেছনে। জামাকাপড় রক্তাক্ত বলে একটু পেছনে রইল অভী।

নিধি মিহিসুরে ডাকল, “চঞ্চলদা! ও চঞ্চলদা!”

চঞ্চল ফিরে তাকাল একটু অবাক হয়ে। লীনা আর নিধি এবার একসঙ্গে বলে উঠল, “একটা কাজ করে দাও না আমাদের, চঞ্চলদা। ‘না’ বললে শুনবে না।”

চঞ্চল একটু হাসল; বলল, “আচ্ছা, ঠিক আছে। কাজটা কী, আগে তো বলো!”

কিন্তু কাজ শুনেই সে চিৎকার করে উঠল, “তোমরা কি পাগল হয়েছ?”



।। দ্বাদশ অধ্যায় ।।

ছায়াভবন

চঞ্চল কিছুতেই রাজি হবে না; এরাও ছাড়বে না।

চঞ্চল বলছিল, “সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর যদি জানতে পারেন এর সঙ্গে আমি যুক্ত আছি, আমাকে উনি জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।”

নিধি বলল, “চঞ্চলদা, কেউ জানতে পারবে না। আমরা ছদ্মবেশে চুপিচুপি যাব, সবার সঙ্গে মিশে থাকব। কেউ চিনতে পারবে না আমাদের।”

চঞ্চল ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। “তোমার বাবাও নয়?”

নিধির কথা বন্ধ হয়ে গেল। চঞ্চল বলল, “তোমার বাবাকে আমি প্রায়শই দেখি ওখানে যেতে। তোমাদের মধ্যে যার কোনোভাবেই ওখানে যাওয়া চলবে না, সে তুমি, নিধি। সুদক্ষিণসারির প্রচুর অর্ধরাক্ষস থাকে ওখানে। তোমার বাবা-সহ অনেকেই চিনে ফেলবেন তোমাকে, তার সম্ভাবনা বিরাট।”

অভী বলল, “তাহলে আমি আর লীনা যাব। আমাদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।”

চঞ্চল বলল, “কমবয়সি রাক্ষসরাও যায় বটে ওখানে। সেদিক থেকে ধরা পড়ার ভয় তোমাদের খুব একটা নেই। কিন্তু রাক্ষসদের সব আদব-কায়দা তো তোমাদের জানা নেই। চিন্তাটা সেখানেই।”

লীনা বলল, “সে আমরা ঠিক সামলে নেব। তুমি আমাদের ওখানে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেবে তো?”

চঞ্চল বলল, “সে-বিষয়ে ভাবতে হবে না। ছায়াভবন একটা সরাইখানা – সকলেই আসতে পারে ওখানে, যদিও বাস্তবে রাক্ষস আর অর্ধরাক্ষস ছাড়া আর কেউই যায় না। একটা কথা শিখিয়ে দিচ্ছি – ওখানে শর্বরের সমর্থকরা ইদানীং বেশি ভিড় করছে। এদের চট করে কেউ ঘাটায় না। যারা নিরীহ অর্ধরাক্ষস বা যারা শর্বরের সমর্থক নয়, তারা এদের এড়িয়ে চলে। এই রাক্ষসদের চেনার উপায় হল, এরা কথায় কথায় চোঁচিয়ে ওঠে, ‘শর্বরের জয় হোক’। এরা বেশিরভাগই মাল্যপর্বতের বিমোহক রাক্ষস, নিজস্ব জটায়ুবাহিনীতে চেপে আসে এখানে; তবে অল্প কয়েকজন পত্রতিলক রাক্ষস এবং অর্ধরাক্ষসও আছে এই দলে।”

অভী বলল, “ভালোই হল। আমরাও তাহলে কথায় কথায় ‘শর্বরের জয় হোক’ বলে চোঁচাব। কেউ ধরতে পারবে না।”

চঞ্চল ব্যস্তভাবে বলল, “বাড়াবাড়ি করতে যেয়ো না খবরদার। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। লোকের সন্দেহ হবে। আর তোমাদের কিছু হয়ে গেলে সমরোত্তমরা আমার সর্বনাশ করে দেবেন।”

লীনা বলল, “আরে চঞ্চলদা, ভাবছ কেন? বেঁচে ফিরে আসার ইচ্ছা আমাদেরও পুরোমাত্রায় আছে। কিছু গুণগোল হবে না, তুমি নিশ্চিত থাকো। আমরা যাব, সবার সঙ্গে উর্গায়ুর বক্তব্য শুনব, আর তারপর ফিরে আসব। ব্যস, মিটে গেল।”

চঞ্চল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “সব কিছু যদি এতই সহজ হত! যাকগে, তোমাদের রাতের আহার শেষ হলে আমি আসব। নয়তো পথ চিনে যেতে পারবে না তোমরা। পীতপত্রবনের মধ্যে অনেকটা দূর যেতে হবে। আর হ্যাঁ, ওখানে পৌঁছে আমি আগে ঢুকব, তার কিছুক্ষণ পরে ঢুকবে তোমরা, কারণ তোমরা যে আমার সঙ্গে আছ, এটা কেউ দেখে ফেলুক, আমি চাই না।”

অভী বলল, “কিন্তু তুমি যখন থাকবে না ওখানে, সেই সময়টায় অতিথিদের দেখভাল কে করবে?”

চঞ্চল বলল, “আমার এক বন্ধু অর্ধরাক্ষস আছে – সঞ্জীব। আমি না থাকলে ও-ই সব সামলায়। কিন্তু একটা বিষয়ে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। রাক্ষস এবং অর্ধরাক্ষস – এই দুই জাতিরই কিন্তু ঘ্রাণশক্তি খুব প্রখর। তোমাদের গায়ে মানুষের গন্ধ যদি একবার কেউ পেয়ে যায়, বিপদ হবে।”

লীনা শুকনো মুখে বলল, “তাহলে উপায় কী?”

চঞ্চল নিধির দিকে তাকিয়ে হাসল। “উপায় তুমি জানো, তাই না? অর্ধরাক্ষসের মেয়ে তুমি – গন্ধের ব্যাপারে এই মানুষদের তুলনায় জ্ঞান তোমার আরও বেশি হওয়া উচিত। গন্ধ ঢাকতে হয় কী দিয়ে, জানো তো? গন্ধ দিয়ে।”

চলে গেল চঞ্চল; যাওয়ার আগে বলে গেল, “সময়মতো তৈরি থেকো। আমি রাত ঘনালে আসব অনুশীলন মঞ্চের কাছে।”

অভী বলল, “নিধি, গন্ধের ব্যাপারটা ও কী বলে গেল?”

নিধি বেশ খুশি-খুশি মুখে বলল, “সেটা তোমাদের আদৌ পছন্দ হবে না।”

আজকের মতো সব অনুশীলন বাতিল করেছেন অধিনায়ক বজ্রধর। ছাত্রছাত্রীদের থাকতে বলা হয়েছে তাদের নিজ নিজ বাসভবনে। অতীত কাছে কাল রাতের গল্প শুনে শিহরিত হয়েছেন মিত্রমাসি। বারবার বলছেন, “অভী, তুমি সুস্থ আছো তো?”

ঠোঁটটা ফুলে গেছে অভীর। দু’হাতেও বেশ কিছু কাটাকুটি হয়েছে। কিন্তু কোনোটাই মারাত্মক নয়। ক্ষতস্থানগুলোতে যত্ন করে ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছেন মিত্রমাসি। সে যে চন্দ্রহাসের মতো অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছে, মিত্রমাসির কাছে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় – সে মোটামুটি সুস্থভাবেই ফিরে এসেছে অতগুলো রাক্ষসের আক্রমণ সামলে।

দুপুরটায় বেশ ভালোমতো ঘুমোল অভী। কাল রাতে তো ঘুম হয়নি একফোঁটাও।

বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওদের কাটল পরিকল্পনা তৈরি করে। মিত্রমাসিকে কিছুই জানানো হবে না, বলাই বাহুল্য। নিধি সঙ্গে না থাকায় একদিকে ভালোই হয়েছে। মিত্রমাসি ওদের খোঁজ করলে সে বলবে, ওরা গ্রন্থাগারে গেছে, ফিরতে দেরি হবে বলে গেছে।

রাতের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর ওরা শুরু করল ছদ্মবেশধারণ প্রক্রিয়া। নিধি আক্ষেপের ভঙ্গিতে বলল, “রূপান্তরবিদ্যাটা যদি জানতে, তাহলে এত ঝামেলা পোহাতে হত না। যাক গে, এখন চুপ করে বোসো। আমাকে আমার কাজ করতে দাও।”

দেখা গেল, ছদ্মবেশ রচনায় সে যথেষ্ট পটু। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অভীকে অন্তত বছর পঁচিশের ছিপছিপে তরুণের মতো চেহারা করে দিল সে। নিধিদের ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার ভালো করে দেখে নিল অভী। মুখে সরু গোঁফটা মানিয়েছে মন্দ নয়।

লীনাকেও গোঁফওয়ালা এক অল্পবয়সি ছেলের রূপ দিতে বেশি সময় নিল না নিধি। আয়নায় নিজেকে দেখে সে যেন বিশ্বাস করতেই পারছে না নিজের চোখকে। লীনার সেই চেহারা দেখে অভী আর নিধি খুব খানিক হি হি করে হাসল। তারপর ছদ্মবেশটা আরও নিখুঁত করার জন্য নিধি লীনার গালে একটা বড়ো কালো আঁচিল বসিয়ে দিল।

আয়নার সামনে একহাত শূন্যে তুলে লীনা ভারীক্কিচালে বলে ‘উঠল, “শর্বরের জয় হোক।”

নিধি বলল, “চমৎকার লাগছে। এর পরেও তোমাদের চিনে ফেলবে, এত ক্ষমতা কারও হবে না।”

লীনা বলল, “এবার গন্ধের একটা ব্যবস্থা করো।”

নিধি একটা ছোটো শিশি বার করল তার বাক্স থেকে। “অর্ধরাক্ষস সুগন্ধী। সুদক্ষিণসারির অনেক অর্ধরাক্ষস ব্যবহার করে এটা। একবার গায়ে দিলে অনেকক্ষণ থাকে। তবে গন্ধটা একটু ইয়ে... হি হি হি!”

একবার নাকের কাছে শিশিটা ধরেই অভী ‘ওয়াক’ তুলল। “অ্যাঃ! কী বাজে বোঁটকা গন্ধ!”

নিধি ভেংচি কেটে বলল, “খাক। তোমার বগলের চেয়ে অনেক ভালো গন্ধ! এবার কথা না বাড়িয়ে এটার আট-দশ ফোঁটা গায়ে ঢেলে নাও।”

লীনা বলল, “হ্যাঁ। তাহলেই তোমার গা থেকে বিস্কৃত অর্ধরাক্ষস-বগলের সুগন্ধ ছাড়তে শুরু করবে। নাও নাও, আর দেরি কোরো না।”

সাধারণ দরিদ্র অর্ধরাক্ষসের মতো পোশাক পরে ওরা যখন বেরোল, তখন বাইরের নৈশ পরিবেশ একদম শান্ত হয়ে গেছে। অনুশীলন মঞ্চ অবধি হেঁটে যেতে হবে ওদের। নিধি একবার উঁকি মেরে দেখে নিল, কেউ আসছে কিনা। তারপর ফিশফিশ করে বলল, “পথ পরিষ্কার। বেরিয়ে পড়ো তোমরা।”

জানালা গলে মিত্রভবনের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। নিধি বলল, “লীনা! অভী!”

ওরা তাকাল তার মুখের দিকে। নিধি বেশ আন্তরিকভাবে বলল, “জ্যান্ত ফিরে এসো। কেমন?”

একটু হেসে হাত নেড়ে ওরা চলল অনুশীলন মঞ্চের দিকে। আজও চাঁদ উঠেছে, তার আলোয় পথঘাট দিবি দেখা যাচ্ছে। লীনা বলল, “অভী।”

“বলো।”

“আমাদের চেনা যাচ্ছে না তো?”

“না না। তোমাকে তো একেবারেই যাচ্ছে না।”

“তোমাকেও না।”

চঞ্চল দাঁড়িয়ে ছিল অনুশীলন মঞ্চের কাছে। ওদের দেখে এক মুহূর্ত থমকে গেল সে; তারপর হেসে বলল, “ছদ্মবেশ ভালোই হয়েছে, তবে গন্ধটা একটু বেশিই ঢেলে ফেলেছ। যাক, তাতে অসুবিধা হবে না কিছু। চলো, যাওয়া যাক।”

ওরা চলল পীতপত্রবনের পথে। অভী বুঝতে পারল, আগেরদিন বজ্রধর ওকে বনের যে অংশটায় নিয়ে গিয়েছিলেন, এই রাস্তাটা তার সম্পূর্ণ অন্যদিকে। গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প জ্যোৎস্না এসে পড়ছে বনের মাটিতে। হাঁটতে হাঁটতে অভী ফিশফিশ করে বলল, “আমার কিন্তু একটু একটু ভয় করছে।”

লীনা বলল, “আমারও। তবে আপশোশ নেই একটুও।”

“আমারও।”

ঝরে পড়া হলদে পাতা মাড়িয়ে ওরা চলল। সেই কখন থেকে হাঁটছে তো হাঁটছেই। পথ যেন আর ফুরোতে চায় না। “আর কতদূর, চঞ্চলদা?” জিজ্ঞেস করল অভী।

চঞ্চল উত্তর দিল, “এই তো সবে অর্ধেক রাস্তা এসেছ। এই এতটা পরিমাণ পথই হাঁটতে হবে এখনও। তোমরা সব যোদ্ধা না? এইটুকুতেই দম শেষ হয়ে যাচ্ছে?”

কথাটা গায়ে লাগল ওদের। না, কষ্ট সহ্য করে হলেও যেতে হবে। আয়তনের বদনাম হতে দেওয়া যাবে না।

আরও কিছুটা যাওয়ার পর চঞ্চল বলল, “ওখানে গিয়ে কারও সঙ্গে বেশি কথা বলতে যেয়ো না যেন। আমি তো আগেই ঢুকে যাব ভেতরে। তোমরা আমার দশ মিনিট পরে ঢুকবে। আমি তোমাদের একটা ভালো দেখে জায়গায় বসিয়ে কাচের পাত্রে ফলের রস দিয়ে যাব।”

“ফলের রস?”

“সে তো বটেই। সুদাও পাওয়া যায় ছায়াভবনে, কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই আশা করো না ও জিনিস আমি তোমাদের খেতে দেব?”

অভী আর লীনা একসঙ্গে ভিড় কাটল। “না না, আমরা তো মদ খাই-ই না।”

“তাও ভালো। তারপর শোনা। কেউ যদি গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসে, তার সঙ্গে বেশি কথাবার্তা কোলে না - ধরা পড়ে যাবে যদি বেফাঁস কিছু বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে।”

“না না, আমরা খুব সাবধান থাকব।”

“হ্যাঁ, উর্গায় এলে তার কথা শুনে, আর তারপর চুপচাপ বেরিয়ে চলে আসবে। কোনোরকম কামেলার জড়ানো চলবে না, মনে রেখো।”

বাধ্য শিক্ষার্থীর মতো মাথা নড়ল ওরা। এই শত্রুপুরীতে চঞ্চলই ওদের একমাত্র ভরসা এখন। তার কথা শুনে হেঁচলোই হবে।

বনের মধ্যে গাছের পাতার ওপরদিকে চাঁদের আলো পড়লেও নীচের দিকে ছাতার মতো অন্ধকার জমে আছে। একটি অচেনা রাতচরা পাখি ডাকছে। পায়ের নীচে মড়মড় করছে শুকনো ডাল আর পাতা।

আরও বেশ কিছুটা হাঁটার পর দূর থেকে গাছের সারির ফাঁক দিয়ে ছায়াভবন দেখা গেল। তার জানালাগুলো দিয়ে বেরিয়ে আসা উজ্জ্বল আলো চোখে পড়ছে অনেক দূর থেকেই।

“এসে গেছি আমরা।” চঞ্চল বলে উঠল। “যদি কেউ নাম জানতে চায়, বলবে তোমরা... যা হোক দুটো নাম বলে দियो। আমি যাওয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে এইখানে; তারপর ঢুকবে ভেতরে। আর সম্ভাব্য যতটা পারো, এড়িয়ে চলবে। খুব তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি ওর।”

চঞ্চল ওদের পেছনে রেখে এগিয়ে গেল। ওরা প্রায় দমবন্ধ করে দেখতে লাগল। ছায়াভবনের দরজা ঠেলে ঢুকল চঞ্চল, ভেতরে আলো জ্বলছে দেখা গেল। তারপর আবার সে দরজাটা লাগিয়ে দিল। এবার অপেক্ষা।

সময় যেন কাটছে না। অভী অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে একবার তাকিয়ে দেখে নিল। না, কেউ অন্তত এই পথে আসছে না।

ছায়াভবনের জানালা দিয়ে আসা হলদে আলোর আভা পড়েছে ওদের মুখে। সেই আলোতেই অভী দেখল, লীনার মুখ শুকনো। কপালে তার জমেছে ছোটো ছোটো ফোঁটায় ঘাম। তবু এই অবস্থাতেও তার নাকের নীচে গোঁফ আর গালের নকল কালো আঁচিলটা দেখে অভীর হাসি পেয়ে গেল।

লীনা ভ্রুকুটি করে বলল, “আমাকে দেখে হাসি পাচ্ছে?”

“তা পাচ্ছে একটু একটু।”

“হুম,” বলে গম্ভীর হয়ে গেল সে। অন্য সময় হলে অবশ্য পালটা দু’কথা শোনাত, কিন্তু এখন তার মুখ তর্কিয়ে গেছে উৎকণ্ঠায়।

কয়েকটা কালো কালো মূর্তি এসে ঢুকে পড়ল ছায়াভবনের দরজা খুলে, গাছের আড়াল থেকে দেখল ওরা। লোক জমছে ধীরে ধীরে। অনেকক্ষণ হল চঞ্চল গেছে। এবার ওরাও যেতে পারে।

অভী ফিশফিশ করে বলল, “যাবে তো?”

লীনার কাছেও সম্ভবত এই অপেক্ষা অসহ্য ঠেকছিল। সে বলল, “হ্যাঁ। চলো।”

দু’জনেই একবার দু’জনের মুখের দিকে তর্কিয়ে নিল। তারপর জোর করে একটু হেসে অভী বলল, “চলো।”

ওরা চুপচাপ হেঁটে এসে দাঁড়াল ছায়াভবনের দরজার সামনে। খুব একটা বড়ো বাড়ি নয় ছায়াভবন - একতলা, তবে ছাদটা বেশ উঁচু। কাঠের একটা ভারী দরজা, দরজার গায়ে সিংহের মুখ খোদাই করা আছে। সিংহের দু’পাশে দুটো সোজা করে রাখা তরবারির চিহ্ন। বাড়ির পেছনদিকেও ঘন অরণ্য।

ভেতর থেকে সুস্বাদু খাবারের গন্ধ ভেসে আসছিল। অবশ্য এই মুহূর্তে খিদে-টিদে মোটেই অনুভব করছে না ওরা। দরজা ঠেলে ভেতরে পা বাড়াল অভী।

প্রবেশপথে আলো জ্বলছে বটে, তবে ভেতরে বসার জায়গায় আলোটা বেশি উজ্জ্বল। গদি-আঁটা উঁচু কাঠাসন রাখা আছে সারি দিয়ে; তাদের অনেকগুলোতেই বসে আছে ভয়ানক চেহারার রাক্ষসরা। যেমন বিশাল তাদের শরীর, তেমনই তাদের অস্ত্রশস্ত্র। কারও সঙ্গে বিরাটাকৃতির গদা, আবার কারও সঙ্গে প্রায় অভীর সমান লম্বা তরবারি। বর্শাধারীও বেশ কয়েকজন আছে। পরিচারকেরা খাবার পরিবেশন করছে। রাক্ষসরা গল্প করছে নিজেদের মধ্যে।

অভী আর লীনা বসতে যাচ্ছিল পাশাপাশি দুটো আসনে, এমন সময় একজন এসে বলল, “আসুন, আপনারা এইখানটায় বসুন।”

চঞ্চল! দেয়ালের পাশেই ওদের অন্য একটা জায়গায় বসাতে বসাতে সে খুব চাপা গলায় বলল, “তোমাদের পেছনেই বাইরে যাওয়ার দরজা আছে। বিপদ বুঝলে ওই দরজা খুলে সোজা দৌড় দেবে।”

তারপর স্বাভাবিক স্বরে বলল, “কী নেবেন আপনারা? কমলার রস? এঙ্কুণি দিচ্ছি।”

দ্রুত পায়ে চলে গেল সে ওখান থেকে। অভী একবার মাথা ঘুরিয়ে দরজাটা দেখে নিল। বলা যায় না, সতর্ক থাকা ভাল।

লীনা ইতিমধ্যে ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখছিল। বিরাট বড়ো ঘর - ওরা যেখানটায় বসেছে, তার থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা উঁচু মঞ্চ করা আছে। লীনা বলল, “ওই জায়গাটা থেকে মনে হয় বজ্রতা করা হয়। ...রাক্ষসগুলোকে দেখে বেশ উগ্রপ্রকৃতির মনে হচ্ছে, না?”

অভী বলল, “সেটাই স্বাভাবিক নয় কি? যারা এখানে আসে, তাদের বেশিরভাগই মারামারি-কাটাকাটির কথা বলতে আসে। উগ্রস্বভাব তো তারা

হবেই। কত অস্ত্র এদের সঙ্গে, দেখতে পাচ্ছ তো। আচ্ছা, নিধির বাবা নেই তো আজ?”

লীনা বলল, “না, উনি রোজ আসেন না। খেয়ালি লোক; যেদিন মন চায়, চলে আসেন।”

চঞ্চল দুটো বড়ো পাত্রে কমলার রস এনে রাখল ওদের সামনে। অভী চাপাগলায় বলল, “উর্ণাযু এসেছে?”

চঞ্চল বলল, “জানি না। দেখতে তো পাচ্ছি না। ওই দেখে রাখো সঞ্জীবকে - ওই যে মোটামতো দাড়িওয়ালা রাক্ষসের সঙ্গে কথা বলছে। ও-ই আমার বন্ধু; সহকারীও বটে।”

সঞ্জীবকে দেখে নিল ওরা - রোগা, মাঝারি উচ্চতার একজন অর্ধরাক্ষস; মুখে ধূর্তামির ছাপ।

চঞ্চল চলে গেল। ওরা কমলার রসে চুমুক দিল।

লীনা বলল, “ভালো বানিয়েছে কিন্তু। শুধু কমলা নয়, আরও দু’তিনটে ফল মিশিয়েছে এতে।”

অভী চোখের কোণ দিয়ে ইতিমধ্যেই নড়াচড়াটা লক্ষ করেছিল। গলার মধ্যে অল্প কাশির শব্দ করে সে লীনাকে সাবধান করে দিল। কে যেন একটা আসছে ওদের কাছে।

একটা রাক্ষস! কোমরে তার ঝুলছে বিরাট তরবারি। অভীর মুখে একমুহূর্তের মধ্যে এত সুন্দর কমলার রসটা যেন তেতো হয়ে গেল।

টলে পড়তে গিয়েও সামলে নিল রাক্ষসটা। বোঝাই যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই প্রচুর মদ্যপান করে ফেলেছে সে। তাও অভীদের সামনে এসে সে বলে উঠল, “আমরা কিন্তু ওদের ছ-ছাড়ব না।”

অভী বলতে যাচ্ছিল “কাদের?” কিন্তু তার হাঁটুতে এক চিমটি কেটে তাকে চুপ করিয়ে দিয়ে লীনা বলল, “একদম ঠিক বলেছেন। ওদের আমরা ছাড়ব না মোটেই।”

অভী ভয় পাচ্ছিল অন্য রাক্ষসরা না আবার এই তামাশা দেখতে এদিকে চলে আসে। কিন্তু আপাতত সেই ভয় নেই মনে হচ্ছে - রাক্ষসগুলো নিজেদের মধ্যে জোর গলায় গল্প করছে।

যে রাক্ষসটা ওদের কাছে এসেছিল, সে আবার গর্জন করল, “ওদের খ-খতম করে ফ-ফেলব আমরা।”

এবার অভীও বুঝে গেছে কী বলতে হবে। সে বলল, “তা আর বলতে! ওদের সবকটাকে শেষ করে দেব।”

রাক্ষসটা ঝুঁকে পড়ল ওদের মুখের সামনে; চোখ কুঁচকে বলল, “ক্-কে বলো তো ত-তোমরা? আগে তো দ্-দেখিনি মনে হচ্ছে?”

অভীর বুক ধুকপুক করতে শুরু করল। চঞ্চল বলেছিল দুটো নাম ভেবে রাখতে। ভাবা তো হয়নি! মাথাতেও আসছে না কিছু।

লীনার মুখ শুকিয়ে গেছে। মাতাল রাক্ষসটা ভ্রুকুটি করে দেখছে ওদের। এফুনি বিশ্বাসযোগ্য কিছু একটা বলতে না পারলে...!”

হাত শূন্যে তুলে জোর গলায় অভী বলে উঠল, “শর্বরের জয় হোক।”

খুশিতে ভরে উঠল রাক্ষসটার মুখ; ক্রকুটি মিলিয়ে গেল। হাত ছুড়ে সেও চোঁচিয়ে উঠল, “শর্বরের জয় হোক।”

আর যাবে কোথায়, গোটা ছায়াভবনে যত রাক্ষস আর অর্ধরাক্ষস ছিল, প্রায় সবাই একসঙ্গে শূন্যে হাত ছুড়ে চোঁচিয়ে বলতে লাগল, “শর্বরের জয় হোক! শর্বরের জয় হোক!” এই রাক্ষসটা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে সঙ্গীভ আর চঞ্চলের কাছে গিয়ে আরেকপাত্র সুরা আনতে আদেশ দিল।

অভী ফিশফিশ করে বলল, “জোর বাঁচা বেঁচে গেছি। আর একটু হলেই...!”

লীনা মাথা নাড়ল। সেও ভয় পেয়ে গিয়েছিল খুব।

তারপর হঠাৎ করেই সব শান্ত হয়ে গেল। সবাই চুপ করে গেল। এত বড়ো কক্ষের মধ্যে নেমে এল নিশ্চিন্ত নীরবতা। অভী অদাক হয়ে চঞ্চলের দিকে তাকাতেই দেখল সে ইশারা করছে একটু দূরের ঈষৎ উন্নত মঞ্চের দিকে। একজন উঠে এসেছে মঞ্চের ওপর।

ওরা যজ্ঞচালিতের মতো মাথা ঘোরাল সেইদিকে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে...
উর্গায়ু।

একবার দেখলেই বলে দেওয়া যায়, এ এক মহাপরাক্রান্ত ব্যক্তি। তার সারা দেহ থেকে যেন ফেটে পড়ছে আলোর অস্তিত্ব। দীর্ঘ, স্বচ্ছ দেহ। কোমর থেকে ঝুলছে কোষবদ্ধ তরবারি। কবজি পর্যন্ত ঢাকা কালো পোশাক। হাতের নখগুলো বড়োবড়ো, ঈষৎ বাঁকানো। চোখের দৃষ্টি সূত্রীকৃত, মুখে কর্তৃত্বের ছাপ আছে প্রবল। কথা বলার ভঙ্গিতে মানুষকে আকর্ষণ করে নিতে পারে সে। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বময় লোকটার উপস্থিতিতেই যেন সবাই সম্মোহিত হয়ে গেছে।

গম্ভীর মেঘধ্বনির মতো কণ্ঠে সে বলল, “শর্বরের জয় হোক।”

এইবার যেন আবার একসঙ্গে গলার স্বর ফিরে পেল সবাই। “শর্বরের জয় হোক” ধ্বনিতে কেঁপে উঠল ছায়াভবন।

হাত তুলল উর্গায়ু; আবার মুহূর্তমধ্যে শান্ত হয়ে গেল কক্ষ।

“আমাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু কে, জানেন আপনারা?” প্রশ্ন করল শর্বর।
রাক্ষসরা বলতে লাগল এক-একটা নাম।

“বজ্রধর!”

“বিনীতেশ!”

“ঐশিকরা!”

“সমরোত্তমরা সবাই!”

উর্গায়ু মাথা নাড়ল। “না। আমাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু আমরা নিজেই।”

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কথাটার প্রতিক্রিয়া দেখার চেষ্টা করল সে।
সবার মুখে; তারপর বলল, “আমরাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু, কারণ আমাদের মধ্যে একতা নেই। আমরা যুদ্ধ করি, কিন্তু সে যুদ্ধ আমাদের নিজেদের মধ্যে। পত্রতিলকরা লড়ছে বিমোহকদের সঙ্গে। এরা আবার সবাই লড়ছে অর্ধরাক্ষসদের সঙ্গে। আমরাই তো নিজেদের ভাগ করে রেখেছি অসংখ্য টুকরোয়। এ বলে ‘আমি উঁচু জাত’ তো ও বলে ‘আমার ভারী বুদ্ধি’। আর এই

বিবাদের ফসল ঘরে তুলছে কে? সমরগরিমা আয়তন। আমাদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা পর্বতকে ওরা নিয়ে গেছে নিজেদের দলে। আমাদের মধ্যে অনেকে তাকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলেন, কিন্তু আমি তা মনে করি না। তার বিপদের সময় পর্বত তার রাক্ষসভাইদের কাছে যে সহানুভূতি, যে সাহায্যের আশা করেছিল, তার কণামাত্রও পায়নি। সেই সুযোগে বজ্রধর তাকে কাছে টেনেছেন। রাক্ষসরা বুঝতেও পারেনি, তারা তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে কীভাবে হারাল।”

কেউ কোনো কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাল না। উর্গাযু বলতে থাকল।

“তারপর ধরুন রক্ষোবৈদ্যের কথা। বুদ্ধিমান বজ্রধর আবার বুদ্ধির খেলায় হারিয়েছেন আমাদের। প্রাচীনপন্থী রাক্ষসরা অতবড়ো প্রতিভাকে স্রেফ বুঝতে না পেরে তাকে যেতে দিয়েছেন শত্রুর ঘরে। অথচ উনি থাকলে আমাদের যে শুধু বিরাট সুবিধা হত, তা নয়, শত্রুও ওঁর ওইসব অব্যর্থ ঔষধ কাজে লাগানোর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হত।

“বজ্রধর যে কতখানি ধূর্ত, সে ওঁর অর্ধরাক্ষসদের প্রতি ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায়। অর্ধরাক্ষসরা তো আমাদের রাক্ষসজাতিরই অংশ - আমাদের ভাই, আমাদের বোন। অথচ দেখুন, সমরোত্তমরা ওঁদেরই প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করেছে যাতে একদিন ওরা নিজেদের আত্মীয়দের বিরুদ্ধেই অস্ত্র তুলে নিতে পারে। সমরোত্তমদের আমি দোষ দিই না - তারা শত্রু, তারা তো আমাদের ক্ষতি করতে চাইবেই। এ দোষ আমাদের - আমাদের সকলের। আমরা যারা নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে ছোটো করে নিজেকে বড়ো করার খেলায় মেতে আছি, দোষ সেই আমাদের - আর কারও নয়।”

মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শুনছে রাক্ষস, অর্ধরাক্ষস সবাই। অতী একবার অস্বস্তিভরে লীনার দিকে তাকিয়ে নিল।

উর্গাযু আবার শুরু করল, “আমার অর্ধরাক্ষস ভাইরা, কার শাসনে দিনাতিপাত করছেন আপনারা? সমরগরিমার নিয়ামক বিনীতেশ মানুষদের মধ্যেও অতি নিকৃষ্ট জীব। সমরোত্তমরা যখন ওঁইরকম একজন মানুষকে সুরক্ষা দেন, তখন তাঁদের উদ্দেশ্যকেও খুব মহৎ বলা যায় না। এঁদের শাসনে থেকে কী পেয়েছেন আপনারা? শ্রদ্ধা পেয়েছেন? ভালোবাসা পেয়েছেন? ওসব ছাড়ুন, ভদ্র ব্যবহার পেয়েছেন? পাননি তো? আমি জানি আপনারা কী পেয়েছেন! পেয়েছেন অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা আর অনর্থক অপমান। সমরগরিমায় একজন মানুষ খুন হল - তার দায় সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অর্ধরাক্ষসের ঘাড়ে এসে পড়ল কেন? শুধু সে অর্ধরাক্ষস, এই অপরাধে? মারতে মারতে তাকে আধমরা করে ফেলা হল, আপনাদের প্রিয় সমরোত্তমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখলেন। একটা অর্ধরাক্ষস মরলে ওঁদের কীই বা আসে যায়?

“প্রতি পদক্ষেপে অর্ধরাক্ষসদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তাঁরা সমরগরিমায় অবাঞ্ছিত; মানুষরা তাঁদের ঘৃণা করে; নিয়ামক বিনীতেশ প্রকাশ্যে তাঁর অপছন্দ জানান অর্ধরাক্ষসদের বিষয়ে। আর কত দিন সহ্য করবেন আপনারা? সমরগরিমার পাপের পাত্র পূর্ণ হয়েছে। এবার তার পতনের পালা।”

লীনা আলতো করে কনুই দিয়ে খোঁচা মারল অতীকে। অতী দেখল, লীনার মুঠোর মধ্যে একটা স্বপ্ন-উপল। ফিশফিশ করে লীনা বলল, “পুরো বক্তৃতাটা ধরে রাখছি এখানে। ফিরে গিয়ে সমরোত্তমদের হাতে তুলে দেব।”

অতী চমৎকৃত হল তার বুদ্ধি দেখে। ওদিকে উর্গায়ু আবার শুরু করেছে।

“সমরগরিমা অর্ধরাক্ষসদের স্বাধীন সত্তাকে অসম্মান করেছে। আমাদের অপমানিত করেছে তারা প্রত্যেক দিন। তারা কি আশা করে যে আমাদের তারা জুতোর ময়লার মতো মনে করবে, আর তার বদলে আমরা আমাদের স্বাধীনতা বিসর্জন দেব তাদের কাছে? বেঁচে থাকাটা অন্য সব প্রাণীর মতো আমাদেরও অধিকার। সেই সম্মানিত অধিকারের মর্যাদা যে দিতে পারে আমাদের, সেই ব্যক্তির নাম শর্বর।”

হাততালিতে ভরে উঠল পুরো কক্ষ। রব উঠল সমবেতকণ্ঠে, “শর্বরের জয় হোক।”

উর্গায়ু বলল, “বাঁচতে গেলে স্বপ্ন দেখা শিখতে হয়, ভাইরা। সমরগরিমা অর্ধরাক্ষসদের সেই স্বপ্ন দেখার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। সুস্থভাবে, সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে জীবনযাপন করেছে, এমন অর্ধরাক্ষস সমরগরিমায় ক’জন আছে? ওরা কোনোদিন আমাদের দেবে না আমাদের প্রাপ্য অধিকার। আমাদের শ্রমের ওপর, আমাদের রক্ত-ঘামের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে ওরা। আমাদের জীবনের বিনিময়ে চলে ওই নিয়ামক আর সমরোত্তমদের ভোগবিলাস। সমরগরিমায় শিক্ষার্থীদের প্রতিপালন করেন যেসব ভবন-অধ্যক্ষ, তাঁদের বাসগৃহে শুধু একবেলায় যা রান্না হয়, ততখানি খন্দা সুদক্ষিণসারির একটা অর্ধরাক্ষস পরিবারে সারা সপ্তাহেও হয় না।”

“ঠিক! ঠিক!” উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল রাক্ষসদের মধ্য থেকে।

উর্গায়ু হাসল। সে যেন বুঝতে পেরেছে এই জনসমষ্টি এখন তার নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। সে বলল, “আমি আপনাদের সামনে দুটো সময়ের গল্প বলছি আজ। এতক্ষণ বললাম বর্তমানের কথা – এ আপনাদের এখনকার বাস্তব জীবনের কথা। এবার আমি বলব একটা স্বপ্নের কথা, একটা ভবিষ্যতের কথা – যে ভবিষ্যৎ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করেছে, যে স্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠার জন্য আপনার কেবল একটু সাহস লাগবে। এ স্বপ্ন আমার অনেকদিনের। বলব আপনাদের সেই স্বপ্নের কথা? শুনবেন আপনারা?”

সমবেত কণ্ঠে গর্জন উঠল, “শুনব! শুনব! বলুন আপনি!”

উর্গায়ু মুখ তুলে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলতে লাগল, “আমার স্বপ্ন, রাক্ষসদের মধ্যে আর কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। সাহসী যোদ্ধা বিমোহক আর কলাকুশল পত্রতিলকরা কেউ কাউকে ছোটো ভাববে না। মাল্যপর্বতের রাক্ষস আর সুদক্ষিণসারির রাক্ষসের মধ্যে পার্থক্যটা যে শুধু ভৌগোলিক, এই সত্যটা আমরা স্বীকার করে নেব। ধনী, দরিদ্র, পূর্ণ, অর্ধ – এসব ভেদ আমাদের শত্রুর সুবিধা করে দেয়, আমাদের নয়। আমরা যদি একজোট হয়ে যুদ্ধে নামি, মায়াযুদ্ধ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ওই মানুষগুলোর ক্ষমতা কী আমাদের আটকায়? আমার স্বপ্ন, আমাদের রাক্ষসজাতির জন্য নতুন সকাল হবে। সেই

সকালে ধ্বংস হয়ে যাবে সুবিধাবাদী, অত্যাচারী মানুষের তুচ্ছ জনসমষ্টি। তাদের রক্তে অভিষেক হবে আমাদের বিপ্লবের রাজপুত্র শর্বরের।”

প্রবল হর্ষধ্বনি শোনা গেল রাক্ষসদের মধ্যে। উর্গায়ু বলল, “সেই শর্বর, যিনি গতবার আমাদের মুক্তি দিতে গিয়ে নিজে বরণ করে নিয়েছেন যজ্ঞগাময় বন্দিদশা। এমনই তাঁর প্রভাব, তাঁকে বন্দি করে রেখেছে ওরা দৈব-অস্ত্রের বন্ধনে। কারণ কী তাঁর এই বন্ধনের? একটাই কারণ – তিনি ওই স্বার্থপর মানুষগুলোর মুখের ওপর বলতে পেরেছিলেন, ‘তোমরা যা করছ, ঠিক করছ না।’ তিনি সাহস করে বলতে পেরেছিলেন, ‘রাক্ষসদের স্বাধীনতা, রাক্ষসদের আত্মসম্মান হরণ করার অধিকার মানুষদের কেউ দেয়নি।’ সেই মহান বিপ্লবী শর্বরকে অনুসরণ করি আমি।”

আবার তুমুল হাততালি। সে হাততালি থামলে উর্গায়ু বলল, “নেতা হওয়ার বাসনা আমার বিন্দুমাত্র নেই। আমাদের একমাত্র নেতা শর্বর। তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতিতে আমার রাক্ষস ও অর্ধরাক্ষস ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই মানুষদের অসভ্য ‘সভ্যতা’কে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়াই আমার একমাত্র লক্ষ্য। শর্বরের জয় হোক।”

“শর্বরের জয় হোক!” আবার সমবেত জয়ধ্বনি দিল সবাই।

রাক্ষসদের মধ্যে একজন বলে উঠল, “উর্গায়ু, এবার আমাদের রাক্ষসভাষায় কিছু বলুন। মানুষদের এই দুর্বল ভাষা আর শুনতে ইচ্ছা করে না।”

উর্গায়ু সেই প্রৌঢ় রাক্ষসের দিকে তাকিয়ে বলল, “কর্কটক, আপনি জ্ঞানী ও প্রবীণ রাক্ষস। রাক্ষসদের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং ভাষায় আপনার অসীম দক্ষতা। কিন্তু এখানে নবীন প্রজন্মের অনেক রাক্ষস আছেন, যারা ওই প্রাচীন ভাষায় স্বচ্ছন্দ নন। অর্ধরাক্ষসেরাও প্রায় কেউই জানেন না ও ভাষা।”

কর্কটক মুখবিকৃতি করে বললেন, “মূর্খ অর্ধরাক্ষসরা এসব জ্ঞানচর্চা করেছে নাকি কোনোদিন যে জানবে?”

তীব্র অসন্তোষের একটা গুঞ্জন উঠল কক্ষে। স্পষ্ট বোঝা গেল, এহেন অপমানজনক উক্তি অর্ধরাক্ষসরা ভালোভাবে নেয়নি।

উর্গায়ু উচ্চকণ্ঠে বলল, “এর কথাই আমি বলছিলাম। আমাদের রাক্ষসদের মধ্যেও এই ‘আমি ভালো, তুমি খারাপ’ ধারণাটা এত গভীরে শিকড় গেড়েছে, যার জন্য আমরা ভেবে উঠতেই পারছি না যে ‘পূর্ণ’ হোক, ‘অর্ধ’ হোক, আমাদের একটাই পরিচয় – আমরা রাক্ষস। আমাদের শত্রু নিজেদের মধ্যে নেই, আছে বাইরে – তার নাম ‘মানুষ’। নিজেদেরকে আমরা যতক্ষণ না ‘এক’ ভাবতে শিখব, ততদিন ওই নিয়ামক বিনীতেশের মতো অপদার্থ মানুষেরা রাক্ষসদের পায়ের তলায় পিষে মারবে।”

জনমত বিরুদ্ধে যাচ্ছে দেখে কর্কটক মাথা নীচু করে রইলেন। উর্গায়ু বলল, “আমাদের সম্মানিত প্রবীণ রাক্ষস কর্কটক আমাকে প্রাচীন রাক্ষস ভাষায় কিছু বলতে বলেছেন। আমি অস্বীকার করলে উনি ভাবতে পারেন, আমি হয়তো সে ভাষা ভুলেই গেছি।”

রাক্ষসরা হেসে উঠল। উর্ণায়ু বলল, “তাই আমি অল্প কয়েকটি কথা রাক্ষস ভাষায় বলছি আপনাদের সামনে। যদি কারও বুঝতে অসুবিধা হয়, আমার কথা শেষ হলে আমাকে জানাবেন। আমি আবার কথ্যভাষায় আমার বক্তব্য বলে দেব। আপাতত রাক্ষস ভাষায় আমি সমরগরিমা আয়তন দখল করার সম্ভাব্য পরিকল্পনা অতি সংক্ষেপে বলছি।”

অভী আর লীনা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। উর্ণায়ু এমন একটা ভাষায় কথা বলতে শুরু করল, যার বিন্দুবিসর্গও ওরা বুঝতে পারল না। অভী ফিশফিশ করে বলল, “বলতে থাকুক। স্বপ্ন-উপলে সমরোত্তমরা যখন শুনবেন, তখন ঠিক বুঝতে পারবেন।”

লীনা কোনো উত্তর দিল না দেখে তার দিকে তাকাল অভী। লীনার মুখ আবার শুকিয়ে গেছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করতেই ব্যাপারটা চোখে পড়ল তার।

চঞ্চলের অর্ধরাক্ষস বন্ধু সঞ্জীব দাঁড়িয়ে আছে কাছেই। শূন্যে নাক তুলে কী যেন শুঁকছে সে।

অভীর ভয় করতে শুরু করল। কী শুঁকছে সঞ্জীব ওদের এত কাছে দাঁড়িয়ে? গন্ধ পেয়ে গেল নাকি?

চঞ্চল খেয়াল করেছিল ব্যাপারটা। ওদের দিকে সতর্ক নজর রেখেছিল সে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সে বলল, “কী ব্যাপার, সঞ্জীব?”

সঞ্জীব বলল, “চঞ্চল, আমি এই জায়গাটা থেকে মনে হচ্ছে মানুষের গন্ধ পাচ্ছি।”

ঠিক! ও তাদের গন্ধ পেয়ে গেছে! অভী আর লীনা একসঙ্গে তাকাল পেছনের দরজাটার দিকে।

ওদিকে সেই অজানা ভাষায় কীসব বলে চলেছে উর্ণায়ু। এক-আধবার ‘সমরগরিমা’, ‘বিনীতেশ’, ‘বজ্রধর’ জাতীয় নামগুলো কানে আসছে। কিন্তু এই মুহূর্তে অন্য বিপদ নিঃশ্বাস ফেলছে ঘাড়ের ওপর। নিধির দেওয়া ‘অর্ধরাক্ষস-সুগন্ধী’র গন্ধ কি তাহলে হালকা হয়ে এসেছে?

চঞ্চল হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল কথাটা। “আরে দূর! এখানে মানুষের গন্ধ আসবে কোথা থেকে?”

সঞ্জীব বলল, “তাও সাধারণ মানুষ নয়, একেবারে যোদ্ধার গন্ধ। আমি তোমাকে বলছি চঞ্চল, এখানে সম্ভবত সমরগরিমার ছদ্মবেশী গুপ্তচর আছে। তুমি তো জানোই, নাকটা আমার বরাবর একটু বেশিই গন্ধ চেনে।”

তাকে এড়িয়ে চঞ্চল ওদের চোখের ইশারা করল, “এবার কেটে পড়ো তোমরা।” মুখে বলল, “অনেক অর্ধরাক্ষসই মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করে – যোদ্ধাদের সঙ্গেও। তাদের কারও গা থেকেই হয়তো এ গন্ধ পাচ্ছ তুমি।”

সঞ্জীব সরু চোখে তাকাল। “তাও যদি আমি এইখানে যে ক’জন বসে আছে, তাদের কাছে গিয়ে একটু গন্ধ শুঁকে দেখি, তাতে তোমার আপত্তি কেন, আমি বুঝতে পারছি না।”

অভী প্রমাদ শুনল। সঞ্জীব যদি একবার ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে ওরা। নিধির দেওয়া বিচ্ছিরি গন্ধটা আরও কিছুটা মেখে

এলে ভালো হত!

চঞ্চল ওদের চোখের ইশারা করছে। ওদের কয়েকটা আসন আগে যে দাড়িওয়ালা রাক্ষস বসে আছে, তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সঞ্জীব - নাক টেনে গন্ধ শুকছে।

তারপর সে নিশ্চিত হল, এই ব্যক্তি রাক্ষস বটে। চলে এল সে পরের জনের পাশে।

চঞ্চল থালায় করে সুরাপাত্র বসিয়ে নিয়ে যেতে যেতে এসে দাঁড়াল ওদের পাশে; নীচুগলায় বলল, “আমি ওর মনোযোগ অন্যদিকে সরাচ্ছি। তোমরা পালাও।”

ঠিক সেই মুহূর্তে অভী আর লীনা দু'জনেই শুনতে পেল সেই অজানা ভাষায় কথা বলতে বলতে একটা নাম উচ্চারণ করল উর্গায়।

“অভী!”

অবাক হয়ে ওরা সেদিকে তাকাতে যাবে, এমন সময় একটা অদ্ভুত কাজ করে বসল চঞ্চল। অতগুলো সুরাপাত্র নিয়ে সে হোঁচট খেয়ে উলটে পড়ল সঞ্জীব যার পাশে দাঁড়িয়েছিল, সেই বয়স্ক রাক্ষসের গায়ে। কাচভাঙার ঝনঝন শব্দ - প্রচুর সুরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল দেয়ালে, রাক্ষসদের গায়ে। একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল।

এই সুযোগ হারালে চলবে না। ওরা উঠে পড়ল আসন ছেড়ে, এগিয়ে চলল দরজার দিকে।

ধীরেসুস্থে যেতে হবে। ছুটলে সবার সন্দেহ হবে। ওদিকে চঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে সঞ্জীবের রাস্তা আটকে, ক্ষমা চাইছে সেই বয়স্ক রাক্ষসের কাছে।

ধীরে ধীরে, যতটা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব, দরজাটা খুলল অভী। বাইরে ঘন জঙ্গল। লীনা এসে দাঁড়াল তার পাশে।

হঠাৎ পেছন থেকে সঞ্জীব চোঁচিয়ে উঠল, “আরে, ওরা কারা? ওরা বাইরে যাচ্ছে কেন?”

অভী চাপা গলায় বলল, “দাঁড়াবে না একদম, লীনা। বেরিয়ে চলো।”

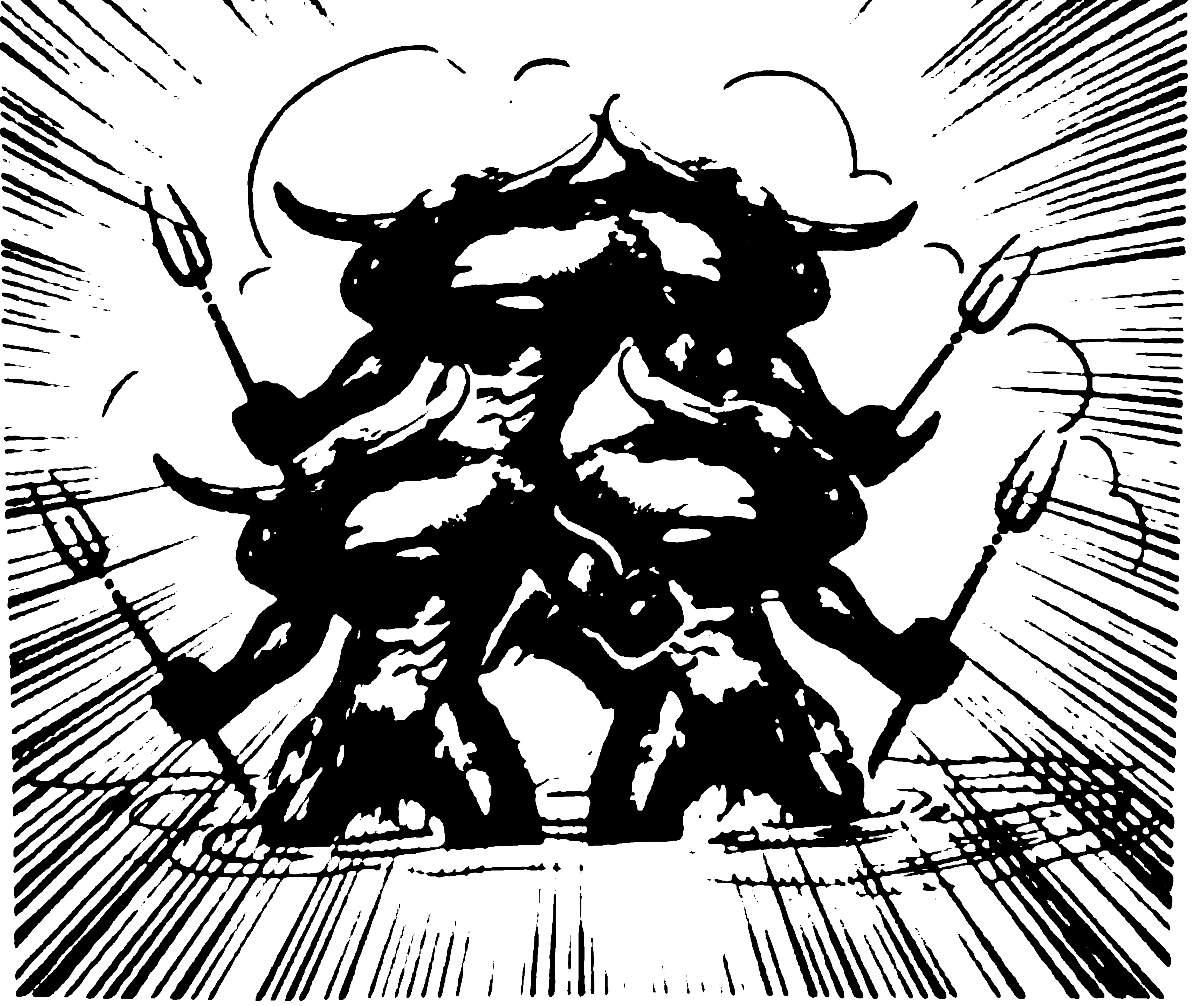
সঞ্জীব চ্যাঁচাচ্ছে, “দাঁড়াও, দাঁড়াও!” তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরও কয়েকজন রাক্ষস। “ওরা নিশ্চয়ই গুপ্তচর! ধরে আনো ওদের!” চোঁচিয়ে উঠল কেউ একজন।

অভী আর লীনা ততক্ষণে বাইরে এসে পড়েছে। উজ্জ্বল আলো থেকে অন্ধকারে এসে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

পেছনে পায়ের ধূপধাপ শব্দ। কারা যেন ছুটে আসছে। ওদের ধরতেই আসছে নিশ্চয়ই। শোনা যাচ্ছে উত্তেজিত চ্যাঁচামেচি।

লীনা বলল, “অভী, পালাও!”

সামনে বিরাট, অন্ধকার বন। সেই বনের মধ্যে অন্ধের মতো ছুটতে লাগল ওরা।



।। ত্রয়োদশ অধ্যায় ।।

নীরসেনা

পেছন থেকে ছুটে আসছে অনেকগুলো রাক্ষস। অতী ডাকল, “শীনা! এইদিকে!”

আয়তন এখান থেকে বহুদূরে। পথ চিনে ফিরে যাওয়া বেশ কঠিন। যদি একবার ধরা পড়ে ওদের হাতে, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।

শীতপত্রবন বেশ গভীর জঙ্গল। এখানে একবার লুকিয়ে পড়তে পারলে চট করে কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিন্তু ওদের একটাই সমস্যা এখন – গন্ধ। রাক্ষসদের তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির কাছে নিজেদের লুকিয়ে রাখাটা সবার আগে দরকার।

শীনাও বুঝেছে সেটা। ওরা এসে লুকিয়েছে ছায়াভবন থেকে বেশ কিছুটা দূরে। একটা মোটা গাছ চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে ভূতের মতো। তার প্রশস্ত কাণ্ডের গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে সতর্ক হয়ে বসে ছিল ওরা।

মাটি থেকে কিছুটা মিহি ধুলো তুলে নিয়ে বুরবুর করে সেগুলো ফেলে দিল শীনা। পড়ন্ত ধুলোর বাঁক দেখে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে বলল, “শাক বাবা! আপাতত নিশ্চিন্ত। হাওয়া বইছে ওদিক থেকে এদিকে। সহজে ওরা আমাদের গন্ধ পাবে না।”

ওদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে পাওয়া যাচ্ছে গলার আওয়াজ। “কোন দিকে গেল?”

“গন্ধ পাচ্ছিস?”

“অস্ত্র তৈরি রাখ। ও দুটোকে ফিরে যেতে দেওয়া চলবে না।”

টোক গিলতে গিয়ে অভী দেখল, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। লীনার অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। ওদের চারপাশে ঘিরে আছে অসংখ্য সরু-মোটা গাছ। সেগুলোর মাথায় চাঁদের আলো পড়ছে বটে, তবে বনের এই অঞ্চলে গাছগুলো একটু বেশিই ঘন হওয়ায় আলো খুব বেশি পৌঁছোচ্ছে না বনের মাটি পর্যন্ত।

জোনাকি জ্বলছে শত শত রূপসিমতো গাছের মাথাগুলোতে। অনেক দূর থেকে শোনা যাচ্ছে কী একটা নিশাচর জন্তুর ডাক। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসতে গিয়ে অভী বুঝল, গাছের ছালে শ্যাওলা জমে আছে – তার ঠান্ডা স্পর্শ লাগল তার চামড়ায়। লীনা ফিশফিশ করে বলল, “উঃ! কী মশা!”

অভী বলল, “চাঁটি দিয়ে মারতে যেয়ো না যেন!”

লীনা বলল, “তোমার মতো উর্বর মস্তিষ্ক সবার আছে, এরকম ভুলেও ভেবো না।”

রাক্ষসদের গলার স্বর দূরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু এখনও শ্রুতিসীমার মধ্যেই আছে। অর্থাৎ বিপদ এখনও কার্টেনি।

অভী জানে, আয়তনের সীমানার মধ্যে ঢুকতে না পারা পর্যন্ত বিপদ কেটেছে বলা যাবে না। ফিশফিশিয়ে লীনাকে বলল সে, “এখানেই থাকবে, না এগোবে?”

লীনা বলল, “ওরা ওইদিকে গেছে। আমরা উলটোদিকে যাই চলো। এখানে বসে থেকে লাভ নেই।”

অন্ধকার বনপথে চলতে গিয়ে ওরা একটা সমস্যায় পড়ে গেল। পীতপত্রবনের মাটি ভরে আছে মরা ডাল আর ঝরে পড়া শুকনো পাতায়। তার ওপর পা পড়লেই মচমচ শব্দ হচ্ছে। এই রাত্রির নিঃশব্দ অরণ্যে সে শব্দ আরও জোরালো মনে হচ্ছে। ওই ডাল-পাতা ইত্যাদি এড়িয়ে হাঁটা মোটেই সম্ভব নয়।

অভী বলল, “এক কাজ করো। খুব সাবধানে পা ঘষে ঘষে চলো। তাতে অন্তত হঠাৎ করে মরা পাতায় পা দেওয়ার সম্ভাবনাটা কম হবে।”

সেইভাবেই চলল ওরা। লীনা বলল, “এই বনে কিন্তু অনেক হিংস্র জন্তু আছে।”

অভী গলার মধ্যে একটা ‘হুম’ শব্দ করল। কিছু হিংস্র জন্তুকে তো সে কাল রাতেই দেখেছে বজ্রধরের সঙ্গে এসে।

যতটা নিঃশব্দে সম্ভব, হেঁটে চলল ওরা। কোনদিকে যাচ্ছে, তার কোনো হদিস নেই। কেবল অজস্র থামের মতো মোটা গাছের ফাঁক দিয়ে ওরা এগিয়ে চলেছে সামনে। ছায়াভবন থেকে যতটা দূরে যাওয়া যায়, ততটাই মঙ্গল।

অন্ধকারের মধ্যে তীব্রস্বরে ঝাঁঝি ডাকছে। অনেকক্ষণ হাঁটিছে ওরা। মাথার ওপরে ডালপালার চাঁদোয়া একটু পাতলা হয়ে এসেছে বলে ছায়ামেশা জ্যোৎস্না এসে পড়ছে ওদের পায়ের কাছে। রাক্ষসগুলো মনে হচ্ছে তো কাছে পিঠে নেই কোথাও।

ভাগ্যটাই খারাপ। একটা মরা ডালে আনমনে পা দিয়ে ফেলল সে, আর সঙ্গে সঙ্গে 'কট' করে আওয়াজ হল একটা। প্রায় নিঃশব্দ জঙ্গলের মধ্যে ভীষণ তীব্র শোনাশ শব্দটা।

“কে? কে ওখানে?” কর্কশকণ্ঠে ছুটে এল প্রশ্নটা।

লীনা সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে টানল অতীত। এখানটায় আলো বেশি। সামান্য নড়াচড়াও চোখে পড়ে যাবে শত্রুর। একটা গাছের আড়ালে কোনোমতে নিজেদের লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করল ওরা।

কণ্ঠস্বরটা আবার বলল, “কে ওখানে?”

অতীত আর লীনা নিঃসাড়ে বসে রইল। বৃকের মধ্যে হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে। কপাল থেকে গলা বেয়ে সুড়সুড় করে নেমে আসছে সরু ঘামের ধারা। হাপরের মতো ওঠানামা করছে বুক। পাতার ওপর মড়মড় শব্দে বোঝা যাচ্ছে, লোকটা এগিয়ে আসছে।

“ওহে! একবার এসো তো এদিকে। কীসের যেন শব্দ পেলাম একটা।”

আরও তিনজোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে। এইদিকেই আসছে ওরা। অতীত উঁকি মেলে দেখল, রাক্ষসগুলোর প্রত্যেকের হাতেই চকচক করছে উন্মুক্ত অসি। ওদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে।

এখানে থাকলে ধরা পড়ে যেতে হবে। আর দেরি নয়। অতীত দম টেনে বলল, “লীনা! পালাও!”

প্রাণপণে ছুটল ওরা। রাক্ষসগুলো একেবারে কাছে এসে পড়েছিল। প্রথমটা তারা একটু হতচকিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তারপরেই তারাও দ্রুতগতিতে ধাওয়া করল ওদের পেছনে।

“পালাচ্ছে! পালাচ্ছে! ওই যে!”

“ধর! ধর!”

খোলা তরবারি নিয়ে রাক্ষসগুলো ছুটে আসছে। প্রাণভয়ে দৌড়োচ্ছে ওরা। সঙ্গে কোনো অস্ত্রশস্ত্রও নেই। সামনে জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছে। জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়ছে উদ্ভূত তরবারির ফলকে।

আরও কিছুটা ছুটে গিয়ে থেমে যেতে হল ওদের। আর যাবার রাস্তা নেই। সামনে বিরাট নদী।

নদীর জলটা অদ্ভুত হলদে রঙের লাগছে চাঁদের আলোয়। বোঝা যাচ্ছে, বেশ স্রোত আছে নদীতে। এর জল স্পর্শ করা বা পান করা নিষিদ্ধ, মনে পড়ল তার। মৃত দেবতার নদী!

ওরা ফিরে দাঁড়াল। চারজন রাক্ষস তিনদিক থেকে আসছে – অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে তারা, যাতে পাখি কোনোভাবেই পালাতে না পারে। লীনার গোঁফ অর্ধেকটা খুলে গিয়ে ঝুলছে, গালের আঁচিলটা নেমে এসে আটকে আছে চিবুকের বামদিকে।

ওদের পেছনে নদী, সামনে তিনদিকে শত্রু। পালানোর পথ নেই।

লীনা বলল, “অতীত, কিছু করো।”

অভী দ্রুতগতিতে চিন্তা করছে। এভাবে ধরা দেওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। কী করা যায় এখন? রাক্ষসগুলো একদম এসে পড়েছে ওদের থেকে কয়েক হাত দূরত্বে। তাদের চোখেমুখে শিকারকে বাগে পাওয়ার হিংস্র উল্লাস।

চোখ বন্ধ করল সে। লীনা আরও ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, “অভী? কী হল?”
“শশশ! কথা বোলো না।”

চোখ বন্ধ করে তুষারাচ্ছন্ন বিরাট পর্বতশৃঙ্গের দৃশ্য কল্পনা করল সে। তার হাতের তালু শীতল হয়ে যাচ্ছে। সে যেন দেখতে পাচ্ছে, বিরাট বরফের চাঁই ভেঙে পড়ছে – তার গুমগুম শব্দে কেঁপে উঠছে দশদিক। অভী জানে, একসঙ্গে একজনের বেশি প্রতিপক্ষের মহড়া নিতে সে পারবে না; আর এই হিমকুশলতার শক্তি প্রয়োগ করা মানে এর পরেই তার শরীর লুটিয়ে পড়বে ক্লাস্তিতে। কিন্তু কিছু করার নেই তার। বাঁচার শেষ একটা চেষ্টা করতেই হবে।

সেই হিমশীতলতা উঠে আসছে তার মধ্য থেকে, ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাইছে তার তালু দিয়ে। সেই ভয়ংকর শক্তিকে সে ছুঁড়ে মারতে যাবে আক্রমণকারীদের দিকে, এমন সময় লীনা ভয়ার্তকণ্ঠে ডেকে উঠল, “অভী! চোখ খোলো।”

মনঃসংযোগ ছিন্ন হয়ে গেল তার; বরফ পাহাড়ের দৃশ্য অদৃশ্য হয়ে গেল মাথা থেকে। বিরক্ত হয়ে লীনাকে কিছু একটা বলার জন্য চোখ খুলল সে, আর সঙ্গে সঙ্গেই অবাক হয়ে গেল।

আক্রমণকারী রাক্ষসরা পালাচ্ছে। তাদের দু’জন বার কয়েক ভয়ার্তভাবে দেখে নিল নদীর দিকে। তারপর তারা ছুটে পালিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে – আর দেখা গেল না তাদের। মনে হল যেন এমন ভয় তারা আগে কখনও পায়নি।

লীনার দিকে তাকিয়ে সে দেখল, লীনা পাংশু মুখে চেয়ে আছে নদীর দিকে। নদী থেকে উঠে আসছে চারটে অদ্ভুত আকৃতি। মাথায় দুটো শিং আছে তাদের, হাতে ত্রিশূল। লীনা ফিশফিশ করে বলল, “এদেরকে বলে নীরসেনা। ভীষণ প্রকৃতির লোক এরা। মৃতদেবতার নদীর তলায় এই মৃতরা থাকে – এদের মৃত প্রভুর দেহ নাকি আজও জলের তলায় আছে – সেই দেহ পাহারা দেয় এরা। এদের অস্ত্রসন্ধান নিখুঁত এবং অব্যর্থ।”

অভী বলল, “কী সব বলছ, কিছু বুঝতে পারছি না।”

“বুঝে কাজ নেই। যা বলার আমি বলছি। তুমি শুধু মুখটা বন্ধ রাখো।”

বিচিত্র চেহারার জীবগুলো উঠে এল জল থেকে। সারা গায়ে আঁশ চকচক করছে তাদের, পরনে কোনো বস্ত্র নেই। হাতের ত্রিশূলের ডগা থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। চারজন ওরা এসে মুখোমুখি দাঁড়াল অভীদের।

“এই নদীর তীরে যুদ্ধ করা নিষেধ।” কথা বলল এক নীরসেনা। তার কণ্ঠস্বর যেন সুরেলা বাঁশির মতো। “দেবতার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়েছ তোমরা।”

লীনা হাতজোড় করে বলল, “হে নীরসেনা মহাশয়, আমরা ইচ্ছাপূর্বক দেবতার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইনি। আমরা যুদ্ধ করিনি; আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম। দেখুন, আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।”

একবার ওদের দেখে নিল ভালো করে তারা। দানবীয় মুখগুলোতে কোনো

ভাবস্থর হল না। একজন বলল, “তোমরা সত্যকথা বলেছ। তোমাদের ক্ষমা করা হল। কিন্তু অস্ত্র নিয়ে এই নদীতীর কলুষিত করতে যারা চেয়েছিল, তাদের ক্ষমা নেই।”

জঙ্গলের দিকে তাদের ত্রিশূলগুলো নিক্ষেপ করল চার নীরসেনা। অতী মনে মনে ভাবল, “এতে লাভ কী? রাক্ষসগুলো তো বেধহয় এতক্ষণে পীতপত্রবন পেরিয়ে চলে গেছে!”

ত্রিশূলগুলো তীব্রগতিতে উড়ে চলল - পড়ে গেল না মটিতে। ওদের চোখের সামনে সেগুলো অন্ধকার বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতী বলতে গেল “কিন্তু...”, লীনা তার হাতে চিমটি কেটে তাকে চুপ করিয়ে দিল। নীরসেনারা স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে পীতপত্রবনের গাছগুলোর দিকে - যেন কীসের প্রতীক্ষা করছে।

তারপরেই গভীর বনের মধ্যে থেকে ভেসে এল দিকট চিৎকার - একটা নয়, পরপর চারটে। সেই দীভৎস মরণান্তিক আর্তনাদে অতী আর লীনার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল।

“এ কী?” অতী জিজ্ঞেস করে ফেলল লীনার ভ্রুকুটি উপেক্ষা করেই।

এক নীরসেনা উত্তর দিল, “কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত।”

ওরা অপেক্ষা করে রইল। আরও কতক্ষণ পরে চাঁদের আলোয় দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য।

ওই চারজন বেরিয়ে আসছে জঙ্গল থেকে - ওদের প্রত্যেকের বুকে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে আছে একটা করে ত্রিশূল। ওদের হাঁটার ভঙ্গি দেখেই অতী আর লীনা বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

দেহে যে ওদের প্রাণ নেই, তা আর বলে দিতে হয় না। তাও ওরা হাঁটছে। বুকে গাঁথা ত্রিশূল নিয়েই দিবি হেঁটে আসছে ওরা একদম মাপা পদক্ষেপে। সারা গায়ে আঁশ গজিয়ে উঠেছে ওদের; চাঁদের আলোয় চকচকিয়ে উঠছে সেই আঁশ। মাথায় দুটো করে শিং গজিয়েছে চারজন মৃত রাক্ষসেরই।

এক নীরসেনা বলল, “প্রভুর নিয়ম ভঙ্গ করেছিল এরা। এখন থেকে এরা আমাদের একজন হয়ে প্রভুর আদেশ পালন করবে।”

ওদের বুক থেকে হ্যাঁচকা টানে ত্রিশূলগুলো খুলে নিল নীরসেনারা। ওরা এতটুকু শব্দও করল না।

তারপর চারজন নীরসেনা অতীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, “প্রভু বলছেন, একদিন তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে।”

অতী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। নীরসেনা বলল, “তুমি মহাসৌভাগ্যবান বালক। স্বয়ং প্রভু বলছেন তোমাকে তিনি দর্শন দেবেন। তবে তার এখনও দেরি আছে।”

আর কিছু না বলে মাপা পদক্ষেপে পেছন ঘুরে জলে নামতে শুরু করল নীরসেনারা। তাদের সঙ্গে চলল সদ্যমৃত চারজন রাক্ষস। তাদের বস্ত্র পড়ে রইল নদীর তীরে।

জলে ডুবে যাওয়ার আগে এক নীরসেনা বলল, “বজ্রধরের এক স্নেহভাজন

আসছে তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে। তার সঙ্গে যাও, নিরাপদে আয়তনে পৌঁছে যাবে।”

ওরা সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হয়ে গেল মৃত দেবতার নদীতে। অভী বলল, “লীনা, এসব কী দেখলাম? কী শুনলাম?” - ধপ করে নদীর চড়ায় বানির ওপর বসে পড়ল সে।

লীনাও বসল তার পাশে। “আমিও তাই ভাবছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক এই ‘প্রভু’টি কে? স্বয়ং মৃত দেবতা নাকি? আর অধিনায়ক বজ্রধরের কোন্ স্নেহভাজনই বা আসছে আমাদের নিয়ে যেতে?”

যেন তার প্রশ্নের উত্তরেই তাদের পাশে একটা জান্তব ‘গরগর’ ধ্বনি শোনা গেল। লীনা ভয়ে “ও মা গো!” বলে চোঁচিয়ে লাফিয়ে উঠেছিল। কিন্তু অভী চিনতে পারল আগন্তুককে।

সেই মা-চিতাটা!

বনের পথে ওদের সামনে চলল জন্তুটা; তাকে অনুসরণ করে চলল ওরা দু’জন। দীর্ঘক্ষণ হাঁটার পরে যখন ওরা আয়তনের কাছাকাছি পৌঁছাল, তখন চিতাটা মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ চলে গেল গভীর বনের দিকে।

আয়তনে পৌঁছে ওরা ভেদেছিল চুপিচুপি ঢুকে পড়বে মিত্রভবনে, কিন্তু বিধি বাম। সবার আগে ওরা পড়ে গেল অধিনায়ক বজ্রধরের সামনে।

এত রাতে যে তিনি এই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন, ওরা ভাবতে পারেনি।

প্রচণ্ডভাবে জু কুঁচকে রয়েছে তাঁর। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, “কোথায় ছিলে তোমরা?”

অভীর মাথা নিচু, লীনারও। অভী মৃদুকণ্ঠে বলল, “ছায়াভবনে।”

বজ্রধরকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি রাগে ফেটে পড়বেন। ভীষণ মুখ করে কিছুক্ষণ ওদের নিরীক্ষণ করলেন তিনি।

কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, “ঘোরতর অন্যায় কাজ করেছ তোমরা। আয়তনের নিয়ম সম্বন্ধে যদি এতটুকু শ্রদ্ধাশীল হতে, তাহলে এ কাজ করতে পারতে না।”

ওরা অপরাধীর মতো মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বজ্রধর বললেন, “তোমরা নিখোঁজ, সে খবর শ্রীমতী মিত্র দিয়েছেন আমাদের। তোমরা যে কোথায়, সে বিষয়ে নিধিও একটি কথাও বলেনি আমাদের। কারণটা বোঝাই যাচ্ছে - বন্ধুপ্রীতি। গোটা আয়তনের সবাই পাগলের মতো খুঁজছে তোমাদের সেই কখন থেকে, তোমাদের কোনো ধারণা আছে?”

বজ্রধরকে এত রাগতে ওরা কখনও দেখেনি। অভী মৃদুস্বরে বলল, “আমাদের ভুল হয়ে গেছে, অধিনায়ক বজ্রধর।”

“ভুল তো হয়েছেই। মারাত্মক ভুল হয়েছে। চারদিকে শত্রু ছড়িয়ে আছে। এই অবস্থায় তোমরা যদি এইরকম বেপরোয়া আচরণ করো, তাহলে আমাকে আরও কঠোর হতে হবে। সমরোত্তম শ্যামশ্রী, সমরোত্তম মেঘবর্ণ তোমাদের চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছেন। আয়তনের প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীকে ডেকে

জিজ্ঞাসাবাদ করেছি আমরা। কেউ তোমাদের সন্ধান দিতে পারেনি।”

লীনা বলল, “আমরা উর্গায়ুর সংবাদ এনেছি, অধিনায়ক বজ্রধর।”

বজ্রধর এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন; তারপর বললেন, “এই এতখানি জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না তার জন্য। ...যাই হোক, এখন সম্মেলন কক্ষে চলো। সেখানেই সবাই জড়ো হয়েছেন। তোমাদের অভিজ্ঞতা ও তোমাদের আনা সংবাদ ওখানে সবাই শুনবেন এবং তোমাদের অক্ষত দেহে দেখে নিশ্চিত হবেন। শ্রীমতী মিত্র কত কৈঁদেছেন, জানো?”

আর কোনো কথা না বলে বজ্রধরকে অনুসরণ করল ওরা। সম্মেলন কক্ষে ওদের নিয়ে তিনি ঢুকতেই সবাই উদ্বেজনাতে উঠে দাঁড়াল।

“এই তো ওরা!”

“এই তো পাওয়া গেছে এতক্ষণে!”

মিত্রমাসি ছুটে এসে ওদের জড়িয়ে ধরলেন, হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন মাথায়, মুখে। কৈঁদে কৈঁদে তাঁর চোখ লাল হয়ে গেছে।

শ্যামশ্রী এগিয়ে এসে তাঁকে টেনে নিলেন। “আপনি শান্ত হোন, শ্রীমতী মিত্র। ওরা সুস্থ আছে, ওরা নিরাপদ আছে। আপনি স্থির হয়ে বসুন। তারপর আমরা ওদের কাছে শুনব ওরা কোথায় ছিল।”

মিত্রমাসি গিয়ে বসলেন নিধির পাশে। নিধির মুখেও উৎকণ্ঠা। তবে সে অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট শান্ত আছে। অতীত দিকে চোখ তুলে ইশারায় সে জানতে চাইল, “কাজ হয়েছে?” অতীত অল্প মাথা দুলিয়ে “হ্যাঁ” বলল।

মেঘবর্ণ এগিয়ে এল। “কোথায় ছিলে বলো তো তোমরা?”

বজ্রধর ওদের আগেই বললেন, “ছায়াভবনে। ওরা যে জীবন্ত ফিরে আসতে পেরেছে, এটাই আমাদের সৌভাগ্য মনে করছি।”

কক্ষের সবাই বিস্ময়ে, আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে রইল। ছায়াভবনে! শর্বর-উর্গায়ুর উগ্র সমর্থকদের মাঝখানে!

মেঘবর্ণ তারপর একটু হাসল; বলল, “তোমরা যা করেছ, শিক্ষক হিসেবে, সমরোত্তম হিসেবে, আমি তাকে মোটেই সমর্থন করছি না। কিন্তু আয়তনের জন্য এই সাহস প্রদর্শনকে আমি প্রশংসা না করে পারছি না।”

শ্যামশ্রী বললেন, “নিয়মভাঙা কোনো প্রশংসনীয় কাজ নয়। তবে হ্যাঁ, দুরন্ত সাহসের পরিচয় তোমরা দিয়েছ, এ-কথা আমিও স্বীকার করি। এবার তোমরা খুলে বলো তোমাদের অভিজ্ঞতা; আমরা শুনতে আগ্রহী।”

এখানে আসার পথেই অতীত আর লীনা ঠিক করে রেখেছিল, মৃত দেবতার নদীর তীরের অভিজ্ঞতা ওরা নিধি ছাড়া আর কাউকে বলবে না। সেইমতো দু’জনে মিলে পালা করে পুরো ঘটনাটা বলে গেল। লীনা তার পোশাকের মধ্যে থেকে স্বপ্ন-উপলটা বার করে বজ্রধরের হাতে তুলে দিল। “ওখানে যা যা হয়েছে, সব কিছু শব্দ ধরা আছে এতে। উর্গায়ু একটা অজানা ভাষায় কীসব বলছিল, আমরা বুঝতে পারিনি। সেই কথাগুলোও আছে এখানে। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন।”

মেঘবর্ণ খুশিমুখে বলল, “দারুণ কাজ করেছ তোমরা। আমার এক বন্ধু

বলত, বিপদের সময় বীরত্বের চেয়েও বেশি দরকার হয় উপস্থিতবুদ্ধি। সেই কথা আজ আবার মনে পড়ে গেল।”

বজ্রধর গম্ভীরভাবে বললেন, “থাক মেঘবর্ণ। এখন আর ওই বিশ্বাসঘাতকের কথা নাই বা বললে। এই স্বপ্ন-উপল নাও, এতে ধরে রাখা কথাগুলো শোনাও আমাদের। অজানা ভাষাটি সম্ভবত প্রাচীন রাক্ষসভাষা। সেগুলোরও অনুবাদ করে দাও শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে।”

তার হাত থেকে স্বপ্ন-উপলটি নিয়ে মেঘবর্ণ বিশেষভাবে আঙুল বোলালো তার ওপর। স্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসতে লাগল তার মধ্য থেকে। শ্যামশ্রী হাত তুলে সবাইকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করলেন। কক্ষ শান্ত হয়ে গেল।

উর্গায়ুর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল। “শর্বরের জয় হোক।” তারপর শোনা গেল অনেক রাক্ষসের সমবেত কণ্ঠে শর্বরের নামে জয়ধ্বনি।

সমরোত্তমরা চমৎকৃত হয়ে তাকালেন পরস্পরের দিকে। রাক্ষসদের গোপন সম্মেলনের এত অভ্যন্তরের খবর সরাসরি পাওয়া যাবে, এ আশা তাঁরা কখনও করেননি। প্রশংসার দৃষ্টিতে একবার মেঘবর্ণ তাকিয়ে নিল ওদের দিকে।

খুশিতে অভীর বুক নেচে উঠল। যাক, তাদের এত পরিশ্রম, এত বিপদের মোকাবিলা করা সার্থক হয়েছে তাহলে।

উর্গায়ু কথা বলে চলেছে অনর্গল। কিছুক্ষণ পরে সেটা থামিয়ে দিয়ে মেঘবর্ণ বলল, “এইবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে উর্গায়ু কী চতুরভাবে অর্ধরাক্ষসদের খেপিয়ে তুলছে আয়তনের বিরুদ্ধে। অত্যন্ত ধূর্ত এবং বিপজ্জনক লোক!”

শ্যামশ্রী বললেন, “সে তো বোঝাই যাচ্ছে। তাই অর্ধরাক্ষসদের ভুলিয়ে ভালিয়ে রাক্ষস-ঐক্যের কথা বলে দলে টানার এত ব্যাকুল চেষ্টা।”

বজ্রধর বললেন, “বাকিটা চালাও, শোনা যাক।”

অভীর মনে বেশ একটা গর্বের অনুভূতি হচ্ছে। একটা ভালো কাজ করতে পেরেছে তারা।

উর্গায়ুর স্বপ্নের কথা, নেতা শর্বরের কথা – সব একে একে শোনা যেতে লাগল স্বপ্ন-উপল থেকে। লীনা ফিশফিশ করে অভীকে বলল, “ভাগ্যিস এটা সঙ্গে রেখেছিলাম!”

অভীও ফিশফিশ করে বলল, “ভাগ্যিস তোমার বুদ্ধিটা আমার চেয়ে উর্বর!”

শোনা যাচ্ছে, ককটক উর্গায়ুকে বলছে প্রাচীন রাক্ষস ভাষায় কিছু বলতে। আরও কিছু বাদানুবাদের পর সে কথা বলতে শুরু করল সেই অজানা ভাষায়।

মেঘবর্ণ স্বপ্ন-উপলে হাত বুলিয়ে বক্তৃতাটা থামিয়ে দিয়ে বলল, “কিছুক্ষণ ছাড়া ছাড়া আমি উর্গায়ুর কথা থামিয়ে আমাদের ভাষায় অনুবাদ করে দেব, যাতে সবাই বুঝতে পারো, কেমন?”

কিছুটা চলল উর্গায়ুর বক্তব্য। তারপর মেঘবর্ণ বলল, “উর্গায়ু বলছে, ‘ইতিমধ্যেই সমরগরিমা আয়তনের দৈব অস্ত্রের সংগ্রহশালায় একবার আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছি আমরা। অপদার্থ নিয়ামক বিনীতেশ যতই চেষ্টা করুক,

আমাদের ঠেকিয়ে রাখা তার কর্ম নয়। স্বয়ং সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধরের নাকের ডগায় আমরা এতবড়ো হামলা চালিয়ে ফেললাম, কেউ আগাম খবরটুকুও পায়নি। এ আমাদের বিরাট বড়ো সাফল্য।”

শিক্ষার্থীরা কোনো কথা বলছে না। কিছুক্ষণ আবার চলল অজানা রাক্ষসভাষায় উর্গায়ুর বক্তব্য। তারপর মেঘবর্ণের অনুবাদ শুরু হল। “আমাদের যে ভাইরা গিয়েছিল আয়তনের সংগ্রহশালা থেকে দৈবাস্ত্র নিয়ে আসতে, দুর্ভাগ্যক্রমে তারা সেখানেই জীবন উৎসর্গ করেছে এই মহান কার্যব্রতে। কিন্তু সমরগরিমা আয়তন যদি ভেবে থাকে যে আমরা এতেই ক্ষান্ত দেব, তাহলে খুব ভুল করবে তারা। আমাদের নেতা শর্বরের পাশমুক্তির জন্য অন্য উপায় ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়েছে। তার প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে।”

আবার স্বপ্ন-উপলে হাত বোলাল মেঘবর্ণ। উর্গায়ুর কথা শোনা যেতে লাগল। অভী ভাবতে লাগল, “এবার তাহলে রাক্ষসরা কী উপায়ে শর্বরের বাঁধন কাটার কথা ভাবছে? নাকি সহযোদ্ধা রাক্ষসদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ধূর্ত উর্গায়ু মিথ্যে প্রবোধ দিচ্ছে ওদের?”

হঠাৎ মেঘবর্ণ থামিয়ে দিল স্বপ্ন-উপল থেকে ভেসে আসা উর্গায়ুর কথাগুলো। তার মুখ হঠাৎ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে, দেখল অভী।

শ্যামশ্রীর মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাঁরও সারা দেহ যেন হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠেছে। বজ্রধরের কপালে ভীষণ জ্রকুটি। লীনা ফিশফিশ করে বলল, “উর্গায়ু এম্ফুনি তোমার নাম নিল, অভী। বুঝতে পারলে?”

মেঘবর্ণ চুপ করে আছে, ব্যাখ্যা করছে না উর্গায়ুর শেষ কথাগুলো। অভীর ভয় করতে লাগল। কী বলল উর্গায়ু? সমরোত্তমরা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন? মেঘবর্ণ হঠাৎ মুখের ঘাম মুছছে কেন?

ছাত্ররাও স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে সমরোত্তমদের দিকে, অপেক্ষা করছে। মৃগেন্দ্র উঠে দাঁড়াল।

“সমরোত্তম মেঘবর্ণ, দয়া করে এই শেষ কথাগুলি আমাদের বুঝিয়ে বলুন।”

মেঘবর্ণ অসহায়ের মতো তাকাল অধিনায়ক বজ্রধরের দিকে। বজ্রধর চুপ করে আছেন; কী যেন ভাবছেন।

মেঘবর্ণ ডাকল, “অধিনায়ক বজ্রধর।”

বজ্রধর গম্ভীরভাবে বললেন, “ছাত্ররা জানতে চাইছে এর অর্থ। তাদের শিক্ষক আমরা। তুমি আমাদের ভাষায় কথাগুলোর অনুবাদ করে দাও, মেঘবর্ণ।”

বজ্রধর তাকিয়ে রইলেন শূন্যের দিকে; তাঁর মুখ হঠাৎ ভাবলেশহীন হয়ে উঠেছে। শ্যামশ্রীর মুখ মাটির দিকে। শিক্ষার্থীরা গভীর উত্তেজনায় উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল।

কাতর দৃষ্টিতে একবার অভীর দিকে তাকিয়ে নিল মেঘবর্ণ। তারপর একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে সে বলল, “উর্গায়ু বলছে, ‘একজনকে আমরা চাইলে কাজে লাগাতে পারি। ওদের বিশ্বাসঘাতক সমরোত্তম নীলাভ্রর ছেলে এই ক’দিন হল এসেছে আয়তনে। তার নাম অভী’।”



।। চতুর্দশ অধ্যায় ।।

ভারাক্রান্ত

সে যে কীভাবে টলতে টলতে মিত্রভবনে ফিরল, তা সে নিজেও জানে না। মাথা ঘুরছে তার; ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড বমিভাব যেন উঠে আসতে চাইছে।

সমরোত্তমরা দাঁড়িয়েই ছিলেন, কেউ কিছু বলেননি। তাঁদের সামনে দিয়ে অভী বেরিয়ে এসেছিল সম্মেলন কক্ষ থেকে। পেছন থেকে কে একজন চিৎকার করে উঠেছিল, “বিশ্বাসঘাতকের ছেলে! ছি ছি ছি!”

গলাটা বোধহয় তরুণের। অভী ঘুরে দেখারও প্রয়োজন মনে করেনি। তার সারা দেহ তখন থরথর করে কাঁপছে, অঙ্গ অবশ হয়ে আসছে। শরীরের ভেতরে যেন একটা তরল ঘৃণা পাক খাচ্ছে প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গে। শুধু হাত নয়, গোটা গা ঠান্ডা হয়ে আসছে তার।

পেছন থেকে কে যেন ডাকছে তার নাম ধরে। অভী দাঁড়াল না। কাউকে সে এখন দেখতে চায় না, কারও সামনে দাঁড়াতে চায় না। মিত্রমাসি ডাকছেন, “অভী, দাঁড়াও।” সে থামল না। পর্বত ডাকছে, “অভী, গুনে যাও।” পর্বতের কুকুর বক্রপুচ্ছ ডাকছে ঘেউ ঘেউ করে, সম্ভবত সেও বলছে তাকে দাঁড়াতে। অভী হনহন করে হেঁটে চলে এল ওখান থেকে।

মিত্রভবনে এসেই স্নানাগারে গিয়ে বমি করল সে – ছায়াভবনের কমলার রস বেরিয়ে এল হুড়হুড় করে। কী অসহ্য জ্বালা করছে বুকের ভেতর! তার সঙ্গে মনটা যেন ভেঙে যাচ্ছে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে।

বিশ্বাসঘাতক নীলাদ্র তার বাবা!

এর চেয়ে যেন মৃত্যুও বেশি কাম্য ছিল তার।

ঘরে দরজা বন্ধ করে মেঝেতে পড়ে রইল সে। শয্যায় উঠে ওতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। ঠান্ডা পাথুরে স্পর্শটায় তবু যেন একটু আরাম লাগছিল।

এ হতে পারে না! এ হতে পারে না!

নিজের সর্বান্ত যেন অপবিত্র, অশুচি লাগছে তার। তার বাবা বিশ্বাসঘাতক! তার বাবা সমরগরিমা বিসর্জন দিয়ে বন্ধুদের, প্রিয়জনদের সর্বনাশ করতে চেয়েছিল! নিজের প্রতি অপরিণীম ঘৃণায়, লজ্জায় যেন সে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যাচ্ছিল।

দরজা বন্ধ রেখে মাটিতে শুয়ে রইল অভী। বাইরে থেকে লীনা আর নিধি কত ডাকাডাকি করল, সে দরজা খুলল না।

কল্পনার চোখে সে যেন সারা আয়তনের শিক্ষার্থীদের ঘৃণার দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে।

কাল থেকে আর কেউ তাকে 'বন্ধু' ভাবে না! কাল থেকে আর কেউ তার সঙ্গে আগের মতো মিশবে না। কাল থেকে সবাই তাকাবে বাঁকা চোখে, কাল থেকে সবাই তার পেছনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলবে, "ওই ছেলেটার বাবা আয়তনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল!" তাদের সেই চাহনি কল্পনা করে অভী যেন মরে যেতে চাইছিল।

আবার ধাক্কা দিচ্ছে দরজায় ওরা। লীনার গল। - "অভী! দরজা খোলো! আমরা তো তোমার বন্ধু! কথা বলে আমাদের সঙ্গে।"

"চলে যাও!" অভী অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল। - "আমি কারও সঙ্গে কথা বলব না।"

আরও কিছুক্ষণ দরজায় ডাকাডাকি করে ওরা ক্ষান্ত দিল। অভী পড়ে রইল মেঝেতে। কাঁদতেও পারছে না সে; শুধু বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড চাপ, একটা ভয়ংকর অর্থহীন কষ্ট যেন তার পাজরগুলোকে পিষে ফেলতে চাইছে।

হতেই পারে না এ। তার বাবা তো চাষাবাদ করতেন। তাই তো বলত রবিকাকা। সেও কি মিথ্যে বলেছিল?

কিন্তু পরমুহূর্তেই অভী বুঝতে পারল, নিজেকে বৃথা সাস্থনা দিচ্ছে সে। রবিকাকা কী বলত, তাতে আর কিছু যায় আসে না। অস্বচালনায় তার যে এত দ্রুতগতিতে উন্নতি ঘটছে, তা তার রক্তে আছে বলেই। আর এই হিমকুশলতা! নীলাভ্রও তো তার মতো হিমকুশল ছিল! নিজের প্রতি তীব্র ঘৃণা আসতেই সে বুঝতে পারল, শরীর আবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা, নিজেকে ঠান্ডায় জমিয়ে ফেলে আত্মহত্যা করা যায় না?

কে যেন ঝুপ করে লাফিয়ে ঢুকল ঘরের মধ্যে। কোথা থেকে এল? জানালাটা খোলা ছিল!

লীনা!

ঘরে ঢুকে তার সঙ্গে কোনো কথা না বলে আগে দরজাটা খুলে দিল সে। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিত্রমাসি আর নিধি। মিত্রমাসির হাতে খাবারের থালা।

অভী আর মাথা তুলতে পারছে না। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে তার

- চোখের সামনে যেন অজস্র আলোর বিন্দু দপদপ করছে। রাগ হচ্ছে সবার ওপরে। কিন্তু তাও সে নিজেকে শান্ত করল প্রবল শক্তিতে। হাতজোড় করে বলল, “মিত্রমাসি, আজ খাবারটা নিয়ে যান দয়া করে। তোমরাও যাও; আমাকে একটু একা থাকতে দাও।”

লীনা বলল, “একা থেকে করবেটা কী? আমরা বসছি তোমার কাছে।”

অভী কাতরস্বরে বলল, “লীনা, দয়া করো। একটু একা ছেড়ে দাও আমাকে।”

নিধি ঘরে ঢুকে লীনার হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে এল। মিত্রমাসি বললেন, “ঠিক আছে। আমরা বাইরেই আছি। তোমার যখন ইচ্ছে হবে, ডেকো আমাদের।”

সবাই বেরিয়ে গেল বাইরে। অভী পড়ে রইল মেঝেতে নিজীবের মতো।

চোখ বন্ধ করলেই তার চোখের সামনে ভাসছে বিরাট অগ্নিগহ্বরের মধ্যে নীলাভ্রর পড়ে যাওয়ার দৃশ্য। লাথি মেরে তাকে ফেলে দিয়েছিল ওর মধ্যে শব্দর। বিশ্বাসঘাতকের উচিত প্রাপ্য।

কিন্তু তাও যে কেন তার বৃকের মধ্যে এত কষ্ট হচ্ছে, অভী বুঝতে পারছে না।

সারাদিন সে পড়ে রইল মেঝেতে। অনুশীলনে গেল না। কেউ তাকে ডাকতেও এল না। কেনই বা আসবে? ওরা তো জানে, ওর বাবা ছিল বিশ্বাসঘাতক, সমরগরিমাত্যাগী। ওরা তাকে বর্জন করেছে। করাই উচিত। সে নিজে ওদের জায়গায় থাকলে তাই করত।

হাতদুটো তার বরফশীতল হয়ে যাচ্ছে। জলপাত্রটা হাতে তুলে নিল সে। মুহূর্তের মধ্যে ওটা জমে বরফ হয়ে গেল; নীচে ফেলে দিতে ভেঙে গেল কয়েক টুকরোয় - ভেতরের জলটা একখণ্ড নীলাভ বরফ হয়ে পড়ে রইল মাটিতে।

ভেতরে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে দুঃসহ ঘৃণা - এই ঘৃণা কার প্রতি, সে জানে না। কিন্তু মনে হচ্ছে, সব কিছু যেন ধ্বংস করে দিতে পারলে তবে তার মনটায় একটু শান্তি হয়। কাকে এত ঘৃণা? বাবাকে? নিজেকে? নিজের ভাগ্যকে? অভী ছটফট করতে লাগল।

“আমার জন্মানোই উচিত হয়নি।” - চিন্তাটা বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল তার মনের মধ্যে।

সারাদিন অভী কিছু খেল না, পড়ে থাকল নিজের কক্ষের মেঝেতে। সন্ধ্যার দিকে একবার মাথা তুলতে গিয়ে বুঝল, ভীষণ অবসন্ন লাগছে।

দরজাটা বন্ধ আছে। একবার ইচ্ছা হল, উঠে গিয়ে খোলে। কিন্তু শরীর-মন এত দুর্বল যে অভী যেন আর নড়তে পারছে না। আবার গুয়ে পড়ল সে; জানালা দিয়ে দেখতে পেল, বাইরেটা অন্ধকার হয়ে আসছে।

অজ্ঞান হয়ে যেতে পারলে হয়তো এই জ্বালার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেত।

কিছুক্ষণ পরে জানালা দিয়ে কারা যেন ঢুকে পড়ল ভেতরে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। লীনা, নিধি দু'জনেই এসেছে। নিধির হাতে জলপাত্র; লীনার হাতে

পাত্রে কয়েকটা ফল আর মিষ্টদ্রব্য।

অভী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নিধি তার ঘাড় ধরে টেনে তুলল তাকে মেঝে থেকে। কী জোর মেয়েটার গায়ে! জানালার সামনে তাকে টেনে নিয়ে গেল সে। নিধি তাকে ধরে রইল; লীনা তার মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে দিতে লাগল।

ঠান্ডা জলটা মুখে লাগতে এতক্ষণে অভীর মনে হল, যেন শরীরটায় একটু আরাম লাগছে। লীনা জলপাত্র ধরে রইল তার মুখের কাছে। অভী একটু জল খেল।

নিধি সাবধান করে দিল। - “লীনা, বেশি জল খাইও না। অনেকক্ষণ খালি পেটে আছে। গা শুকোতে পারে।”

তারপর দুই মহিলার কড়া শাসনে অভী দুটো ফল আর মিষ্টি খেতে বাধ্য হল। খেতে খেতেই অভী বুঝতে পারল, বন্ধুদের এই অভ্যাচারটাই মনে মনে চাইছিল সে। পাত্র নামিয়ে রেখে এতক্ষণে দু’হাতে মুখ ঢেকে ছ ছ করে কেঁদে উঠল সে।

ওরা তাকে কাঁদতে দিল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর লীনা নরম স্বরে বলল, “অভী, তোমার বাবা কে ছিলেন, তাতে আমাদের কিছু যায় আসেনা - এই সহজ কথাটা বুঝতে তোমার এত সময় লাগছে কেন?”

অভী মুখ তুলে ভালো করে দেখল বন্ধুদের মুখ। কই, ঘৃণা তো নেই। অবিশ্বাসও নেই। কী ভীষণ উৎকর্ষা নিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে ওরা!

আবার কান্না পাচ্ছে তার। একটু জল খেয়ে কান্নাটা গিলে নিয়ে সে বলল, “কিন্তু তাতে আমার বাবা ভীরা ছিল, বিশ্বাসঘাতক ছিল, সেই সত্য পরিবর্তন হয়ে যায় কি?”

নিধি বলল, “উঃ, কিচ্ছু কি বোঝো না তুমি? আমাদের জন্মেরও আগে তোমার বাবা কী করেছিলেন, তা জেনে আমাদের কী কাঁচকলা হবে? তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি তো আর ভীরা বিশ্বাসঘাতক নও। ওইটুকুতেই আমাদের চলে যাবে। আর যে তোমাকে তোমার বাবাকে নিয়ে খারাপ কথা বলবে, তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা দু’জন করব। ঠিক আছে, লীনা?”

লীনা বলল, “ওই তরুণটাকে কাল সকালেই আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে ডাকছি। যদি ও আমার হাতে উত্তম-মধ্যম না খায় তো আমি বৃথাই নিযুদ্ধ শিখেছি সমরোত্তম শ্যামশ্রীর কাছে।”

অভী এত দুঃখের মধ্যেও অবাক হয়ে বলল, “শ্যামশ্রী নিযুদ্ধ, মানে খালি হাতে লড়াই করার কৌশল শেখান?”

“হ্যাঁ। ছেলেদের শেখায় পর্বত, আর মেয়েদের শেখান শ্যামশ্রী। তবে খুব বেশি সংখ্যক ছেলেমেয়ে ও বিদ্যা শেখে না। কাল যদি তরুণের নাকের তরুণাস্থি ভাঙতে না পেরেছি, আমার নাম বদলে দিয়ো।”

অভী বলল, “না না। ওরকম কোরো না। তরুণের সঙ্গে যা শত্রুতা, তা শুধু আমার। তোমরা আর আমার জন্য...”

নিধি তার মাথায় টোকা মেরে বলল, “আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি সামলে

রাখব লীনা কে। কিন্তু বন্ধুদের ওপর তুমিও আর একটু ভরসা রাখতে শেখো, অভী।”

অভী মাথা নীচু করে রইল। এমন সময় বাইরে থেকে মিত্রমাসির গলা শোনা গেল। - “দরজা খোলো, অভী। দু’জন সমরোত্তম এসেছেন।”

লীনা আর নিধি জানালা দিয়ে পালাতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরে থেকে শ্যামশ্রীর গলা পাওয়া গেল। - “জানালা দিয়ে নয়, নিধি আর লীনা দরজা দিয়েই এসো।”

ওরা অবাক হয়ে পরস্পরের দৃষ্টির দিকে তাকাল। তারপর নিধি ফিশফিশ করে বলল, “আমাদের ঘরে আমরা নেই দেখেই উনি বুঝে গেছেন আমরা এখানে।”

দরজা খুলে বেরিয়ে এল ওরা। মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন বাইরে। শ্যামশ্রী নীচুগলায় বললেন, “কিছু খেয়েছে ও?”

লীনা বলল, “এই মাত্র একটু খেয়েছে।”

“বেশ। তোমরা এখন যাও। আমরা একটু কথা বলি ওর সঙ্গে।”

সমরোত্তমদের ঢুকতে দেখে অভী উঠে দাঁড়াল। ওর শয্যার পাশে মেঝেতেই বসে পড়ল মেঘবর্ণ। অভী অর্পিত করতে যাচ্ছিল, মেঘবর্ণ ওকে চূপ করিয়ে দিল।

শ্যামশ্রী বসলেন মেঘবর্ণের পাশে। ইঙ্গিত করলেন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লীনা কে দরজাটা বন্ধ করে দিতে।

তারপর মেঘবর্ণ তাকিয়ে রইল অভীর দিকে। অভীর বুকের মধ্যে এখনও তোলপাড় হচ্ছে। শ্যামশ্রী কোনো কথা বলছেন না, কিন্তু তাঁরও দৃষ্টি তার দিকেই।

মেঘবর্ণ বলল, “নীলাব্রকে নিয়ে তোমার মনে অনেক প্রশ্ন জমে আছে জানি। কিন্তু তার আগে তোমাকে বলে রাখা দরকার, আমরা সমরোত্তমরা সবাই তো বরাবরই জানি, তুমি আমাদের প্রাক্তন সতীর্থের ছেলে।”

অভীও তা বুঝতে পারছে এতক্ষণে। মেঘবর্ণের নানা ব্যবহার, শ্যামশ্রীর বলা সেই ‘বোঝা’র কথা – সব ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে তার। মেঘবর্ণ বলল, “তোমার ভালোর জন্যই আমরা এসব কথা তোমাকে বলতে চাইনি। অধিনায়ক বজ্রধর এবং আমরা বাকি সমরোত্তমরাও মনে করেছিলাম, তোমার ইতিহাস তুমি যত কম জানবে, ততই স্বচ্ছন্দে তুমি থাকতে পারবে এই আয়তনে।”

অভী বলল, “কিন্তু রবিকাকা? সে আমাকে মিথ্যা বলেছিল কেন? সে কেন বলেছিল, আমার বাবা কৃষক ছিলেন?”

দুই সমরোত্তম একবার পরস্পরের দিকে তাকালেন। তারপর মেঘবর্ণ বলল, “তোমার রবিকাকা তোমাকে যথেষ্ট ভালোবাসে। কিন্তু অনেক পুরোনো কথা তার আর মনে নেই। আসল স্মৃতির সেই ফাঁকগুলো তার ভরা আছে ভ্রাম্যক স্মৃতিতে। রবির ব্যাপারটা বেশ জটিল; এই মুহূর্তে তোমাকে ওটা বোঝানোও মুশকিল। কিন্তু এ-কথা ভীষণ ভাবেই সত্যি যে এই সমরগরিমা আয়তনের শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধার ছেলে তুমি।”

“যে যোদ্ধা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তোমাদের সবার সঙ্গে।”

“সে তো অনেক পরের কথা। কিন্তু অভী, আমরা সমরোত্তমরা শিক্ষক হিসেবে সেজন্য তোমাকে কখনও ছোটো করে দেখিনি। তোমার মধ্যে শিক্ষার্থী হিসেবে, মানুষ হিসেবে যে পূর্ণতা আছে, তাকে আমরা সম্মান করেছি সবসময়। তুমি নীলাভ্রর ছেলে, এই সত্য কখনও তোমাকে ছাত্র হিসেবে মেনে নিতে আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।”

অভী চুপ করে রইল। মেঘবর্ণ সত্য কথা বলছে, সে জানে। সমরোত্তমরা কখনও তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা দূরে থাক, একটু বেশিই ভালো ব্যবহার করেছেন। তাও তার মন থেকে ছালাটা যেন কিছুতেই যেতে চাইছে না।

সে বলল, “বাবা মানুষ হিসেবে কেমন ছিল, মেঘবর্ণ?”

মেঘবর্ণের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল হাসিতে। “বড়ো ভালো লোক ছিল গো। আমার প্রাণের বন্ধু ছিল নীলাভ্র। অমন বীর আমাদের আয়তনের ইতিহাসে খুব কম এসেছে। স্বয়ং ঐশিকশ্রেষ্ঠ ওকে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, রাক্ষসরাও খুব পছন্দ করত ওকে। কতবার সুদক্ষিণসারিতে গিয়ে একসঙ্গে সুমিত্রর দোকানে বসে ফলের রস খেয়েছি আমরা। একবার তো দু’জনে মিলে চলে গিয়েছিলাম মাল্যপর্বতে – খোদ পত্রাভিলক শাসকের প্রাসাদে।”

“তারপর?”

“আমাদের এখানের একটি মেয়েকে বন্দি করেছিল রাজা। তাকে ছাড়িয়ে আনতে আমরা দু’জন গিয়েছিলাম। আমি ওকে বললাম, ‘চলো,’ আর ও-ও এককথায় রাজি। তলোয়ার খেলানোর সুযোগ ছাড়তে চাইত না ও।”

শ্যামশ্রী হঠাৎ বললেন, “এই গল্প তুমি একদিন লীনাকে বলছিলে না?”

“হ্যাঁ। অভী পরে কখনও লীনার কাছে গল্পটা শুনে নিয়ো। এখন নীলাভ্রর কথা বলি। শরীরে ভয়ডর ছিল না ওর। আর আমার তো মনে হয়, অসিযুদ্ধে স্বয়ং দেবতারাও দাঁড়াতে পারতেন না ওর সামনে। তবে মনটা বড়ো নরম ছিল বেচারার। কারও দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারত না।”

অভী বলল, “কিন্তু তাহলে সে বিশ্বাসঘাতকতা করল কেন?”

“আমি জানি না, অভী। কিন্তু একটা কথা আমি তোমাকে বলতে চাই। নীলাভ্র আমাদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে, তার জন্য আমরা আয়তনের সবাই লজ্জিত। কিন্তু সেদিন রাতে তুমি সংগ্রহশালায় আমাকে নরকগহ্বর আহ্বান করতে দেখেছিলে, আর সেজন্য তোমার মনে অনেক প্রশ্ন জন্মা হয়ে আছে, তাও জানি। হ্যাঁ, আমি সত্যিই নরকগহ্বর আহ্বান করতে চাইছিলাম। সমরোত্তম শ্যামশ্রী আমাকে বেশ কিছুদিন ধরেই শেখাচ্ছেন মায়াটা। কিন্তু এত জটিল এবং অ-মানুষসুলভ মায়া যে আমি কিছুতেই পুরোটা আয়ত্ত করতে পারছি না। কেন ওই গহ্বর আমি খুলতে চাই জানো? আমি নীলাভ্রর দেহাবশেষ কুড়িয়ে এনে তাকে সম্মানের সঙ্গে সমাধিস্থ করতে চাই। জীবনের শেষমুহূর্তে সে যাই করে থাকুক, আমি তো জানি সে কেমন মানুষ ছিল, আয়তনের জন্য সে কত কিছু করেছে। একটা সম্মানজনক সমাধি অন্তত তার প্রাপ্য।”

অভী চুপ করে রইল। তার এখনও মনে হচ্ছে, তার বাবার যদি বীরের মৃত্যু হত, তাহলে সে এত কষ্ট পেত না।

মেঘবর্ণ বলল, “কিন্তু তুমি সেদিন ওখানে কী করছিলে, সেটা এখনও শোনা হয়নি আমার।”

অভী সবই বলল, শুধু স্বপ্ন সরোবরে তার নিজের নরকগহ্বরে পড়ে যাওয়ার যে দৃশ্য সে দেখেছিল, সে-কথা বাদ দিয়ে গেল। শুনে মেঘবর্ণ এবং শ্যামশ্রী দু’জনেই অবাক হয়ে গেলেন। মেঘবর্ণ বলল, “আয়তনে এসে এই অল্প সময়ে তোমার এত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে, যা আমাদের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর সারাজীবনেও হয়নি।”

অভী চুপ করে রইল। মেঘবর্ণ বলল, “তুমি আমাদের আয়তনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, অভী। আয়তনের ভালমন্দ নিয়ে তুমি চিন্তিত, আমরাও জানি। নয়তো প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ছায়াভবনে শর্বর আর উর্গায়ুর ভেতরের খবর আনতে তুমি যেতে না। তুমি নীলাদ্রর ছেলে বলে কেউ তোমাকে অসম্মান করবে, এ আমরা সমরোত্তমরা হতে দেব না।”

অভী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “সবাই মুখে বলবে না, কিন্তু মনের মধ্যে রাখবে। সামনে বলবে না, কিন্তু আড়ালে বলবে। মানুষের মনের ওপর তো আর কারও হাত নেই। আমার কি কষ্ট হচ্ছে না? আমার তো এখন থেকে সবসময় মনে পড়বে, আমার বাবা কাপুরুষ ছিল, বিশ্বাসঘাতক ছিল; যতদিন বাঁচব, এই যন্ত্রণা আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে।”

শ্যামশ্রী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার তিনি বললেন, “রক্তের একটা প্রভাব মানুষের ওপর থাকেই, তাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অভী, একটা মানুষকে কি আমরা তার পরিবারের ইতিহাস দিয়ে বিচার করি? সারা জীবনে সে যা কিছু কাজ করে যায়, তাই দিয়ে তার বিচার করে তার পরের প্রজন্ম। সেখানে সে কোন বংশের সন্তান, তার বাবা-মা কারা ছিল, এগুলো খুব বেশি প্রভাব ফেলে কি? এই ধরো না আমাদের অধিনায়ক বজ্রধরের কথা। তাঁর বাবা ছিলেন গরিব মুচি। কিন্তু সেই পরিচয় ওই মানুষটার এত বড়ো বীর যোদ্ধা, সমরগরিমার মতো দেবপ্রতিষ্ঠিত আয়তনের অধিনায়ক হয়ে ওঠার পথে একটুও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই জেনে রেখো, মানুষ মনে রাখবে তুমি এই জীবনে কী করে গেলে; তোমার বাবা কী করেছিলেন, তা নয়।”

সমরোত্তমরা চলে যাওয়ার পর মিত্রমাসি আর বন্ধুদের সঙ্গে একসাথে বসে রাতের খাবার খেল অভী। তবে কথা বলল না বিশেষ। কথা বলতে ভালো লাগছিল না, ক্লান্ত লাগছিল। চোখগুলো জবাফুলের মতো লাল হয়ে আছে তার।

খাওয়া শেষ হলে নিধি আর লীনা চলে গেল ওদের ঘরে। অভী বসে রইল। মন থেকে বিষণ্ণতাটা যেন যেতেই চাইছে না।

মিত্রমাসি বললেন, “অভী, মুখ ধুয়ে নাও। তারপর তোমাকে কয়েকটা কথা বলব।”

অভীর ভালো লাগছিল না। বড়ো বেশি কথা বলেন মিত্রমাসি। এই মুহূর্তে তার আদৌ ইচ্ছা করছে না বসে বসে ওঁর বকবক শুনতে। কিন্তু তাও সে

হাত মুখ ধুয়ে এসে বসল তাঁর সামনে। মুখস্তন্ধির পাত্র এগিয়ে দিলেন তিনি ওর দিকে।

মিত্রমাসি কী যেন ভাবছেন। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন তিনি। অভী বলল, “আমাকে কী বলবেন বলছিলেন?”

বাইরের দিকে তাকিয়েই মিত্রমাসি ধীরে ধীরে বললেন, “যেদিন শর্বর আক্রমণ করেছিল, সেদিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার।”

অভী তাকিয়ে রইল।

মিত্রমাসি বলে চললেন, “সে যেন এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন। শর্বরের সঙ্গে ছিল মাল্যপর্বতের বিকট সব জন্তু। তাদের এক-একটাকে দেখলে ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যায়। বিমোহকরা ওইসব জন্তু পালন করে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য। সেই মুহূর্তে আমি আয়তনেই ছিলাম। আমার দিকে তেড়ে এসেছিল বিরাট কুমিরের মতো একটা প্রাণী।

“আমি তখন পড়ে গেছি মাটিতে; দেখতে পাচ্ছি আমার মাথার ওপরে নেমে আসছে ওই দানবটার বিরাট হাঁ। তার বিরাট কালচে মুখ থেকে লাল ঝরছে; কী বিকট দুর্গন্ধ জন্তুটার মুখে! আমি ভয়ে পিণ্ড পাকিয়ে পড়ে আছি মাটিতে; বুঝতে পারছি, এই আমার শেষ।

“সেই মুহূর্তে আমাকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিল নীলাভ।

“এমন সাহস আমি জন্মে দেখিনি। আমাকে সরিয়ে দিয়ে নীলাভ লাফিয়ে পড়ল কুমিরটার মুখের সামনে; আর তার তরবারি দিয়ে চিরে ফেলল কুমিরের চোয়ালের নীচ থেকে পেট পর্যন্ত। কয়েকজন রাক্ষস পর্যন্ত হাততালি দিয়ে উঠেছিল সেই দৃশ্য দেখে।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “তাই নাকি?”

“হ্যাঁ, বিমোহকরা বেশিরভাগই দুষ্ট রাক্ষস হলেও ওরা বীরের প্রশংসা করতে জানে। আমার কথা বিশ্বাস করো, আর যাই হোক, নীলাভ কাপুরুষ ছিল না। তার মতো দুর্জয় সাহস আমি আজ পর্যন্ত আর কারও দেখলাম না।”

“কিন্তু...”

“হ্যাঁ, আমি বুঝেছি তুমি কী বলতে চাও। ওই শেষ মুহূর্তে কেন সে ওই নিন্দনীয় কাজটা করেছিল, আমার জানা নেই। শর্বরের সামনে আমার প্রিয় যোদ্ধাকে আত্মসমর্পণ করতে দেখে আমার যে কী কষ্ট হয়েছিল, সে আর কী বলব! কিন্তু কেউই তো জানেনা, নীলাভ কেন ও কাজ করেছিল। তাই যে যাই বলুক, আমি বিশ্বাস করি একটা মানুষের সারাজীবনের ভালো কাজ একটা খারাপ কাজের জন্য কক্ষনও মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। যে যাই বলুক, আমি বিশ্বাস করি না, সমরোত্তম নীলাভ কাপুরুষ ছিল। সমরোত্তম নীলাভ খুব বড়োমাপের বীর ছিল, আর খুব ভালো মানুষ ছিল, আমি তাকে আজও ওইভাবেই মনে রেখেছি।”

অভীর মনে হচ্ছিল এতক্ষণে যেন তার মনে যে পাথরটা চেপে বসেছিল, তার ভার একটু একটু হালকা হচ্ছে। মিত্রমাসি হাত বুলিয়ে দিলেন তার মাথায়। বললেন, “যে মুহূর্ত থেকে আমি জানলাম যে তুমি আমার জীবনরক্ষাকারীর

ছেলে, তখন থেকে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসাটা যেন আরও বেড়ে গেছে।”

এই প্রৌঢ়ার কথায় অভী অনেকটা সান্বনা পেল। নিজের কক্ষে এসে শুয়ে রইল সে শয্যায়। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে তার ঘরের মধ্যে।

শরীর পরিশ্রান্ত, মনও। বালিশের পাশে রাখা আছে সেই স্বপ্ন-উপলটা। সেটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে এল।

স্বপ্ন দেখছিল অভী। সে এসে দাঁড়িয়েছে মৃত দেবতার নদীর তীরে। হলদেটে জল কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। তীরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন নীরসেনা। তারা একসঙ্গে বলে উঠল, “সময় হয়েছে।”

অভী এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় দূর থেকে যেন রবিকাকার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, “অভী, দাঁড়া! যাস না।”

চমকে উঠে সে ফিরে তাকাল। দৃশ্যটা পরিবর্তিত হয়ে গেল।

এবার সে দেখতে পাচ্ছে শর্বরকে। একটা বর্শা গোঁথে দিচ্ছে সে নীলাভ্রর কাঁধে। নীলাভ্র পড়ে যাচ্ছে অতলান্ত নরকগহ্বরে। নীলাভ্র পড়ছে, কিন্তু আসলে নীলাভ্র পড়ছে না - পড়ছে অভী নিজে। লেলিহান আগুন গ্রাস করতে আসছে তাকে - লাল, কমলা শিখা ফুঁসে উঠছে সাপের ফণার মতো। তাপ লাগছে গায়ে; মনে হচ্ছে সর্বাঙ্গ ঝলসে যাচ্ছে।

হঠাৎ ঠান্ডা কীসের স্পর্শ লাগল কপালে। চমকে উঠে চোখ খুলল অভী। কে যেন বসে আছে পাশে - হাত রেখেছে মাথায়।

লীনা!

“আমার ঘুম আসছিল না। এমন সময় শুনি, ঘুমের মধ্যে চিৎকার করছ তুমি। দরজা তো খোলাই ছিল। আমি এসে কপালে হাত দিয়ে দেখি, তোমার তো জ্বর।”

অভীর চোখ থেকে এখনও সেই ভয়ংকর দৃশ্যের রেশ যায়নি। এখনও যেন সেই অগ্নিগহ্বরের প্রচণ্ড তাপ অনুভব করতে পারছে সে।

লীনা বলল, “খারাপ কোনো স্বপ্ন দেখছিলে?”

“আমি... আমি জানি না!”

মমতাভরে লীনা হাত বুলিয়ে দিল তার মাথায়। “ঘুমিয়ে পড়ো, আমি আছি পাশে বসে।”

অভীর হঠাৎ কান্না পেল। লীনার হাতের ওপর হাত রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। - “আমি একটা বিশ্বাসঘাতকের ছেলে, লীনা!”

লীনা শান্তকণ্ঠে বলল, “আমি পরোয়া করি না। তুমি আমার বন্ধু, ওইটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট। কোনো চিন্তা কোরো না, আমি আছি - সবসময়।”

অভী আবার ঘুমিয়ে পড়ল। তার ঘুম ভাঙল ভোরবেলায়। নিধি ডাকছে।

অভী চোখ খুলে দেখল, তার পাশে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল লীনা। এখন নিধির ডাকে চোখ খুলে তাকিয়েছে সেও।

নিধি বলল, “চট করে তৈরি হয়ে নাও। একবার আয়তনে যেতে হবে। একটা গুণগোল হয়েছে।”

অভী বলল, “কী হয়েছে?”

নিধি বলল, “রান্ধসরা নাকি এক ভয়ানক বার্তা পাঠিয়েছে হুমকি দিয়ে।
উষসীদি যাচ্ছিল এই পথ দিয়ে, আমাকে জানালায় দেখে বলে গেল। অনেকেই
জুটছে ওখানে। জলদি চলো।”

লীনা উঠে পড়ল। বলল, “চলো, চটপট তৈরি হয়ে নিতে হবে।”

অভী তাকিয়েছিল লীনার দিকে। বাইরে ভোরের নরম আলো ফুটে উঠেছে;
পূর্ব আকাশে গোলাপি আভা জাগছে। লীনার চোখগুলো যেন ফোলা ফোলা
লাগছে।

ভালো ঘুম হয়নি বলে?

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তার সঙ্গে একবার মাত্র চোখাচোখি হল
অভীর। মনে হল, লীনা যেন অস্বস্তিভরে চোখ সরিয়ে নিল।



।। পঞ্চদশ অধ্যায় ।।

হিমন্তক

আয়তনে পৌঁছে ওরা যা দেখল, তেমন কষ্টকর দৃশ্য ওরা আগে কখনও দেখেনি।

সংগ্রহশালায় ভিড় জমিয়েছে কুড়ি-পঁচিশ জন শিক্ষার্থী। ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে শ্যামশ্রীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

ওদের সঙ্গে সঙ্গে অধিনায়ক বজ্রধরও এসে পৌঁছোলেন সংগ্রহশালায়। তাঁকে আসতে দেখে ভিড়টা সরে গিয়ে পথ করে দিল। ওদের তাতে সুবিধাই হল। বজ্রধরের পেছন পেছন ওরাও পৌঁছে গেল কক্ষের মাঝখানে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। একটা কুকুরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন শ্যামশ্রী আর রক্ষোবৈদ্য। কুকুরটাকে দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল ওদের।

পর্বতের কুকুর বক্রপুচ্ছ - সারা গা তার জ্বলছে জ্বলন্ত মশালের মতো, কিন্তু তার মুখে এতটুকু বেদনার চিহ্ন নেই। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুকুরটা, কোনো শব্দ করছে না। বজ্রধরের ক্র কুণ্ঠিত হয়ে উঠল।

অভী জানে, উনি পশুপাখি ভালোবাসেন। কুকুরটার এই অবস্থা দেখে তাঁর মনের ভাব সহজেই অনুমেয়।

ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করছিল। একজন বলল, “বক্রপুচ্ছকে কাল দুপুর থেকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পর্বতদা অনেক খুঁজছিল ওকে। পায়নি।”

আর একজন বলল, “তার মানে তখনই ওকে এখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওরা।”

রাক্ষসরা বা তাদের কোনো চর এসে আয়তনের চৌহদ্দি থেকে কাউকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, এ চিন্তাটা মাথায় আসতেই ছেলেমেয়েগুলোর মুখ শুকিয়ে গেল। অভী মনে মনে ভাবল, “তাহলে অন্তত একজন সক্রিয় গুণ্ডচর তো আয়তনে আছেই।”

পর্বত এখনও খবর পায়নি তার কুকুর এইভাবে ফিরে এসেছে। সন্দীপ বলল, “আমাকে পর্বতদা এখানে ছুটে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করছিল কী হয়েছে? আমি বললাম, এখনও জানি না, গেলে জানতে পারব। ও বলল, একটু পরেই ও আসছে এখানে। এখনও ও জানে না, ওর কুকুরের এই অবস্থা করেছে রাক্ষসরা।”

উষসী বলল, “কী হয়েছে ওর, রক্ষোবৈদ্য মহোদয়?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “একে বলে গরলাগ্নি। খুব নিষ্ঠুর মায়াবিদ্যা। সাধারণত রাক্ষসরাই ব্যবহার করে এই মায়াবিষ। মৃত দেবতার নদীর জল বিশেষ পদ্ধতিতে ফুটিয়ে তার সঙ্গে আরও কিছু উপাদান মিশিয়ে এই বিষটা তৈরি করা হয়। যার ওপর এটা প্রয়োগ করা হয়, সে নিজে থেকেই জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বুঝতেও পারে না যে তার সর্বাস্ত পুড়ে যাচ্ছে।”

লীনা বলল, “কে প্রয়োগ করল ওর ওপর এই মায়া?”

শ্যামশ্রী বললেন, “রাক্ষসরা। আমাদের বার্তা পাঠিয়েছে ওরা। সাবধানবাণী। বক্রপুচ্ছের গায়ে ওই আগুনের মধ্যে পড়া যাচ্ছে। খেয়াল করলেই দেখতে পাবে।”

অভী দেখল, কুকুরটার গায়ে ঘিরে থাকা অগ্নিশিখার মধ্যে পড়া যাচ্ছে ওর চামড়ায় ফুটে ওঠা লালচে কমলা রঙের অক্ষরগুলো “স্বাধীনতার আগুনে পুড়ে মরবে তোমরা অত্যাচারী। তৈরি থেকো।”

নিরীহ একটা জীবের ওপর শারীরিক নির্যাতন করে কীভাবে অন্যদের ‘অত্যাচারী’ বলা যায়, অভী বুঝতে পারল না। মনে মনে রাক্ষসদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সে।

শ্যামশ্রী বললেন, “রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, তাড়াতাড়ি করুন। খুব দেরি হয়ে গেলে একে বাঁচানো যাবে না।”

হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকে এল পর্বত। “কই? কই? আমার বক্রপুচ্ছ কই?”

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা জ্বলন্ত কুকুরটার দিকে তাকিয়ে চোখে জল এসে পড়ল পর্বতের। তার গায়ে হাত ছোঁয়াতে গিয়েও সামলে নিয়ে সে বলল, “রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, ও বাঁচবে?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “কঠিন, কিন্তু সম্ভাবনা আছে। গরলাগ্নি আক্রান্ত জীবকে বাঁচানো খুবই দুরূহ কাজ। কিন্তু আমি শেষ চেষ্টা একটা করব তো বটেই। সঞ্জীবন-বন্ধনী লাগবে, সমরোত্তম শ্যামশ্রী। আর সেই ধরনের রক্ত লাগবে।”

শ্যামশ্রী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, “আমিও বুঝেছি তা। খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই ওই রক্তে ভিজিয়ে বন্ধনী দিতে পারলে আপাতত প্রাণীটার প্রাণরক্ষা হবে।”

ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই বলতে লাগল, “আমি দিতে পারি রক্ত।” “আমি দেব রক্ত।” “না, আমার রক্ত নিন, রক্ষোবৈদ্য মহোদয়।”

রক্ষোবৈদ্য স্নান হেসে বললেন, “তোমাদের রক্তে হবে না। কোনো ঐশিক বা কোনো সমরোত্তমের মায়ামিশ্রিত রক্ত লাগবে আক্রান্তকে দেওয়ার জন্য। মেঘবর্ণ কোথায়? তাকে ডাকুন। সে ছাড়া আপনারা কেউ দিতে পারবেন না ওই মায়ারক্ত।”

অধিনায়ক বললেন, “মেঘবর্ণ এই মুহূর্তে কোথায় জানি না। পর্বত, তুমি জানো?”

পর্বত সজল চোখে মাথা নাড়ল। সেও জানে না।

বজ্রধর বললেন, “খুঁজে আনতে আনতে অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে। শ্যামশ্রী রক্ত দিতে পারবেন না, আমি জানি। আপনি আমার রক্ত নিন।”

রক্ষোবৈদ্য চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, “আপনি জানেন অধিনায়ক বজ্রধর, সঞ্জীবন বন্ধনীতে রক্ত দিলে ওই বন্ধনী আপনার জীবনীশক্তির অনেকটা শোষণ করে নেবে। একজন মানুষের জীবৎকালে একবারের বেশি সঞ্জীবন-বন্ধনীতে রক্ত দিতে নেই। আপনি আগেও দিয়েছেন এই রক্ত। আবার দিলে আপনার বিপদ হতে পারে। দয়া করে মেঘবর্ণকে খুঁজে আনুন।”

বজ্রধর ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে বললেন, “আমি জানি না সে কোথায়। দেরি হয়ে যাচ্ছে রক্ষোবৈদ্য মহোদয়। এত দেরি হয়ে গেলে বক্রপুচ্ছ আর বাঁচবে না। আমরা সমরোত্তম; আতঁকে রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম। আমাদের আমাকে আমার ধর্ম পালন করতে দিন। আপনি বন্ধনী নিয়ে আসুন শীঘ্র।”

ডানহাতে ধাতব দণ্ডটিকে ধরে তাকে বামবাহুতে ঠেকালেন তিনি। তীক্ষ্ণ সাদা আলোর একটা রেখা বেরিয়ে এসে গভীর ক্ষতস্থানের সৃষ্টি করল তাঁর হাতে। মুখ দেখে অভী বুঝতে পারল, প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে তাঁর। কিন্তু দাঁত চেপে সে যন্ত্রণা সহ্য করছেন তিনি। শিক্ষার্থীরা দম বন্ধ করে দেখতে লাগল।

অভীর মনে পড়ল, নীলাভকেও যখন বর্ষাবিদ্ধ করেছিল শর্বর, ঠিক এইরকম করে সেও সহ্য করেছিল যন্ত্রণা। সমরোত্তমরা বোধহয় অন্যদের তুলনায় যন্ত্রণার প্রকাশ কম করার সক্ষমতা অর্জন করেন।

রক্ত গড়িয়ে পড়ছে ক্ষত থেকে। রক্ষোবৈদ্য তাড়াতাড়ি একটা লম্বা সাদা কাপড়ের টুকরো এনে চেপে ধরলেন রক্তের ধারার ওপরে। লাল হয়ে উঠল কাপড়টা।

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “একে আমার সেবাকক্ষে নিয়ে যেতে পারলে ভালো হত। কিন্তু এখন বেশি নড়ানো যাবে না।”

বজ্রধরের রক্তে ভেজা সাদা কাপড়ের টুকরোটা তিনি জড়িয়ে দিলেন কুকুরটার গায়ে। আগুনটা নিভে গেল।

এইবার কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে উঠল। সম্ভবত এতক্ষণে যন্ত্রণাটা অনুভব করতে পারছে সে।

শ্যামশ্রী শক্ত করে ধরে রইলেন তাকে। কুকুরটা ছটফট করছে। পর্বত এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার। - “বক্রপুচ্ছ। এই তো আমি আছি। আর একটু, আর একটু শুধু।”

বজ্রধরের ক্ষত থেকে অনর্গল রক্ত বেরিয়ে আসছে। রক্ষোবৈদ্য বারবার সাদা কাপড় ভিজিয়ে নিচ্ছেন সেই রক্তে আর তা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছেন বক্রপুচ্ছের দেহ। ওদের দিকে তাকিয়ে শ্যামশ্রী ব্যাখ্যা করে দিলেন পদ্ধতিটা। - “বক্রপুচ্ছের শরীরের এতটা বেশি পুড়ে গেছে যে তাকে সারিয়ে তোলা অসম্ভব। এই সঞ্জীবন-বন্ধনী না দিলে ও মরেই যেত। এই বন্ধনীতে অনেক আঘাত সেরে যায়, কারণ ঐশিকদের বা সমরোত্তমদের মায়ামিশ্রিত রক্ত দিয়ে তৈরি হয় এই বন্ধনী। এখন থেকে এই বন্ধনীই ওর ত্বকের কাজ করবে; এর মধ্যে ওর প্রাণটাকে আটকে রাখবে।”

পর্বত চোখ মুছে বলল, “তার মানে ও বেঁচে থাকবে, তাই তো?”

বজ্রধর ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “সঞ্জীবন-বন্ধনীতে আবৃত মানুষ হোক বা অন্য জন্তু - সে যে বেঁচে থাকে এবং পুরোপুরি কর্মক্ষম থাকে, তার উদাহরণ কি তুমি ভুলে গেছ, পর্বত?”

হঠাৎ চমকে উঠে পর্বত বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ, অধিনায়ক বজ্রধর। আমি দুঃখিত, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সমরোত্তম শ্যামশ্রী, রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, আমি দুঃখিত।”

শ্যামশ্রীর মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু রক্ষোবৈদ্য মৃদু হেসে বললেন, “শোকে, দুঃখে, প্রিয়জনের কষ্টে আমরা অনেক জানা বিষয়ও ভুলে যাই, পর্বত। ও নিয়ে তুমি লজ্জিত হয়ো না।”

বজ্রধরের রক্তে ভেজা সঞ্জীবন-বন্ধনী একটার পর একটা বক্রপুচ্ছের গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছেন রক্ষোবৈদ্য। তাঁর প্রতি অদ্ভুত একটা শ্রদ্ধা জাগল অভীর মনে। কী নিপুণভাবে, কী মমত্বের সঙ্গে মরণাপন্ন কুকুরটার সেবা করছেন তিনি!

আর অধিনায়ক বজ্রধর! গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে ক্ষতস্থান থেকে। এ তো শুধু রক্ত নয়, বজ্রধর জানেন তিনি তাঁর জীবনীশক্তির বেশ কিছুটা অংশ দান করে দিচ্ছেন কুকুরটাকে। যত সময় যাচ্ছে, অভী ততই বুঝতে পারছে, বজ্রধরকে বাইরে থেকে যতই কঠোর নিয়মনিষ্ঠ দেখাক, অন্তরটা ওঁর কোমল।

হঠাৎ তার মনে হল, “এর আগে কাকে রক্ত দিয়েছিলেন বজ্রধর?”

এই মুহূর্তে অবশ্য সে প্রশ্ন কাউকে করা যায় না। কুকুরটার গায়ে বন্ধনী জড়ানো শেষ হয়েছে। রক্ষোবৈদ্য ব্যস্তভাবে বললেন, “অধিনায়ক বজ্রধর, আপনার হাতের রক্তপাত এক্ষুনি বন্ধ করতে হবে। অনেকটা রক্ত বেরিয়ে গেছে, আর বেরোতে দেওয়া ঠিক নয়।”

বজ্রধর তাঁর হাতে ক্ষতস্থানের ওপর আবার চেপে ধরলেন তাঁর দণ্ড - এক ঝলক আগুন বেরিয়ে এসে পুড়িয়ে দিল জায়গাটাকে। মুখ বিকৃত করে তিনি যন্ত্রণা সহ্য করলেন। রক্ষোবৈদ্য একটু রাগত কণ্ঠে বললেন, “আপনি

মনুষ্য সন্তান, কিন্তু তাও আপনার কিছু কিছু ব্যবহার রাক্ষসদের মতো। আমি তো আপনাকে রক্ত বন্ধ করার ওষুধ দিতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই ছাঁকা দিয়ে জায়গাটা পুড়িয়ে নিজেকে এরকম যন্ত্রণা দিয়ে রক্ত বন্ধ করার কি কোনো দরকার ছিল?”

বজ্রধর হাসলেন, “এইটুকু যন্ত্রণা সহ্য করার অভ্যাস থাকা ভালো, রক্ষোবৈদ্য মহোদয়।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “এবার আমার ধর্ম আমাকে পালন করতে দিন। পর্বত, তুমি ধরো অধিনায়ক বজ্রধরকে। সমরোত্তম শ্যামশ্রী, আপনি নিন বক্রপুচ্ছকে। দু’জনকেই নিয়ে চলুন আমার সেবাকক্ষে। বক্রপুচ্ছকে আপাতত ওখানেই থাকতে হবে। আর অধিনায়ক বজ্রধর, আপনাকে ওখানেই কিছু প্রাথমিক ওষুধ দিতে হবে।”

বজ্রধর হাসলেন। - “চলুন। চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে আপনার ওপরে কথা বলবে, এরকম লোক সমরগরিমায় আজ অবধি জন্মায়নি।”

শিক্ষার্থীরা সরে গিয়ে ওঁদের বেরোনোর জায়গা করে দিল। শ্যামশ্রী কুকুরটাকে তুলে নিলেন কোলে। বজ্রধরকে ধরবার দরকার হল না; পর্বত তবু তাঁর পাশে পাশে চলতে লাগল। বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে ওঁদের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল।

লীনা আর নিধি অভীকে ইশারা করল চলে আসতে, কিন্তু অভী গেল না; বলল, “তোমরা এগোও। আমি আসছি একটু পরে।”

ওরা দু’জন আর কিছু না বলে চলে গেল। ওরা বুঝতে পেরেছিল, অভী নীলাভ্রর ছবিটা আবার দেখতে চাইছে সবার চোখের আড়ালে।

অভী এসে দাঁড়াল বাবার ছবির সামনে। নীলাভ্র পড়ে যাচ্ছে নরকগহ্বরে। অভী তাকিয়ে রইল স্থিরদৃষ্টিতে।

“কেন এরকম করলে তুমি?” ফিশফিশ করে বলল সে।

তার মনের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠল সেই স্বপ্নের দৃশ্যটা। নীলাভ্র নয়, সে-ই পড়ে যাচ্ছে নরকগহ্বরের অগ্নিকূপের মধ্যে। অজানা এক আতঙ্কে শিউরে উঠল অভী।

“বিশ্বাসঘাতক বাপটাকে দেখে মনে খুব আনন্দ হচ্ছে, না?”

পেছন থেকে আসা কণ্ঠস্বরটা শুনেই অভী বুঝে গিয়েছিল কে এসেছে। যত রাগ, যত ঘৃণা সে কাল থেকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, সব যেন বন্যার মতো প্রাবিত করে ফেলল তার সর্বসত্তা।

তরুণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বলল, “সেদিনের ঠান্ডাটা বোধহয় ঠিক জমেনি, না? আর একবার মনে করিয়ে দিতে হবে?”

তরুণ একা আসেনি, তার সঙ্গে জনা তিনেক ছেলে আছে – মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, অভীর প্রতি খুব একটা ভালোবাসা তাদের নেই। তরুণ বলল, “বিশ্বাসঘাতকের ছেলের মুখে বড়ো বড়ো কথা মানায় না।”

অভী দু’হাত মুঠো করল। হাত আবার হিমশীতল হয়ে যাচ্ছে তার। নিজের মনে মনেই সে বুঝতে পারছে, তরুণ যদি এক্ষুনি না পালায়, তাহলে ওর বিপদ

আছে।

নিজেকে বোঝান অতী। না, হিমকুশলতা সে প্রয়োগ করবে না। তরুণ লড়াই করতে এসেছে, ওর সঙ্গে অস্ত্র নিয়েই লড়াই করবে সে।

এক পা এগিয়ে গেল সে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, “এই কক্ষেরই সেদিন রাতে অতগুলো রাক্ষসকে কচুকাটা করেছিলাম। তোমার সাহস আছে তো, তরুণ, আমার অস্ত্রের সামনে দাঁড়ানোর?”

তরুণ বলল, “কার কতটা সাহস আছে, হয়ে যাক পরীক্ষা।”

ঠিক তখনই কক্ষে এসে ঢুকল নিধি আর লীনা। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে উন্মুক্ত অস্ত্র হাতে এগিয়ে এল তারাও।

লীনা চিৎকার করে বলল, “তরুণ, অতীকে একা ভেবো না। আমরা সবাই আছি এখানে; সবার সঙ্গে পারবে তো?”

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল তরুণ। - “এই তাহলে তোমার বীরত্ব, অতী? মেয়েদের আঁচলের পেছনে লুকোতে লজ্জা করে না?”

অতী বলল, “লীনা, নিধি, তোমরা মাঝখানে এসো না। এই অপদার্থটাকে আমিই সামলে নিতে পারব। একবার ‘দয়া করো’ বলে যার কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, তার সঙ্গে আবার দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাইছে, হতভাগা নির্লজ্জ!”

হাত বাড়াতেই কাচের বাক্সের আবরণ মিলিয়ে গেল; তার হাতে উঠে এল চন্দ্রহাস, জ্বলে উঠল স্নিগ্ধ সাদা আলোয়। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল লীনা আর নিধি; তরুণের সঙ্গীরা ভয় পেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

চন্দ্রহাস হাতে নিয়ে একবার ঘোরালো অতী। মনে হল, একটা আলোর বৃত্ত আঁকা হয়ে গেল ওদের সামনে। অতী এবার হাসল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। - “কী মনে হয়, তরুণ? এই দৈব-অস্ত্রের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা আছে তোমার?”

তরুণের চোখে এতক্ষণে ভয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু অতী হঠাৎ ভীষণ অবাক হয়ে গেল।

চন্দ্রহাসের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে যাচ্ছে!

এতক্ষণ সাদা ঝকঝকে আলো বেরিয়ে আসছিল তার বন্ধিম ফলকের গা থেকে; সহসা সে আলো মলিন হতে হতে নিভে গেল। অতীর মনে হতে লাগল, চন্দ্রহাস হঠাৎ কী ভীষণ ভারী হয়ে উঠেছে; আর যেন সে বইতে পারছে না এর ভার। মনে হল, তার হাতসহ তার পুরো শরীরটাকে যেন টেনে মাটিতে নামিয়ে দিতে চাইছে তরবারিটা।

কপালে ঘাম ফুটে উঠল তার। চন্দ্রহাস তার হাত থেকে সশব্দে পড়ে গেল মাটিতে।

অতী বুঝতে পারল, সে আর তুলতে পারছে না শিবের তরবারি।

তরুণ হা হা করে হেসে উঠল। - “বাহবা, কাপুরুষনন্দন! বোঝা গেছে তোমার বীরত্ব।”

তরবারি হাতে এগিয়ে এল সে; অস্ত্র ঠেকাল অতীর গলায়। অতী ত্রুদ্র চোখে তাকিয়ে রইল।

“থামো!”

পেছন থেকে শোনা গেল অধিনায়ক বজ্রধরের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। কখন যেন এসে ঢুকেছেন তিনি সংগ্রহশালায়; দেখছেন সব কিছু।

তরুণ অস্ত্র সরিয়ে নিল। অভী তখনও রাগে ফুঁসছে।

বজ্রধরও রেগেছেন মারাত্মক। প্রচণ্ড জ্রকুটি করে তিনি বললেন, “সংগ্রহশালার মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ! ভেবেছ কী তোমরা? এখানে কত যুগের সঞ্চিওত অমূল্য সব সম্পদ আছে, জানো না তোমরা?”

নিধি বলে উঠল, “ও-ই শুরু করেছিল প্রথমে, অধিনায়ক বজ্রধর।”

বজ্রধর বললেন, “আমি জানি। আর এও জানি, আয়তনের নিয়ম অনুযায়ী, কেউ যদি কাউকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে, তাহলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তরুণ অভীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ডেকেছে, অভীকে সেই আহ্বান হয় গ্রহণ করতে হবে, নয়তো পরাজয় স্বীকার করে নিতে হবে।”

“পরাজয় স্বীকার?” অভী চাপা গর্জন করে উঠল। - “কক্ষনও নয়।”

“অতি উত্তম। তরুণের হাতে তরবারি আছে। অভী, তুমিও একটি তরবারি নিয়ে এসো।”

চন্দ্রহাসের দিকে একবার তাকিয়ে নিল অভী। না, ও অস্ত্র আর কাজ করছে না তার হাতে। কেমন বিবর্ণ লাগছে তরবারিটাকে এখন।

পেছনে তাকাল অভী, তারপর বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই কাঠের বেদির ওপর রাখা তরবারিটাকে টেনে নিল।

বিশ্বাসহস্তার অসি!

তরুণ হেসে উঠল। - “একদম ঠিক অস্ত্র নিয়েছ। কাপুরুষ বাপের অস্ত্র কাপুরুষ ছেলের হাতে।”

অভী বুঝতে পারল, তার শরীর জুড়ে বয়ে চলেছে ঠান্ডা ঘৃণার তীব্র স্রোত। সেই স্রোতে বিশ্বাসহস্তার অসির ফলকটা যেন নীলচে বর্ণ ধারণ করল। বজ্রধর বললেন, “ভেতরে নয়, বাইরে এসো।”

ওরা দু’জন বেরিয়ে এসে দাঁড়াল অলিন্দে; পেছন পেছন এসে পৌঁছোল সবাই। সমরোত্তম শ্যামশ্রী কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে আসছিলেন এদিকেই। দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে তিনি বজ্রধরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এ কী কাণ্ড?”

বজ্রধর বললেন, “তরুণের আহ্বানে এদের দু’জনের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ।”

শ্যামশ্রীর শুধু চোখদুটি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু শুধু সেইটুকু দেখেই বোঝা গেল, ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন তিনি।

“নিজেদের মধ্যে লড়াই করার এই কি উপযুক্ত সময়?” রাগত কণ্ঠে বললেন তিনি।

বজ্রধর বললেন, “একেবারেই নয়। কিন্তু নিয়ম নিয়মই; সবাইকেই তা মানতে হবে। দ্বন্দ্বযুদ্ধ আহ্বান করা যখন হয়ে গেছে, তখন যুদ্ধ করতেই হবে।”

তাঁর ইঙ্গিতে দু’জনে দাঁড়াল মুখোমুখি। অভী বুঝতে পারল, বিশ্বাসহস্তার অসি সূক্ষ্মভাবে স্পন্দিত হচ্ছে তার হাতে - যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তার মনে হল, অস্ত্রটার ভেতর পর্যন্ত যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে তার শীতল ঘৃণার অনুভূতি। বিশ্বাসহস্তার অসি যেন আর শুধু সাধারণ একটা অস্ত্র নয়, এ যেন তার হাতেরই

একটা অংশ হয়ে উঠছে।

তরুণ প্রথম আঘাত হানল। নিজের তরবারি উঁচু করে ধরে সে আঘাত আটকে দিল অভী। আর একই সঙ্গে নিজের তরবারির ফলায় চালনা করল তীব্র, তীক্ষ্ণ, হিমশীতল ঘৃণার স্রোত। সে অনুভব করল, তার অস্ত্র বেয়ে ওই স্রোত চলে যাচ্ছে তরুণের তরবারিতে, সেখান থেকে তরুণের হাতে। ভেতর থেকে উঠে আসা সেই প্রবল ঘৃণার তরঙ্গকে আটকানোর চেষ্টাই করল না অভী।

পরমুহূর্তেই দেখা গেল, বিশ্বাসহস্তার অসি ঠান্ডায় জমিয়ে দিয়েছে তরুণের অস্ত্রসহ হাতকে। আর সেই অস্ত্র থেকে প্রবাহিত হিমতরঙ্গের আঘাতে জমে পাথরের মতো হয়ে গেছে তরুণ। তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে, চোখের মণি স্থির হয়ে গেছে, মুখ হাঁ অবস্থায় আটকে গেছে, চোখে বিস্ময় আর যন্ত্রণার ছাপ।

শ্যামশ্রী চিৎকার করে উঠলেন, “অভী, থামো এক্ষুনি।”

সে-কথা অভীর কানে গেল না। আজ তার মনে হচ্ছে, এই অপদার্থ ছেলেটাকে শেষ করে ফেলতে পারলে তার মনের জ্বালা শান্ত হয়। তাকে, তার বাবাকে ‘কাপুরুষ’ বলে, ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে, এত স্পর্ধা ওর!

শ্যামশ্রী হাত নাড়লেন। অভীর হাত থেকে ছিটকে পড়ল বিশ্বাসহস্তার অসি।

অভী লুটিয়ে পড়ল মাটিতে; হাঁপাতে লাগল ভীষণভাবে। এই হিমস্রোত যেন তাকে এতক্ষণ অন্ধ করে রেখেছিল। সে বুঝতে পারল, ওই বিকট ঘৃণাবোধ সরে যাচ্ছে তার মন থেকে, তার জায়গায় ফিরে আসছে বাস্তববুদ্ধি। মাটিতে বসে মুখ নীচু করে রইল সে – অপরিসীম লজ্জাবোধ যেন ঘিরে ধরল তাকে। হাতগুলো আবার ফিরে আসছে স্বাভাবিক উষ্ণতায়। মাথা ঝিমঝিম করছে ভীষণ।

শ্যামশ্রী তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, “তোমাকে আগেও বলেছি, নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে তোমাকে। এই প্রবল শক্তি নিজের মধ্য দিয়ে চালনা করে তুমি নিজেকেই দুর্বল করে তুলছ। মনে রেখো, তুমি যখন শক্তি প্রয়োগ করবে, তখন সেই শক্তি যেন তোমাকে না চালায়; তোমাকেই হতে হবে তার চালিকাশক্তি।”

অভী অক্ষুটে বলল, “আমি... আমি বুঝতে পারিনি, কীভাবে নিজে থেকেই হয়ে গেল!”

শ্যামশ্রী বললেন, “ঘৃণা ভীষণ শক্তিশালী আবেগ, জানো তো। যদি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারো, তাহলে সে তোমার সব মানবিক গুণকে শেষ করে দিতে পারে, তোমাকে জন্তুরও অধম করে তুলতে পারে। ঘৃণা মনে রেখে যদি হিমকুশলতা প্রয়োগ করো, তাহলে তুমি সকলের ক্ষতিই শুধু করবে। আমরা নিজেদের যা ভাবি, আমরা তাই হয়ে যাই, এ-কথা কক্ষণও ভুলো না।”

বজ্রধর বললেন, “এবার তরুণকে হিমস্তব্ধতা থেকে মুক্ত করো।”

তরুণ তখনও দাঁড়িয়ে ছিল কাঠের মতো। অভী তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল,

হাত রাখল তার গায়ে – চেষ্টা করল বরফ গলিয়ে দিতে। কিন্তু কোনো ফল হল না। তরুণ আগের মতোই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সমরোত্তমদের দিকে ফিরে অভী কাতরস্বরে বলল, “আমি পারছি না!”

বজ্রধরের ইঙ্গিতে শ্যামশ্রী এগিয়ে এলেন, অভীর হাত ধরে তরুণের গায়ে বিশেষভাবে বুলিয়ে দিতে দিতে ওকে শিখিয়ে দিলেন কীভাবে হাতের তালুতে উত্তাপ আনার মায়া প্রয়োগ করতে হয়। অভী তরুণের শরীরে তাপ দিতে লাগল নিজের হাত থেকে। কিছুক্ষণ পরে তরুণের চোখে পলক পড়ল।

বজ্রধর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অভীর দিকে তাকালেন; বললেন, “আমি যা বলছি, মন দিয়ে শোনো, অভী। তোমার মনের অবস্থা এখন ভালো নয়, আমরা সকলেই জানি, এবং সেজন্য তোমার প্রতি আমাদের সকলের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু এটা তোমাকে বুঝতে হবে যে, তোমার মন খারাপ, তাতে বিশ্বজগতের কিছু যায় আসে না। মন ভালো নেই, তুমি যন্ত্রণার মধ্যে আছ – এসবই সত্যি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তুমি অন্যদের আঘাত করে বেড়াতে পারো। তোমার মন যেন তোমার দাস হয়, তুমি মনের দাস নও। মন আছে মানেই সে কখনও ভালো হবে, কখনও খারাপ হবে। সেই মনের আবেগ যেন তোমার বিচারবুদ্ধিকে কখনও না আচ্ছন্ন করে ফেলে।”

অভী মাথা নাড়ল। তরুণ ততক্ষণে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। বজ্রধর বললেন, “তরুণ, সতীর্থদের সম্মান করতে শেখো। যদি ঘৃণা করো, তাহলে প্রতিদানে ঘৃণাই পাবে, এ-কথা মনে রেখো। ভালো না বাসলে কোনোদিন কি ভালোবাসা পাওয়া যায়?”

তরুণ নির্বাক হয়ে মাথা নীচু করে রইল। কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দিলেন বজ্রধর রক্ষাবৈদ্যের কাছে সেবাকক্ষে।

অভী সসংকোচে বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?”

বজ্রধর বললেন, “করো।”

অভী বলল, “আজ আমি একটু আগে তরুণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য চন্দ্রহাস তুলে নিয়েছিলাম হাতে। কিন্তু তারপরেই চন্দ্রহাস কেমন যেন নিস্প্রাণ হয়ে গেল আমার হাতের মধ্যে। এত ভারী হয়ে গেল যে আমার হাত থেকেই পড়ে গেল। এমনটা কেন হল? অথচ এই চন্দ্রহাস নিয়েই তো আমি সেই রাতে অতগুলো রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম!”

বজ্রধর বললেন, “তার একটাই কারণ বলে আমার মনে হয়। চন্দ্রহাস স্বয়ং শিবের তরবারি। ওই অস্ত্র ব্যবহার করা যায় শুধু মহৎ কাজে – যেমন সেদিন আয়তনকে রক্ষার কাজে সে তোমার হাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। এহেন অসামান্য দৈব-অস্ত্রকে তুমি নিজের ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে ব্যবহার করতে চেয়েছিলে বলেই সম্ভবত সে আজ তোমার হাতে ভারী হয়ে উঠেছিল।”

বজ্রধর ওখান থেকে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন, এমন সময় দূর থেকে আহ্বান ভেসে এল, “অধিনায়ক বজ্রধর।”

ওরা সবাই দেখল, অলিন্দপথে আসছেন সহকারী নিয়ামক নারদ; তাঁর সঙ্গে আছে মেঘবর্ণ। মুখের ভাব দু’জনেরই অত্যন্ত গম্ভীর।

লীনা আর নিধি ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে অভীর পাশে। নিধি ফিশফিশ করে বলল, “আমার মন বলছে, নিয়ামক বিনীতেশ আবার একটা কোনো ঝামেলা বাধিয়েছেন।”

লীনাও ফিশফিশ করে বলল, “তোমার এই ‘মন বলছে’গুলো বড়ো বাজে, নিধি – প্রায়শই দেখি ওগুলো সত্যি হয়ে যায়।”

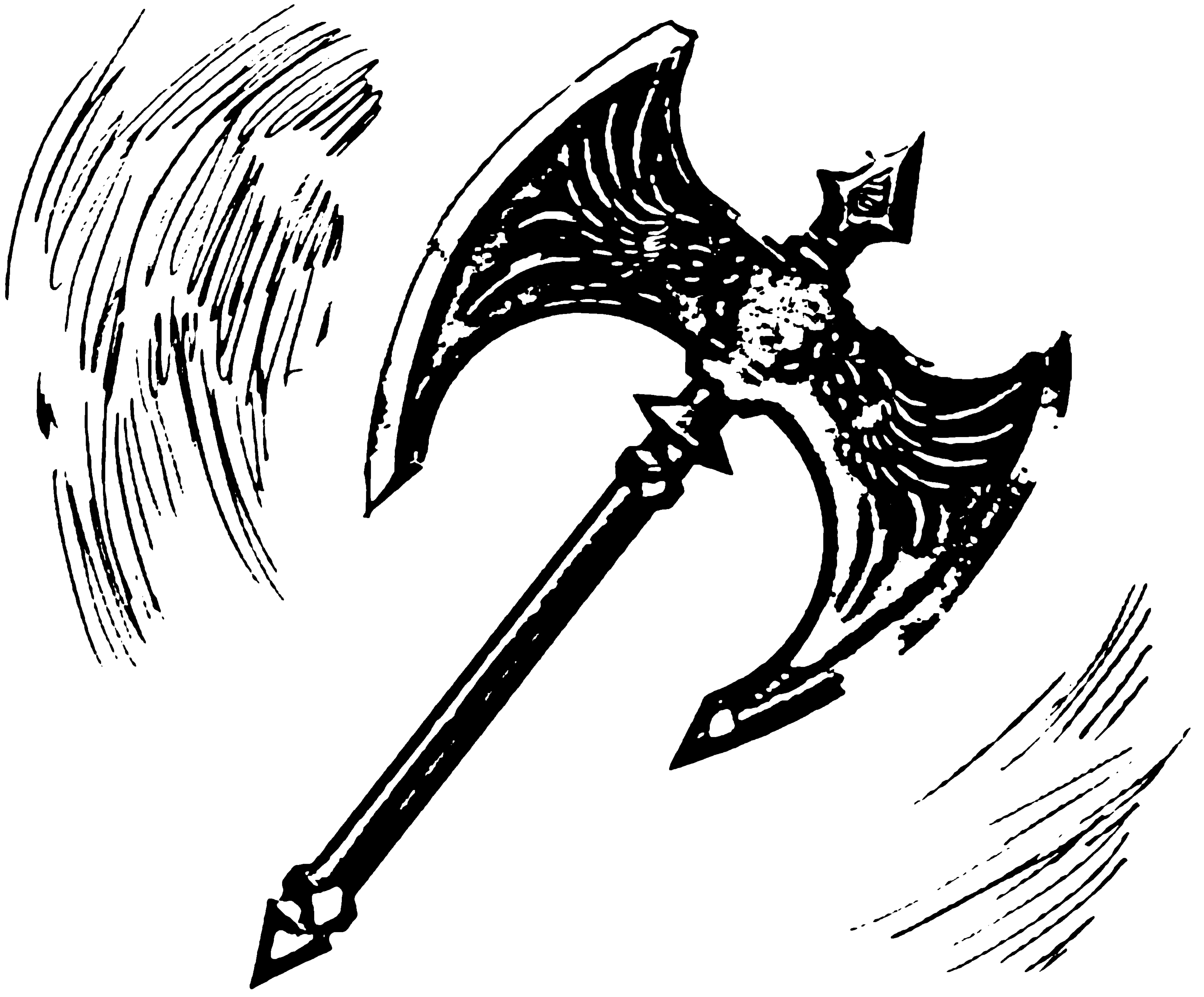
ওঁরা এসে দাঁড়ালেন। বজ্রধর বললেন, “খারাপ খবর মনে হচ্ছে? আমাদের নিয়ামক মহোদয়ের খবর নাকি? ওঁর কোনো সংবাদ থাকলেই দেখেছি আপনার মুখটা এইরকম লাল হয়ে যায়, সহকারী নিয়ামক মহোদয়।”

মেঘবর্ণ একটু হাসল। নারদ বললেন, “আপনার অনুমান যথার্থ, অধিনায়ক বজ্রধর। নিয়ামক মহোদয় আসছেন এখানে। আপনাদের সবার সঙ্গে উনি কথা বলতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।”

“কী ব্যাপার বলুন তো?”

“কী আর ব্যাপার, সেই পুরোনো ‘শান্তি নয়, যুদ্ধ চাই’। তবে এবার উনি ভীষণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখলাম। বক্রপুচ্ছের গায়ে রাক্ষসদের পাঠানো বার্তা তাঁর কানেও গেছে। আর তার পর থেকেই উনি অস্থির হয়ে পড়েছেন মাল্যপর্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করতে। আজ দেখবেন, ওঁকে সামলানো মুশকিল হবে।”

বজ্রধরের ভ্রু আবার কুঁচকে গেল। অত্যন্ত গম্ভীরকণ্ঠে তিনি বললেন, “হুম, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না।”



।। মোড়শ অধ্যায় ।।

বিশ্বাসঘাতক

আজ সত্যিই নিয়ামক বিনীতেশকে অপ্রতিরোধ্য লাগছিল।

সংগ্রহশালায় তিনি ছাড়াও সমরোত্তমরা সবাই, সহকারী নিয়ামক নারদ আর বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী এসে উপস্থিত হয়েছে। বিনীতেশ প্রত্যাশামতোই গুরু করলেন অভিযোগ দিয়ে।

“পর্বতের কুকুরের গায়ে মায়াবিদ্যা প্রয়োগ করে পাঠানো ছমকির খবর আমি পেয়েছি। আপনারা দেননি, দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করেননি, কিন্তু খবর আমি পেয়েছি। রাক্ষসরা আমাদের আয়তন থেকে একজনকে – হোক না সে কুকুর – তুলে নিয়ে গেল, তার গায়ে আগুন লাগিয়ে দিল, তারপরেও আপনারা বলবেন, আপনারা আয়তনকে যথাযথ সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ নন?”

কক্ষের দরজায় টোকা দিল কেউ। শ্যামশ্রী দরজা খুলে দিলেন। চঞ্চল এসে ঢুকল ভেতরে। বজ্রধরের ইঙ্গিতে সে বসে পড়ল একপাশে। অভী দেখল, চঞ্চলের মুখ গম্ভীর। তার মানে, আজও কিছু খারাপ খবর এনেছে সে। ওদিকে নিয়ামক বলে যাচ্ছেন একটানা।

“আমি অনেকদিন থেকেই বলে চলেছি, যুদ্ধ আসন্ন, তাই আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়াই ভালো। কিন্তু আপনারা সমরোত্তমরা কেবল নানা অজুহাতে যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চাইছেন। কেন? কীসের স্বার্থে? কবে চেতনা হবে আপনাদের? রাক্ষসরা আয়তনের একজনকে খুন করে গেল, আপনারা চুপ করে রইলেন। রাক্ষসরা সংগ্রহশালায় আক্রমণ করল রাতের বেলা, আপনারা চুপ করে রইলেন।

আজ্র আয়তনের একজনকে অপহরণ করে গায়ে আগুন লাগিয়ে হুমকি দিয়ে পাঠাল তারা, আপনারা এখনও চুপ করে আছেন। বলি, তলোয়ারগুলো কি শুধু পোশাকের শোভা বাড়ানোর জন্য বহন করেন আপনারা?”

সমরোত্তমরা চুপ করে রইলেন। অতী বুঝতে পারছিল, বক্রপুচ্ছের ঘটনাটা সবাইকেই একটু বিহ্বল করে দিয়ে গেছে।

বজ্রধর বললেন, “আপনার যুক্তির সারবস্তা আমরা অনুধাবন করছি, মাননীয় নিয়ামক মহোদয়। আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কিছু গলদ নিশ্চয়ই ছিল, যার জন্য শত্রু এইভাবে আমাদের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়তে পেরেছিল। কিন্তু একটা কথা, শর্বরকে মুক্ত করতে না পারলে রাক্ষসরা কোনোমতেই যুদ্ধে নামতে পারবে না। আর শর্বরকে মুক্ত করাটা একান্তই অসম্ভব ব্যাপার।”

নিয়ামক বিনীতেশ বললেন, “আপনার কণ্ঠস্বর নিজের কানেও একটু বেশিই আত্মতৃপ্ত শোনাচ্ছে না কি, অধিনায়ক বজ্রধর? আয়তনের সুরক্ষা নিয়েও তো আপনি বেশ নিশ্চিতই ছিলেন। রাক্ষসরা কি চোখে আঙুল দিয়ে তার ফাঁকগুলো দেখিয়ে দিয়ে গেল না? শর্বরের বন্দিশালার সুরক্ষার ব্যাপারটাও যে এইরকম বজ্রআঁটনি ফসকাগেরো নয়, তার কি নিশ্চয়তা আছে?”

বজ্রধর শাস্তকণ্ঠে বললেন, “না, তা যে নয়, সে বিষয়ে আমি সমরোত্তম মেঘবর্ণকে বলতে অনুরোধ করছি। শর্বরের বন্দিশালার সম্পূর্ণ বিবরণ এখনও পর্যন্ত সমরোত্তমরা ছাড়া কেউই জানেন না। তাই এত দুর্চিন্তার জন্ম হচ্ছে আপনাদের মনে। মেঘবর্ণ, শর্বর কোথায় কীভাবে বন্দি আছে, অনুগ্রহ করে সেটা আমাদের নিয়ামক মহোদয়কে শুনিয়ে নিশ্চিত করে দাও।”

মেঘবর্ণ উঠে দাঁড়াল। “শুনুন তবে। গতবার শর্বর যখন আক্রমণ করেছিল, তখন স্বয়ং ঐশিকশ্রেষ্ঠ তাকে বন্দি করে এসেছিলেন মাল্যপর্বতের অচলগুহায়। অচলগুহা সম্বন্ধে আপনাদের কারও ধারণা নেই বলেই এত ভয় পাচ্ছেন আপনারা। অচলগুহা মাল্যপর্বতের মধ্যে এক অতিদুর্গম গোপন স্থান। এর ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে চাইলেও সহজে এখানে যাওয়া যায় না। গুহার ভেতরটা বিশাল, আমাদের এই সংগ্রহশালার চেয়েও অনেকটা বড়। সেইখানে বন্দি আছে শর্বর।”

নারদ বললেন, “যত দুর্গমই হোক, রাক্ষসদের পক্ষে সেখানে গিয়ে শর্বরকে মুক্ত করা অসম্ভব নিশ্চয়ই নয়।”

মেঘবর্ণ বলল, “সেই কথাই বলছি এবার। ঐশিকশ্রেষ্ঠ মায়াবন্ধনী দিয়ে রেখেছেন গুহার চারপাশে। রাক্ষসদের পক্ষে দেবমায়ার তৈরি সে বন্ধনী ভেদ করে ভেতরে ঢোকা খুবই কঠিন। গুহার মধ্যে একটি হ্রদ আছে। সেই হ্রদ থেকেই বেরিয়েছে মৃত দেবতার নদী। পাহাড়ের গা বেয়ে সে নদী বয়ে গেছে আমাদের আয়তন থেকে একটু দূরের জমির ওপর দিয়েই, সবাই জানেন। শর্বরকে বরুণপাশে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছেন ঐশিকশ্রেষ্ঠ সেই হ্রদের জলের ওপরে। সে মহাশক্তিশালী রাক্ষস – তাই ঝুঁকি নেননি তিনি। তাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে গুহার ভেতরের দেয়াল থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা পাথর থেকে। হ্রদের জলের ওপর বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে সে। নিতান্তই অসম্ভব, তবুও যদি

সে কোনোভাবে বরুণপাশের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতেও পারে, তাহলে সে সোজা এসে পড়বে মৃত দেবতার নদীর উৎস ওই হ্রদে। ওই জলে পড়লে সে দেবতা, মানুষ, রাক্ষস যেই হোক, তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা কারও নেই।”

নিয়ামক বিনীতেশ অপ্রসন্নমুখে বসে রইলেন। যেন শর্বরের বন্দিশালার নিরাপত্তা এতটা উন্নতমানের না হলেই তিনি খুশি হতেন। চুপ করে কিছু একটা ভাবতে লাগলেন তিনি – সম্ভবত যুদ্ধের সমর্থনে পরবর্তী বক্তব্য কী হতে পারে, সেই কথা।

তার সে বক্তব্যের উপাদানের আয়োজন করে দিল চঞ্চল। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর, আমার কিছু বক্তব্য আছে।”

বজ্রধর বললেন, “বলো।”

চঞ্চল বলল, “আমি সংবাদ পেয়েছি, মাল্যপর্বতের রাক্ষস এলাকা থেকে বিরাট সেনাদল যাত্রা করেছে অচলগুহার উদ্দেশে। শর্বরকে যে-কোনো মূল্যে বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। এই দলে বেশিরভাগ বিমোহকরাই আছে; সঙ্গে অল্প কিছু পত্রতিলক আর কিছু অর্ধরাক্ষস আছে। উর্গায়ু এদের নেতা। সে নিশ্চিত করে তার অনুগামীদের বলেছে, শর্বরকে মুক্ত করার উপায় তার আয়ত্তে চলে এসেছে।”

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে সমরোত্তমাদের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। নিজের উরুতে এক থাপ্পড় মেরে উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন নিয়ামক বিনীতেশ; চোঁচিয়ে বললেন, “হল তো? এবার আপনাদের বিশ্বাস হল তো? আরও ভরসা করে বসে থাকুন রাক্ষসদের ভালোমানুষির ওপর! এরা একটাই ভাষা বোঝে – সে হল মারের বদলে মারের ভাষা। আর আপনারা এতদিন শাস্তির বাণী শুনিয়ে এদের মাথায় চড়তে দিয়েছেন। বলুন না! যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো শান্তিপূর্ণ উপায় যদি এখনও থাকে, এই বেলা সে-কথা বলে ফেলুন, অধিনায়ক বজ্রধর! আমি শুনতে খুব আগ্রহ বোধ করছি।”

এই বিদ্রূপের উত্তর না দিয়ে বজ্রধর বললেন, “নিয়ামক মহোদয় ঠিক কথাই বলেছেন। যুদ্ধ এবার অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে বলেই আমার ধারণা। উর্গায়ু অতি ধূর্ত রাক্ষস; বন্ধনমুক্তির একটা কোনো উপায় তার কাছে না থাকলে রাক্ষসদের শুধু শুধু খেপিয়ে একেবারে শর্বরের বন্দিশালা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পাত্র সে নয়। কিন্তু চঞ্চল, উর্গায়ু কীভাবে কাজটা করতে পারে, সে-বিষয়ে কোনো সংবাদ আছে তোমার কাছে?”

চঞ্চল চিন্তিত মুখে বলল, “না অধিনায়ক বজ্রধর। তবে আমার ধারণা, ওরা কোনো দৈব-অস্ত্র চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। এছাড়া আর কিছু তো ভেবে পাচ্ছি না।”

বজ্রধর বললেন, “সে নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু খবরটা তুমি এনেছ বলেই আমি কথাটা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার করছি, চঞ্চল। যাই ঘটুক, রক্তলোলুপ হিংস্র শর্বরকে ফিরে আসতে দেওয়া যাবে না। মানুষ, অর্ধরাক্ষস কেউ বাঁচবে না তাহলে।”

নিয়ামক বিনীতেশ গর্জন করে বললেন, “আমি চাই, ওদের গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক।”

বজ্রধর বললেন, “আগামীকালের মধ্যেই আমি একটা যোদ্ধাদের দল তৈরি করছি। তারা মাল্যপর্বতের অচলগুহায় গিয়ে দেখে আসবে শর্বরের অবস্থা, আর রাক্ষসদের বাহিনীর বর্তমান খবরও নিয়ে আসবে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “অধিনায়ক বজ্রধর, বরুণপাশ যে রাক্ষসদের পক্ষে কাটা অসম্ভব, আপনিও জানেন, আমিও জানি। উর্ণায়ু নিশ্চয়ই এত বোকা নয় যে সে বিষয়টা জানে না। ওদের কাছে কোনো দিব্যাস্ত্রও তো নেই।”

বজ্রধর বললেন, “সেটাই আমিও ভাবছি। দিব্যাস্ত্র ছাড়া ওই দৈব-বন্ধন কেটে ফেলা কোনো মতেই সম্ভব নয়। আর উর্ণায়ু বোকা তো নয়ই, বরং সাংঘাতিক চালাক। তাহলে সে কেন দলবল নিয়ে যাচ্ছে ওখানে? কী উদ্দেশ্য তার?”

সভাভঙ্গের পর সবাই বেরিয়ে যেতে শুরু করল একে একে। লীনা আর নিধিকে অভী বলল, “তোমরা যাও, আমি মেঘবর্ণের সঙ্গে একটু কথা বলে আসছি।”

একটা কথা তার মনে অনেকক্ষণ খচখচ করছে। মেঘবর্ণই একমাত্র ব্যক্তি, যে ঠিকমতো উত্তর দিতে পারবে।

অধিনায়ক বজ্রধর এবং সমরোত্তম শ্যামশ্রী বেরিয়ে গেলেন। মেঘবর্ণ সংগ্রহশালার চাবি হাতে অপেক্ষা করছিল ঘর খালি হওয়ার। অভী এগিয়ে গেল।

“মেঘবর্ণ, একটা কথা বলব?”

সে অভীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হল। “হ্যাঁ অভী, কী হয়েছে?”

আজ সকালে তরুণের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা বলল অভী। বলল চন্দ্রহাসের অদ্ভুত আচরণের কথাও। সে বলল, “তুমি তখন ছিলে না এখানে। কিন্তু সেই রাতে তুমি তো দেখেছিলে চন্দ্রহাস কেমন জ্যান্ত হয়ে উঠেছিল। আর আজ আমি তাকে তুলতেই পারলাম না।”

মেঘবর্ণ সন্নেহে হাত রাখল তার মাথায়। “অভী, চন্দ্রহাস দেবাদিদেবের তরবারি। ওকে হাত দিয়ে স্পর্শ করার জন্যও অধিকারী হতে হয়। এ-ই তো আমরা শেখাই তোমাদের। যে-কোনো বিদ্যাকেই অর্জন করতে গেলে আগে তার অধিকারী হতে হয় – নয়তো সবাই সব কিছু শিখতে পারে না কেন? যে বিদ্যা তুমি শিখতে চাইছ, তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয়, নয়তো যতই তোমার প্রতিভা থাকুক, ওই বিদ্যার অন্তরের রূপ তোমার ভেতরে ফুটে উঠবে না। অধিনায়ক বজ্রধর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটাও ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয়, যখন তুমি চন্দ্রহাসকে আজ হাতে তুলে নিতে গিয়েছিলে, তখন তোমার মধ্যে শ্রদ্ধা ছিল না, ছিল অহংকার। আর ও তরবারি কারও অহংকার সহ্য করে না। তোমার তরবারি শিক্ষার প্রথম দিন বলেছিলাম, মনে আছে, ‘অশুদ্ধ অবস্থায় অসিকে স্পর্শ করবে না’? আজ যখন তুমি চন্দ্রহাসের মতো পবিত্র অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলে, তখন তোমার মনে ছিল তীব্র ঘৃণা – মানসিকভাবে তাই

অশুদ্ধ ছিলে তুমি।”

অভী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। মেঘবর্ণ আবার বলল, “এই দৈব অস্ত্রগুলিকে সামান্য ভেবো না - চন্দ্রহাসকে তো নয়ই। বিচিত্র সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এদের সৃষ্টি হয়েছে। ভেবে দেখো, সেদিন রাতে তুমি যখন চন্দ্রহাস তুলে নিয়েছিলে হাতে, তখন তোমার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে সুরক্ষা দেওয়া, নিজেকে রক্ষা করা। কিন্তু আজ? আজ তুমি নিজের অহং, নিজের প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করতে ব্যবহার করতে গিয়েছিলে ওই অস্ত্র। যখনই মঙ্গলের জায়গায় অমঙ্গল করতে চেয়েছ, ওকে ধারণ করেছ ঘৃণা মনে নিয়ে, ও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার কথা শ্যামশ্রী সবসময় বলেন, শুনেছ নিশ্চয়ই। এই সেই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা - নিজের আবেগকে ভালো কাজে লাগালে চন্দ্রহাস আবার তোমার কথা শুনবে, আমার ধারণা।”

অভী কিছু বলল না। আজ তার একটা বড়ো শিক্ষা লাভ হল।

মেঘবর্ণ বলল, “কী হল? কিছু বলছ না যে?”

অভীর মনে আর একটা কথা অনেকক্ষণ ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে বলল, “মেঘবর্ণ, আমার বাবাও কি এরকম ছিল? তুমি তো তার খুব কাছের বন্ধু ছিলে। বাবাও তো আমার মতো হিমকুশল ছিল; সেও কি এইরকম ঘৃণা করত সকলকে?”

মেঘবর্ণ মৃদুস্বরে বলল, “অভী, তুমি খুব ভালো ছেলে। কিন্তু তোমার বাবার মতো তুমি কোনোদিনও হতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। হিমকুশল হয়তো পরেও হয়ে উঠতে দেখব আমরা কাউকে, কিন্তু তার মতো কেউ কোনোদিন হতে পারবে না - ওরকম মানুষ একটিই তৈরি করেন ভগবান। নীলাদ্র কাউকে ঘৃণা করতেই পারত না। এই জায়গায় তোমার সঙ্গে ওর একটা পার্থক্য আমি দেখতে পাই। অবশ্য এও সত্যি, তুমি যেরকম দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেড়ে উঠেছ, তার সিকিভাগও নীলাদ্রকে কোনোদিন দেখতে হয়নি।”

অভী ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, “তাহলে আমার মধ্যে এই ঘৃণাটা কোথা থেকে আসে, মেঘবর্ণ? আমি কাউকে ঘৃণা করতে চাই না, কিন্তু কোথা থেকে আমার ভেতরে এই তীব্র ঘৃণা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে? তখন আমি যেন আর আমাতে থাকি না; হাতগুলো কী ভীষণ ঠান্ডা হয়ে যায়! সামনে যা কিছু আছে, সব ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছা করে! কেন এরকম হয় আমার সঙ্গে?”

মেঘবর্ণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর বলল, “একটা ভবিষ্যৎবাণী আমাদের সমরগরিমায় অনেককেই খুব ভয়ে ভয়ে রেখেছে। আমি মাঝে মধ্যে ভাবি, তুমিই সেই ভবিষ্যৎবাণীর মানুষটা কিনা।”

অভী বলল, “কী ভবিষ্যৎবাণী?”

মেঘবর্ণ বলল, “এখন ওসব কথা তোমার বেশি না শোনাই ভালো। তবে এইটুকু বলে রাখছি, যেদিন ওই ভবিষ্যৎবাণীর ত্রিরক্তসম্পন্ন যোদ্ধার সময় আসবে, সেদিন নাকি মৃত দেবতার নদী থেকে উঠে আসবেন সেই মৃত দেবতা - যাঁকে কেউ দেখতে পায় না, যাঁকে কেউ বুঝতে পারে না। সেদিন

ঐশিকদের অমরত্ব আর থাকবে না, সেদিন তাঁরাও মিশে যাবেন ধুলোয়। সেদিন সমরগরিমাও থাকবে কিনা, নির্ভর করবে তাঁর ইচ্ছার ওপরে। সেদিন প্রলয় হবে; নদী প্রাবিত হবে, আকাশ থেকে আগুন ঝরবে, সৃষ্টি ভেঙে পড়বে। তাই সেই যোদ্ধাকে আমরা ‘প্রলয়যোদ্ধা’ বলি, কারণ সে ঐশিকদের সমৃদ্ধির রাজত্বে ধ্বংস নিয়ে আসবে।”

অভীর মনে পড়ে গেল সেদিন রাতে নদীর তীরের সেই নীরসেনাদের কথাগুলো - “স্বয়ং প্রভু বলছেন তোমাকে তিনি দর্শন দেবেন।” দৃশ্যটা মনে হতেই গায়ে কাঁটা দিল তার।

সে বলল, “‘ত্রিরক্তসম্পন্ন যোদ্ধা’ মানে? আমি আবার ত্রিরক্তসম্পন্ন মানুষ হলাম কী করে? রক্ত আবার ক’রকমের হয়?”

মেঘবর্ণ বলল, “ওসব এখন বাদ দাও। সামনে যে বিপদ এসে পড়েছে, তার কথা ভাবো এখন। অধিনায়ক বজ্রধর কাল যুদ্ধে যাওয়ার দল তৈরি করছেন। তোমাকে বোধহয় নেবেন না।”

“সে কী?” অভীর মাথা থেকে অন্য সব চিন্তা পলকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। - “আমি তো যাবই।”

“তুমি ‘যাব’ বললে হবে? অধিনায়ক যাকে নির্বাচন করবেন, শুধু সে-ই যাবে।”

অভী অনুনয় করে বলল, “মেঘবর্ণ, তুমি ব্যবস্থা করে দাও। আমি ও-ই অচলগুহায় যেতে চাই। যুদ্ধ করার যদি দরকার হয়, আমি খুব খারাপ করব না, তুমি তো জানো। তুমি তো দেখেছ আমাকে সেদিন রাতে যুদ্ধ করতে।”

মেঘবর্ণ হেসে বলল, “সে যুদ্ধ চন্দ্রহাস তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। যাই হোক, সেটাও কম কিছু নয়। চন্দ্রহাসের যোগ্য তুমি হতে পেরেছিলে মানে তোমার মধ্যে উত্তম যোদ্ধার গুণ তো অবশ্যই আছে। ... ঠিক আছে, আমি দেখছি যদি কিছু করা যায়। একটা কথা বলে রাখি তাহলে। যদি অধিনায়ক বজ্রধরের সামনে আমার কোনো কথা তোমার অপছন্দ হয়, তাহলে আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কোরো, কেমন?”

অভী অবাক হয়ে তাকাল। মেঘবর্ণ এক চোখ টিপে একটা ইশারা করে হেসে উঠল; বলল, “চলো, চলো। সংগ্রহশালায় চাবি দিয়ে বেরোতে হবে। যা সব রাক্ষস-খোক্ষস ঘুরছে চতুর্দিকে - কেউ আবার না ভীমের গদা চুরি করতে ঢুকে পড়ে!”

হেসে উঠল অভী। বলল, “একবার চন্দ্রহাসকে দেখে নিয়েই যাচ্ছি।”

চন্দ্রহাস রাখা আছে কাচের বাক্সে। তার দেহ থেকে আবার যেন বেরিয়ে আসছে হালকা চাঁদের আলোর মতো আভা। অভী মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। এ তরবারি আজ তাকে সবার সামনে অপদস্থ করেছে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে তার চোখও খুলে দিয়ে গেছে।

চন্দ্রহাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই তার হঠাৎ খুব অস্বস্তি শুরু হল।

কী যেন একটা গুণ্ণগোল আছে এখানে। সে বুঝতে পারছে, কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটনা এখানে ঘটছে। কিন্তু সে ধরতে পারছে না কিছুতেই।

চন্দ্রহাস কাঁপছে অতি সূক্ষ্ম কম্পনে। ভীমের গদাও তাই। সবই তো ঠিক আছে মনে হচ্ছে। তাহলে তার কেন মনে হচ্ছে, এখানে সব কিছু ঠিক নেই?

মেঘবর্ণ তাড়া দিল, “নাও, এবার চলো। আবার আসবে না হয় পরে। আমাকে এখন যেতে হবে অধিনায়ক বজ্রধরের কাছে।”

অভী অস্বস্তিটা নিয়েই বেরিয়ে এল। মেঘবর্ণ সংগ্রহশালার দরজায় চাবি লাগিয়ে দিয়ে ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল। অভী ফিরে চলল মিত্রভবনে। কিন্তু মনের মধ্যে সেই অস্বস্তিটা কাঁটার মতো বিধে রইল।

যুদ্ধকালীন তৎপরতার জন্য আজও অনুশীলন বন্ধ। সারাটা দিন মিত্রভবনে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করেই কাটাল অভী। লীনা যে সকালের জড়তা কাটিয়ে আবার আগের মতো হাসিঠাট্টা করছে, দেখে ভালো লাগল তার।

মিত্রমাসিও যোগ দিলেন ওদের গল্পে। বললেন, “নিয়ামক বিনীতেশ অনেক দিন সুযোগ খুঁজছিলেন যুদ্ধ লাগানোর। আজ অধিনায়ক বজ্রধর রাজি হয়েছেন মানে উনি হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলেন।”

অভী বলল, “কিন্তু রাক্ষসরা তাদের বাহিনী নিয়ে শর্বরকে মুক্ত করতে যাচ্ছে, এটাও তো সত্য। আমরা তো হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না।”

লীনা বলল, “আজ কিন্তু তরুণটাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছ, অভী।”

অভী হাসল। - “না, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। এবার থেকে সাবধান হতে হবে।”

নিধি বলল, “দেখো বাপু, একেবারে মেরে ফেলো না যেন। অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে তাহলে।”

“ক্ষতি?” অভী অবাক হয়ে তাকাল। “তরুণ মরলে কার কী ক্ষতি হবে? মানে, আমি চাইছি না যে ও মরে যাক, কিন্তু ওর জন্য তোমার এত দয়ার কারণটা কী, নিধি?”

নিধি মুখ টিপে হাসল। - “উঁহু, তোমাকে তো ওসব বলা যাবেই না। ছাড়ো এখন ওটার কথা। বরং বলো, সমরোত্তম মেঘবর্ণের সঙ্গে কী এত কথা হল গোপনে?”

অভী বলল, “চন্দ্রহাস নিয়ে দু’চারটে কথা হল। তারপর আমার বাবার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।”

ওরা কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল। অভী বলল, “মেঘবর্ণ বাবার খুব প্রশংসা করছিল। বাবার খুব প্রিয় বন্ধু ছিল তো ও।”

মিত্রমাসি বললেন, “হ্যাঁ, ওরা দু’জন ছিল হরিহর আত্মা। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকত না। দু’জনেই খুব দিলদরিয়া ছিল; মানুষের বিপদে-আপদে ছুটে যেত সাহায্য করতে।”

বিকেলের পর অভী একটু হাঁটতে বেরোল। লীনা আর নিধি দু’জনেই দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর খুব ঘুমোচ্ছে। ওদের আর না ডেকে সে একাই বেরিয়ে পড়ল মিত্রমাসিকে বলে।

পর্বতের সঙ্গে একবার দেখা হল, কিছু কথাবার্তাও হল। পর্বত বলল, “অভী, মনে মনে প্রার্থনা করো, শর্বর যেন ফিরে না আসে। ও বড়ো খারাপ লোক - মাল্যপর্বতে থাকার সময় আমি চিনতাম ওকে।”

অভীর মনে হঠাৎ সেই দৃশ্যটা ভেসে উঠল - শর্বর তাকে লাথি মেরে ফেলে দিচ্ছে জ্বলন্ত নরকগহ্বরে। অকারণেই হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল তার।

না, এ দৃশ্যকে মনে ঠাই দেওয়া যাবে না। অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল অভী।

গল্প করতে করতে সন্ধ্যা নেমে এল। তারপর পর্বতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অভী এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

আকাশটায় কী সুন্দর নীলচে বেগুনি রং ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বল করছে পশ্চিম আকাশে। একটা লক্ষ্মীপ্যাঁচা উড়ে গেল তার মাথার ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে ডাকতে ডাকতে।

আনমনে হাঁটতে হাঁটতে অভী যে পথ দিয়ে চলেছিল, তার একটা শাখা বেঁকেছে পীতপত্রবনের দিকে, আর একটা গেছে সুদক্ষিণসারির দিকে। হঠাৎ মনে হল, পীতপত্রবনে বজ্রধরের অনুগত সেই চিতা পরিবার কেমন আছে? কেমন আছে বনবেড়ালটা, হরিণগুলো? একবার গেলে হয় ওদিকটায়, যদি ওদের কারও দেখা পাওয়া যায়।

জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু অভীর খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। বজ্রধরের সঙ্গে এসে তার এ দিকটা মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে।

কিন্তু ও কে যাচ্ছে তার সামনে সামনে?

লোকটা যে-ই হোক, তাকে দেখতে পায়নি। কে এ? এই অবেলায় এমন নিঃশব্দে চোরের মতো যাচ্ছেই বা কোথায় এই গভীর অরণ্যে? রাক্ষসদের চর নয় তো?

দ্বিধা না করে অভী পিছু নিল লোকটার। অন্ধকার নেমে আসা বিশাল সব গাছের আড়াল থেকে অবয়বটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু লোকটার হাবভাব সন্দেহজনক। সন্তর্পণে পায়ের নীচে শুকনো, হলদে পাতার আওয়াজ যথাসাধ্য বাঁচিয়ে চলছে সে। একবার থমকে গিয়ে সে পেছনে তাকাল।

অভী অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই লুকিয়ে পড়েছিল একটা বড়ো গাছের পেছনে। কিন্তু তখনই লোকটার মুখটা দেখে ফেলল সে।

তরুণ!

কোথায় যাচ্ছে ও এইরকম সঙ্গোপনে? ছায়াভবনে নাকি?

এ ব্যাটা গুপ্তচর না হয়ে যায় না!

তরুণ কিন্তু ছায়াভবনের পথ ধরল না; এগিয়ে চলল আরও পশ্চিমে। তারপর এসে দাঁড়াল একটা মোটা শালগাছের তলায়।

অভী লুকিয়ে দেখতে লাগল, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ, অপেক্ষা করছে কারও জন্যে।

তাহলে এইখানে রাক্ষসদের কেউ আসছে নিশ্চয়ই। গুপ্তচরটা ভেতরের খবর পাচার করার জন্য জায়গাটা বেছেছে ভাল।

আজ সকালেই তরুণের বলা অপমানজনক কথাগুলো মনে পড়তে লাগল অতীত। প্রচণ্ড ঘৃণা আবার যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে তার মধ্যে।

হতভাগা নিজেই একটা গুপ্তচর! আবার তার বাবাকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে! কে যেন একটা আসছে। এসে দাঁড়িয়েছে তরুণের সামনে। অতীত শুনতে পেল তরুণের কথাগুলো – “কাল আয়তন থেকে একটা দল যাচ্ছে মাল্যপর্বতে। তাই আজ একবার...”

আর শোনার দরকার নেই। গুপ্তচর তরুণ তাদের ভেতরের খবর ফাঁস করে দিচ্ছে রাক্ষসদের কাছে। কোমর থেকে তরবারি খুলে “খবরদার” বলে গর্জন করে অতীত লাফ দিয়ে পড়ল ওদের সামনে।

ভয়ে তরুণ ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল হট্ট গোড়ে অতীত সামনে। আর দ্বিতীয়জন...

অতীত অবাক হয়ে বলল, “নীপা! তুই!”

নিধির বোন নীপা খিলখিল করে হেসে উঠল। “উঃ, কী ভয়টাই না পাইয়ে দিলে আমাদের!”

অতীত ফিরল তরুণের দিকে। কড়া গলায় বলল, “তরুণ! কিছু বলবে?”

তরুণ লজ্জিত মুখে মাথা নীচু করে রইল। এত লোক থাকতে অতীত কাছেই ধরা পড়েছে, এ তার বড়ো লজ্জা। তারপর থেমে থেমে বলল, “আমি... মানে আমাকে অধিনায়ক বজ্রধর কাল যেতে বলেছেন দলের সঙ্গে অচলগুহায়। বেঁচে ফিরব কিনা তার তো ঠিক নেই। তাই ভাবলাম, একবার দেখা করে নিই অন্তত।”

নীপা একগাল হেসে বলল, “আঃ! এত ভয়ের কী আছে? আমার এই অতীদাদা থাকবে তো সঙ্গে। আমার দাদা তোমার কোনো ক্ষতি হতেই দেবে না। তাই না, অতীদাদা?”

অতীত হাঁ করে তাকিয়ে রইল। গুপ্তচর কোথায়, এ তো এক প্রেমিকযুগল! কিন্তু নীপা... তরুণ...!

নীপা তাকিয়ে আছে তার দিকে। অতীত মৃদুস্বরে বলল, “ঠিক আছে, তাই হবে। আমি ওর কোনো ক্ষতি হতে দেব না, যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি।”

তরুণের হাত ধরে টেনে তুলল সে। তরুণ অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, “অতীত, আমি... আমি দুঃখিত।”

অতীত হাসল। “সত্যি?”

সে বুঝতে পারছে, তার হাতের ঠান্ডাভাবটা দ্রুতগতিতে কেটে যাচ্ছে।

তরুণ বলল, “সত্যি বলছি। আমার অন্যায়াবাক্য ক্ষমা করো।”

অতীত নীপার দিকে একবার তাকাল। তারপর বলল, “করলাম। আজ থেকে বন্ধু আমরা। ভয় নেই, আমার দুই বন্ধু ছাড়া বাইরের কাউকে এসব কথা বলব না। শুধু একটা কথা, আমার এই বোনকে যেন কখনও কাঁদিয়ে না।”

তরুণ মাথা নাড়ল, চেয়ে রইল কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে। ওদের ওখানেই একান্তে রেখে অতীত ফেরার পথ ধরল। মনটা যেন হঠাৎ করেই খুব ভালো লাগছে তার।

আয়তনের কাছে যখন সে পৌঁছোল, তখন দেখল পর্বত বসে বসে গল্প করছে সন্দীপ, অরিত্রদের সঙ্গে। ওকে দেখে অরিত্র বলল, “অভী, এই ভরস্ক্যোবেলা জঙ্গলে কী করছিলে?”

অভী বলল, “এই একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম।”

সন্দীপ এগিয়ে এসে বলল, “অভী, কাল যাচ্ছ তো অচলগুহায়?”

অভী বলল, “এখনও জানি না। অধিনায়ক বজ্রধরের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করব। তুমি যাচ্ছ?”

সন্দীপ মুখ শুকনো করে বলল, “না। আমি বাদ পড়েছি। তবে অরিত্রের সঙ্গে সমরোত্তম শ্যামশ্রীর দেখা হয়েছিল। তিনি ওকে বলেছেন, ও থাকছে দলে।”

অরিত্রকে অভিনন্দন জানিয়ে মিত্রভবনের পথ ধরল অভী। লীনা আর নিধিকে বলতে হবে তরুণের ঘটনাটা। ওরা বিশ্বাস করতেই চাইবে না, সে জানে।

অনুশীলন মঞ্চের পাশে সে দেখল, চঞ্চল তাদের অনুশীলন করার কাঠের তরবারি নিয়ে আপন মনে তরবারিচালনা অভ্যাস করছে। খুব ভালো যে করছে, তা নয়; তবে নিতান্ত খারাপও নয়।

অভী তার কাছে গিয়ে বলল, “কী চঞ্চলদা? আর কোনো নতুন খবর আছে নাকি?”

চঞ্চল কাঠের তরবারি দিয়েই কপালের ওপর এসে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলল, “আরও তোমাকে নতুন খবর দিই, আর তুমি আর তোমার বন্ধুরা তাই নিয়ে আমাকে বিপদে ফেলো আর কী! অধিনায়ক বজ্রধর আর সমরোত্তম শ্যামশ্রী আমাকে জোর বকাবকি করেছেন, সে খবর রাখো? আমি তোমাদের ছায়াভবনে যেতে সাহায্য করেছিলাম, এই আমার অপরাধ!”

অভী বলল, “আরে ছাড়ো না। সব ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে, এই তো যথেষ্ট।”

চঞ্চল আবার কাঠের অস্ত্রটা নিয়ে নকল যুদ্ধের মহড়া দিতে লাগল মঞ্চের ওপর। অভী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। চঞ্চল বলল, “তুমি আবার এখন এই অন্ধকার নামার পর কোথায় ঘুরছ?”

অভী বলল, “না, বিশেষ কোথাও না। এমনিই বেড়াচ্ছি আর হাওয়া খাচ্ছি। ... না না চঞ্চলদা, ওভাবে তরবারি ধরলে হাতের কবজি ঘুরে যাবে। দাও, আমাকে দাও।”

কাঠের তরবারিটা নিয়ে অভী দেখিয়ে দিল। - “সমরোত্তম মেঘবর্ণ এইভাবে আমাদের তরবারি ধরতে শিখিয়েছেন। এতে কবজির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরও বেশি থাকে।”

চঞ্চল তার হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে অভ্যাস করতে করতে বলল, “ঠিকই বলেছ হে। এতে বেশ জোর পাচ্ছি হাতে।”

কিন্তু অভীর ততক্ষণে অন্য একটা কথা মাথায় এসে গেছে। সংগ্রহশালায় চন্দ্রহাসের সামনে দাঁড়িয়ে সকালের সেই অস্বস্তিটা - সে বুঝতে পারছে কেন

ওটা হচ্ছিল তার। এই কাঠের তরবারটা হাতে নিতেই তার কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

দ্রুতপায়ে হাঁটা দিল সে ওখান থেকে। চঞ্চল পেছন থেকে ডেকে বলল, “আরে, চললে কোথায় হনহনিয়ে?”

অভী বলল, “একটু আসছি। একটা জরুরি কাজ মনে পড়ে গেছে।”

এক্ষুনি মেঘবর্ণের সঙ্গে দেখা করতে হবে তাকে। মেঘবর্ণ তাকে বিশ্বাস করবে, সে জানে। যত দেরি হবে, বিপদ তত বাড়বে।

পর্বত আসছিল সামনে দিয়ে। অভী ডাকল, “পর্বতদা, একটু দাঁড়াও না।”

পর্বত থেমে গিয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকাল। অভী হাঁপাচ্ছে।

“কী হল, অভী?”

“পর্বতদা, এক্ষুনি আয়তনে পৌঁছোতে হবে আমাকে। ভীষণ জরুরি দরকার। মেঘবর্ণের সঙ্গে।”

তার মুখ দেখেই পর্বত বুঝেছিল, ব্যাপার গুরুতর। চট করে অভীকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে দানবিক পদক্ষেপে দৌড় দিল আয়তনের দিকে।

মাটি থেকে অনেক উঁচুতে বসে আছে অভী; পর্বতের ছোট্ট গতিতে মনে হচ্ছে, তার পেটের মধ্যে দুপুরের খাবারগুলো গুলিয়ে উঠছে। কিন্তু সেদিকে মন দিতেও যেন পারছে না সে। প্রবল ভয়ে হাতের নখ কামড়ে চলল অভী।

যা সে ভাবছে, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে সর্বনাশ হয়ে গেছে।

ভাগ্যক্রমে মেঘবর্ণের দেখা মিলে গেল আয়তনে প্রবেশ করতেই। অভীর মুখ দেখে সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই তার হাত ধরে টানল অভী; কোনোক্রমে উচ্চারণ করল তিনটে শব্দ। - “মেঘবর্ণ। সংগ্রহশালা। জলদি!”

কথা না বাড়িয়ে মেঘবর্ণ চলল সংগ্রহশালার দিকে। চাবি বার করে তালা খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা তিনজন। অভী এসে দাঁড়াল চন্দ্রহাসের সামনে।

মেঘবর্ণ বলল, “আবার চন্দ্রহাস দেখতে এসেছ? ব্যাপার কী বলো তো?”

অভীর নিশ্বাস প্রশ্বাস তখনও স্বাভাবিক হয়নি। সে বলল, “চন্দ্রহাস নয়। এইটা।”

সে হাত বাড়াতেই পরশুরামের কুঠারের বাক্সের কাঁচটা মিলিয়ে গেল। অস্ত্রটা হাতে তুলে নিল সে।

অভী বলল, “মেঘবর্ণ, এই কক্ষে যতগুলো অস্ত্র আছে, সবগুলো খুব মৃদুভাবে স্পন্দিত হয়। ঠিক বলছি?”

মেঘবর্ণ অবাক হয়ে বলল, “তুমি সেটা বুঝতে পারো? ও তো দেবতাদের, ঐশিকদের উপযুক্ত মায়াবিদ্যা! আর কী কী বিদ্যা লুকানো আছে তোমার পেটে, বলো তো?”

অভী বলল, “তা জানি না, কিন্তু এইটুকু জানি, এই কুঠারটা আগে কাঁপত, এখন আর কাঁপছে না।”

কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হতে এক মুহূর্ত সময় লাগল মেঘবর্ণের। তারপর সে বিস্ফারিত চোখে তাকাল পর্বতের দিকে। পর্বতও ভয়ে হাত চাপা দিয়েছে

মুখে। সেই অবস্থাতেই সে বলল, “মায়াঘন্টা বাজিয়ে দাও।”

মেঘবর্ণ বলল, “না। সবাইকে একসঙ্গে আতঙ্কিত করে লাভ নেই। তুমি যাও, পর্বত-অধিনায়ক বজ্রধর আর শ্যামশ্রীকে ডেকে আনো। সাবধান, কেউ যেন এই মুহূর্তে কিছু জানতে না পারে।”

পর্বত বেরিয়ে গেল; ফিরেও এল খুব শীঘ্র দু’জনকে নিয়ে।

অধিনায়ক বজ্রধরের চোখে আশঙ্কার ছাপ স্পষ্ট। তিনি হাতে নিলেন কুঠারটা; একটু নেড়েচেড়ে বললেন, “অভী একদম ঠিক ধরেছে। এ নকল জিনিস – খুব উৎকৃষ্ট মানের নকল, কিন্তু নকলই – আসল পরশু নয়।”

মেঘবর্ণ বলল, “তার মানে আসলটা...!”

শ্যামশ্রী বললেন, “উর্গায়ুর দলবলের হাতে!”

অভী ভাবছে, বরুণপাশ কেটে শর্বরকে মুক্ত করা এবার ওদের কাছে ছেলেখেলা হয়ে গেল। অর্থাৎ যুদ্ধ অনিবার্য!

অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, “কিন্তু কাণ্ডটা ঘটল কীভাবে? কেউ নিশ্চয়ই গোপনে এ কক্ষ খুলে নকলটি ভেতরে রেখে আসলটি পাচার করেছে বাইরে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “সে তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু কাজটা করল কে?”

পর্বত বলল, “এমন কেউ, যে চাইলেই এই কক্ষে ঢুকতে পারত। কক্ষ তো সবসময় তালাবদ্ধ থাকে, তাই না?”

মেঘবর্ণ বলল, “হ্যাঁ, আর সে তালার চাবি থাকে চারজনের কাছে। আমি, অধিনায়ক বজ্রধর, সমরোত্তম শ্যামশ্রী, আর...”

ফিশফিশে কণ্ঠস্বরে পর্বত উচ্চারণ করল শেষ নামটা। “নিয়ামক বিনীতেশ!”

অভী নিজের অজান্তেই একবার কঁপে উঠল। নিয়ামক বিনীতেশ সব সময় যুদ্ধ চেয়ে এসেছেন। আর আজ...

বজ্রধরের কপালে নিদারুণ দ্রকুটি। “হুম, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না।”

“আমারও না,” মনে মনে বলল অভী। এ ঘটনার অর্থ কারও পছন্দ হওয়ার কথাও নয়।

এর অর্থ, এই চারজনের মধ্যেই একজন বিশ্বাসঘাতক আছে।



।। সপ্তদশ অধ্যায় ।।

হত্যাকাণ্ড

সমরোত্তমরা বারণ করেছিলেন পরশুরামের কুঠারের খবরটা এই মুহূর্তে কাউকে না বলতে, কিন্তু অভী বন্ধুদের কাছে কথাটা লুকিয়ে রাখতে চাইছিল না; সকালের আহার সারতে সারতে সে পুরো ব্যাপারটা বলে দিল ওদের।

শুনে ওরা দু'জন বিস্ময়ে, আতঙ্কে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। লীনা বলল, “এ কী ভয়ংকর কাণ্ড! খোদ সমরগরিমা আয়তনের সংগ্রহশালা থেকেই কিনা শেষপর্যন্ত চুরি গেল শর্বরকে মুক্ত করার অস্ত্র!”

নিধি বলল, “কিন্তু কবে ঘটল কাণ্ডটা?”

অভী বলল, “সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। যদিও আমার মনে হচ্ছে, আমরা ছায়াভবন থেকে ফিরে আসার পরে চুরিটা হয়েছে। ওখানে আমরা শুনেছিলাম, উর্গায়ু বলছে, শর্বরের পাশমুক্তির প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে। তার পরেই নিশ্চয়ই ব্যাপারটা হয়েছে।”

লীনা বলল, “পরশুরামের কুঠার কিন্তু অতি ভয়ংকর অস্ত্র। রাক্ষসদের কাছে এ জিনিস থাকলে...”

নিধি বলল, “উঁহু, আমার মনে আছে, সমরোত্তমরা অনেকবার বলেছেন, দৈব-অস্ত্র কেউ যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। সেইজন্যই তো অভী চন্দ্রহাস নিয়ে যুদ্ধ করায় সবাই এত অবাক হয়ে গিয়েছিল। তবে পাশ-ছেদন তো আর যুদ্ধ করার মধ্যে পড়ে না!”

লীনা বলল, “আমি শুধু ভাবছি, এই উর্গাযুটা কী ভীষণ ধূর্ত! সেদিন কী দারুণ কৌশল করে অর্ধরাক্ষসদের খেপিয়ে তুলছিল, আমরা তো নিজের কানে শুনে এলাম। চঞ্চলদা ঠিকই বলেছিল। শর্বর ভয়ানক নিষ্ঠুর রাক্ষস হতে পারে, কিন্তু উর্গাযু যে কখন কী চায়, বোঝা মুশকিল। ও আমাদের বারবার টেকা দিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা ব্যাপারে। আর তার একটাই কারণ – এখানের কেউ ওকে সাহায্য করছে।”

অভী বলল, “কে হতে পারে সেই ব্যক্তি? তোমার কী মনে হয়?”

লীনা বলল, “আমার তো নিয়ামক বিনীতেশকেই সন্দেহ হচ্ছে। ক্ষমতার লোভটা তো ওঁর বরাবরই আছে, আর রাক্ষসদের প্রতি ঘৃণাটাও ওঁর সবচেয়ে বেশি। ওঁর ধারণা, যুদ্ধ লাগলে সমরোত্তমদের হাতে রাক্ষসরা কেউ বাঁচবে না। তাই উনি যুদ্ধ চান।”

নিধি হেসে বলল, “আর তাই উনি সংগ্রহশালা থেকে পরশুরামের কুঠার পাচার করে দেবেন রাক্ষসদের কাছে? আরে বুদ্ধিমতী, মাথাটা একটু কম খাটাও।”

অভীরও মনে হচ্ছিল, লীনা একটু বেশিই ভেবে ফেলেছে। কিন্তু লীনা রাগতস্বরে বলল, “তাহলে উনি নয়তো কে? অধিনায়ক বজ্রধর? সমরোত্তম মেঘবর্ণ? সমরোত্তম শ্যামশ্রী? – কী মনে হয় তোমার? এই তিনজনের কেউ রাক্ষসদের হয়ে অস্ত্রটা চুরি করেছেন ওখান থেকে? এঁদের কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে যোগাযোগ রাখছেন রাক্ষসদের সঙ্গে?”

এবার অভী আর নিধি মানতে বাধ্য হল, এই তিনজনের পক্ষে ও কাজ করা অসম্ভব।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পরে অভী বলল, “নিধি, তোমার জন্য একটা খবর আছে।”

নিধি জ্র তুলে বলল, “কী খবর?”

“নীপা প্রেম করছে, কিন্তু কার সঙ্গে ভাবতেও পারবে না।”

নিধি আর লীনা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর নিধি বলল, “তাই? কার সঙ্গে শুনি?”

নামটা বলতে বলতেই নিধি হেসে ফেলল। তারপর একটু থেমে একবার লীনার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার হো হো করে হেসে উঠল সে। লীনাও যোগ দিল সেই হাসিতে।

দু’জনে দু’জনের হাত ধরে প্রাণপণে হাসছে। অভী হাঁ করে তাকিয়ে রইল। এ-কথা শুনে কোথায় অবাক হবে – কেমন পাগলের মতো হাসছে মেয়েদুটো!

অভী বলল, “আরে হলটা কী, বলবে তো!”

লীনা বলল, “বলছি, আগে তোমার ঘটনাটা শুনি।”

অভী তার সঙ্গে তরুণ আর নীপার দেখা হওয়ার ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে গেল। শুনে এরা আরেকপ্রস্থ হাসল। অভী কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মতো তাকিয়ে রইল। নিধি হাসতে হাসতেই লীনাকে বলল, “আমি বলেছিলাম না, এটা এসব বিষয়ে একটা গাধা? প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার কিছু বোঝে না!”

লীনার চোখে হাসতে হাসতে জল এসে পড়েছিল। সে বলল, “যা বলেছ।”
নিধি বলল, “ছেলেগুলো এইরকমই হয়। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে এরা কিছু দেখতেই পায় না।”

অভী এবার একটু রেগে গিয়ে বলল, “তোমাদের হাসি যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এবার বলবে ব্যাপারটা কী হয়েছে?”

নিধি সব কিছু খুলেই বলল এবার। গতবার তরুণকে অভী যখন সুদক্ষিণসারির পথে দেখেছিল, তারপরেই নিধি পর্বতকে দিয়ে একবার ডেকে পাঠিয়েছিল নীপাকে আয়তনে। নীপাই তাকে বলেছিল, তরুণ ওখানে তার সঙ্গে দেখা করতেই আসে।

অভী বলল, “তোমরা জানতে? তাহলে আমাকে বলোনি কেন?”

লীনা বলল, “আরে, তোমার সঙ্গে তরুণের যা স্বামী-স্ত্রীর মতো মধুর সম্পর্ক, তাই শুনলে পাছে রেগে যাও, সেইজন্য আমি আর নিধি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করে রেখেছিলাম, নীপাকে দিয়েই কথাটা বলাব তোমাকে। ওর ওপর তুমি রাগ করতে পারবে না, আমরা জানি।”

অভী হাঁ করে রইল। বাপ রে, মেয়েগুলোর পেটে কী কূটবুদ্ধি!

তবে এইবার সেও ছেড়ে দেবে না। নিজের সুখবরটা সে শোনাতে ভুলল না বন্ধুদের।

“কাল সম্ভবত আমি সমরোত্তমদের সঙ্গে যাচ্ছি শর্বরের অচলগুহায়।”

শুনে এরা লাফিয়ে উঠল। “তুমি যাচ্ছ মানে? আর আমরা?”

অভী মুচকি হেসে বলল, “কই, তোমাদের নাম অধিনায়ক বজ্রধরের তালিকায় থাকছে বলে তো শুনিনি।

নিধি বলল, “সে তালিকায় তোমার নামও তো থাকার কথা নয়। শুধু অভিজ্ঞ যোদ্ধা শিক্ষার্থীদের নিয়েই তো অধিনায়ক বজ্রধর দল নির্বাচন করবেন শুনেছিলাম।”

অভী বলল, “আমি মেঘবর্ণকে বলে রাজি করিয়েছি। বজ্রধর রাজি যদি নাও হন, মেঘবর্ণের ওপর আমার ভরসা আছে। ও ঠিক একটা ব্যবস্থা করে দেবেই।”

লীনা বলল, “আমাদের বাদ দিয়ে যদি যুদ্ধে গেছ, তোমাকে আস্ত রাখব না আমরা।”

নিধি বলল, “তোমার কঙ্কাল ঝুলিয়ে রাখব ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে।”

তার বলার ভঙ্গিতে অভী আর লীনা দু'জনেই হেসে উঠল। এবার লীনা একটু সুর নরম করে বলল, “অভী, মেঘবর্ণকে আমাদের কথাও একটু বলে দেখো না। আমরাও ভীষণভাবেই যেতে চাই যুদ্ধে।”

অভী একটু ছদ্ম-গম্ভীর ভাব নিয়ে বলল, “আচ্ছা, আচ্ছা, বলে দেখব।”

নিধি জোর দিয়ে বলল, “না, ‘বলে দেখব’ নয়। এক্ষুনি চলো তার কাছে।”

অভী বলল, “এক্ষুনি?”

“হ্যাঁ। সে ব্যস্ত মানুষ; কখন কোথায় থাকে, ঠিক নেই। অধিনায়ক বজ্রধর যদি তালিকা সম্পূর্ণ করে ফেলেন, তখন আমাদের হাহুতাশ করা ছাড়া গতি

থাকবে না।”

অতএব অভীকে বেরোতেই হল ওদের সঙ্গে। আয়তনের দিকে যেতে যেতে লীনা বলল, “আচ্ছা, তোমাকে মেঘবর্ণ কেন তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানের কথা বলল, অভী?”

অভী বলল, “আমি জানি না। মেঘবর্ণের মাথায় হরেক রকম বুদ্ধি গিজগিজ করছে সবসময়। কী ভেবে যে কোন কথাটা বলছে ও, বোঝা কঠিন।”

ওরা দেখল, চঞ্চল ওখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে পর্বতের সঙ্গে। পর্বত ওদের দেখে বলল, “কী খবর? চললে কোথায়?”

অভী বলল, “আয়তনে। সমরোত্তম মেঘবর্ণের সঙ্গে একটু দরকার আছে।”

পর্বত বলল, “কাল যাচ্ছ নাকি ওদের সঙ্গে তোমরা?”

নিধি বলল, “সেই ব্যাপারেই কথা বলতে যাচ্ছি।”

পর্বত হেসে বলল, “আর বলতে হবে না, বুঝেছি। তোমাদের দলে নেয়নি ওরা, তাই না? তাই যাচ্ছ মেঘবর্ণের কাছে দরবার করতে। হি হি হি। যাও, যাও।”

রেগে চলে যাচ্ছিল নিধি আর লীনা, এমন সময় চঞ্চল বলল, “অভী, কাল কথা বলতে বলতে কী এমন জরুরি কাজ মনে পড়েছিল যে অমন করে দৌড় দিলে?”

‘বলব না’- ‘বলব না’ করেও অভী বলে ফেলল, “কাল সমরোত্তম মেঘবর্ণের কাছেই গিয়েছিলাম। একটা অস্ত্রের ব্যাপারে দরকার ছিল।”

“অস্ত্রের ব্যাপারে?”

অভী কিছু বলার আগেই পর্বত বলে দিল, “আরে, সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। আমিই তো ওকে নিয়ে গেলাম মেঘবর্ণের কাছে। পরশুরামের কুঠার চুরি হয়ে গেছে, সে খবর রাখো?”

সে খবর রাখার কথা চঞ্চলের নয়। সে অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে বলল, “সে কী? এ যে অবিশ্বাস্য!”

পর্বতের ওপর একটু রাগ-ও হচ্ছিল অভীর। কী দরকার ছিল বাপু এত ভেতরের কথা বলার? অবশ্য চঞ্চলকে বিশ্বাস করা যায়, এও ঠিক। নিজের জীবন বিপন্ন করে সে রাক্ষসদের খবর আয়তনে এনে দেয় – খুবই বিশ্বস্ত সে আয়তনের প্রতি, এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।”

পর্বত বলল, “কিন্তু সমস্যা কী জানো? বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে জিনিসটা চুরি গেল কী করে, সেই কথাটাই ভেবে পাচ্ছি না আমি।”

চঞ্চল চিন্তিত মুখে বলল, “ব্যাপারটা ভালো হল না, পর্বত। বিমোহকরা বড়ো ভয়ানক সব যোদ্ধা। তাদের হাতে ওই মারাত্মক দৈব-অস্ত্র পড়লে তারা তাদের নেতাটির বাঁধন কেটে তাকে ফিরিয়ে আনবেই আনবে। বরুণপাশের বাঁধন কাটার জন্য ওই দৈবকুঠার ওরা ব্যবহার করবেই। এই কথাটাই সেদিন অধিনায়ক বজ্রধরকে বলছিলাম আমি। শব্দ ফিরলে আবার যে কত মানুষের প্রাণ যাবে, সে কথা ভাবতেই আমার ভয় করছে।”

লীনা বলল, “আমি আরেকটা কথা ভাবছি। অস্ত্রটা চুরি গেল সংগ্রহশালা থেকে; কিন্তু জিনিসটা যেই নিয়ে থাকুক, সে নিল কীভাবে, আর উর্গায়ুর দলের হাতে সেটা পৌঁছেই বা গেল কী করে? এ তো একজনের কাজ হতে পারে না। তাহলে কি শর্বরের দলের একাধিক গুপ্তচর আছে আমাদের মধ্যে?”

চঞ্চল বলল, “থাকাটা অসম্ভব নয়। অর্ধরাক্ষসদের অনেকেই নিয়ামক বিনীতেশের ওপর অখুশি, তোমরা তো জানোই।”

নিধি ফিশফিশ করে লীনাকে বলল, “এবার চলো এখান থেকে। এখন গল্প করতে বসলে ওদিকে মেঘবর্ণ কোথায় চলে যাবে, তার কোনো ঠিক আছে? মাঝখান থেকে আমাদের যুদ্ধে যাওয়াটাই ভেসে যাবে।”

ঠিক তখনই অভীর চোখে পড়ল, রক্ষোবৈদ্য আসছেন এইদিকেই, তাঁর সঙ্গে আসছে একটা অদ্ভুত প্রাণী।

প্রাণীটার আকার খুব বড়ো নয়, কিন্তু তার সারা গায়ে...

লীনারও চোখ পড়েছিল সেদিকে। সে অবাক হয়ে বলল, “এ কী?”

পর্বত কিন্তু উল্লাসে ফেটে পড়ল। “বক্রপুচ্ছ!”

তাই তো! সর্বাঙ্গে কাপড়ের টুকরো দিয়ে আচ্ছাদিত কুকুরটাকে ওরা চিনতেই পারেনি প্রথমে। পর্বতকে দেখেই দৌড়ে এসে তার বাড়ানো হাতের মধ্যে মুখ ঘষতে লাগল সে; চেটে দিতে লাগল তার হাত।

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “সাবধান পর্বত, সঞ্জীবন-বন্ধনী যেন খুলে না যায়, খেয়াল রেখো।”

হঠাৎ বক্রপুচ্ছ গলার মধ্যে একটা রাগত গরগর শব্দ করতে শুরু করল। পর্বত তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল। - “কী হল, বক্রপুচ্ছ? মাথা গরম হয়ে গেল কেন?”

হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সে কাপড়-জড়ানো কুকুরটার গায়ে; একটু শান্ত হল বক্রপুচ্ছ। পর্বতের মুখে উচ্ছল আনন্দের হাসি। সে বলল, “রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, আপনার কাছে আমার ঋণ জমেই যাচ্ছে শুধু। এ বেচারি যে অবস্থায় সেদিন এসেছিল, আমি ভেবেছিলাম, আর বাঁচানো যাবে না। আপনি না থাকলে আর ফিরে পেতাম না একে।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “আমি নয়, পর্বত। সব নিয়তির খেলা। সেদিন অধিনায়ক বজ্রধর নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করে যদি রক্ত না দিতেন, তাহলে কি আর ওকে বাঁচানো যেত?”

পর্বত বলল, “হ্যাঁ, অধিনায়ক বজ্রধরের তুলনা হয় না। কত প্রাণ যে উনি এইভাবে দান করেছেন, হিসেব করতে বসলে মহাভারত হয়ে যাবে।”

চঞ্চল একটু হাসল। - “হ্যাঁ, বজ্রধর প্রাণ দেওয়া আর প্রাণ নেওয়া, দুটো কাজই ভালো পারেন।”

অস্বস্তিভরে একবার বন্ধুদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিল অভী। চঞ্চলের বাবা মারা গিয়েছিলেন বিগত শর্বর-যুদ্ধের সময় অধিনায়ক বজ্রধরের হাতে, ভুলে গিয়েছিল ওরা।

রক্ষোবৈদ্য শান্ত স্বরে বললেন, “চঞ্চল, যুদ্ধে গেলে মৃত্যু হতে পারে, এই সত্য জেনেই তো সবাই যুদ্ধে যায়। দু’পক্ষের যোদ্ধারই মৃত্যু হয় একটা যুদ্ধে। এর জন্য তৈরি থাকাই কি ভালো নয়?”

চঞ্চল বলল, “রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, আমি বেশি লেখাপড়া করিনি আপনাদের মতো। অল্পস্বল্প অস্ত্রচালনা আর কিছুটা উপস্থিতবুদ্ধি – এইটুকু পুঁজি নিয়ে আমি বেঁচে আছি। শর্বরকে আমিও পছন্দ করি না, কিন্তু আপনাদের সামনে এইটুকু সত্যকথা বলার সংসাহস আমার আছে, যদি প্রভু হিসেবে নিয়ামক বিনীতেশ আর শর্বরের মধ্যে তুলনা করেন, আমার কাছে অন্তত শর্বর বেশি গ্রহণযোগ্য। কেন জানেন? শর্বর প্রাণে মারে, কিন্তু সম্মানে হাত দেয় না। গতবার আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন অধিনায়ক বজ্রধরের হাতে। তারপর কী হয়েছিল জানেন তো? আমার মায়ের সঙ্গে কী হয়েছিল জানেন তো?”

রক্ষোবৈদ্য আর পর্বত দু’জনেই চুপ করে রইলেন। চঞ্চল একটু হাসল। - “আপনারা অনেক দিনের পুরোনো লোক। আপনারা সবই জানেন। আর তারপরেও নিয়ামক বিনীতেশকে সমর্থন করেন। কারণ কী জানেন? আপনারা দু’জনেই অভিজাত রাক্ষস – নিজ রাজ্যের বাসিন্দা না হলেও আপনারা খাঁটি রাক্ষস। কিন্তু আমি তো তা নই, আমি অর্ধরাক্ষস। আমাদের প্রাণের দাম রাক্ষসদের কাছেও নেই, মানুষদের কাছেও নেই। বজ্রধর চাইলে আটকাতে পারতেন না ওই ঘটনা? কিন্তু অর্ধরাক্ষস আপদ কয়েকটা বিদায় হলে ক্ষতি কী?”

আর কিছু না বলে হনহন করে হেঁটে চলে গেল চঞ্চল। অতী রক্ষোবৈদ্যের দিকে তাকিয়ে বলল, “চঞ্চলদার মায়ের কী হয়েছিল?”

রক্ষোবৈদ্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “খুব খারাপ হয়েছিল। বজ্রধর কিন্তু এসবের কিছুই জানতেন না। তাঁরা তখন নীলাভ্রর বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে এদিকে যে এইধরনের ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে, তা অনুমান করে উঠতে পারেননি; পারলে কোনোভাবেই এগুলো হতে দিতেন না। সব কিছু ঘটে যাওয়ার পর সমরোত্তমরা জেনেছিলেন। কী হয়েছিল জানো? নিয়ামক বিনীতেশ তাঁদের লুকিয়ে নিজের সেনা সুদক্ষিণসারিতে পাঠিয়ে যারা প্রকাশ্যে শর্বরকে সমর্থন করেছিল, তাদের বাড়ির মেয়েদের প্রকাশ্যে রাস্তায় উলঙ্গ করে চাবুক মেরেছিল। সে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছিল কিশোর চঞ্চল।”

পর্বতের কুকুর এতক্ষণে গরগরানি থামিয়েছে। পর্বত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “সেই রাতেই অপমানে আত্মহত্যা করেছিল সুদক্ষিণসারির আটজন অর্ধরাক্ষস মেয়ে। তাদের মধ্যে চঞ্চলের মা-ও ছিল।”

অতী কোনো কথা বলতে পারল না। নিয়ামক বিনীতেশ খারাপ লোক, সে জানত; কিন্তু এমন পৈশাচিক নৃশংসতার কথা যেন সে কল্পনাও করতে পারছে না। অর্ধরাক্ষসদের এত রাগের কারণটা এবার যেন সে একটু একটু উপলব্ধি করতে পারছে।

নিধি বলল, “দেখলে তো অতী, কেমন অবস্থায় আমরা বাস করি এখানে!

এত কিছু দেখার পর এই বুড়ো বয়সে যদি আমার বাবা উর্গায়ুর বক্তৃতা শুনতে ছায়াভবনে যায়ও, আমি আর তাকে দোষ দেব কী করে?”

অভী মাথা নাড়ল। সে বুঝেছে।

রক্ষোবৈদ্য আবার বললেন, “তোমরা যারা এখানে আছ, তারা খুব বুদ্ধিমতী এবং বুদ্ধিমান, তাই তোমাদের কথাটা বলছি। কেউ দয়া করে খারাপ ভাবে নিয়ো না আমার কথা। পর্বত, ভূমিও শোনো; যদি মনে করো, তাহলে ব্যাপারটা অধিনায়ক বজ্রধরকেও জানিয়ো। সব বিষয়েই তাঁর খেয়াল থাকে, আমি জানি। কিন্তু তিনিও মানুষ; ভুল তাঁরও হয়ে যেতে পারে। এখন যা বলি শোনো। মানুষকে বিশ্বাস করা আমাদের উচিত, এ-কথা ঠিক। কিন্তু কাকে বিশ্বাস করা সবসময় উচিত নয়, জানো?”

ওরা তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। রক্ষোবৈদ্য বললেন, “আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না। চঞ্চলের সঙ্গে যা হয়েছে, তা অতি জঘন্য অন্যায় – এরকম অন্যায় যেন কারও সঙ্গে না হয় কখনও। কিন্তু আমার এতদিনের অভিজ্ঞতা বলে, যে ব্যক্তির সঙ্গে ছোটোবেলায় ভয়ংকর কোনো অন্যায় হয়েছে, যে কমবয়সে ঘোরতর অবিচারের শিকার হয়েছে, সেই ব্যক্তির মধ্যে একটা ক্ষমতা জন্মায় – হয় খুব ভালো করার, অথবা খুব মন্দ করার। আর ইতিহাস বা মহাকাব্য ঘাঁটলে দেখবে, এই ধরনের লোকের মন্দ করার ঝোঁকটাই বেশি দেখা যায়, মন্দের দলে যোগ দেওয়ার প্রবণতা এদের মধ্যে বেশি থাকে। চঞ্চলের কষ্টকে আমি ছোটো করছি না, কিন্তু অধিনায়ক বজ্রধর যেন এই ছেলেটিকে এই যুদ্ধকালে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বেশি বিশ্বাস না করেন, সেটাও আমি চাই। যে নিজেকে ‘বঞ্চিত’ মনে করে, তার মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রতিশোধস্পৃহা আর নিজেকে অন্যদের থেকে বড়ো ভাবার একটা প্রবণতা থাকে। সেটা বিপজ্জনক হতে পারে – তার ক্ষেত্রেও এবং তার চারপাশের মানুষগুলোর ক্ষেত্রেও।”

তারপর হঠাৎ লীনার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আক্ষেপের সুরে তিনি বললেন, “আহা, আমি তোমাদের বোধহয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে যাওয়া থেকে আটকে রেখেছি? যাও যাও, তোমরা যাও। আমি বরং বক্রপুচ্ছের সঙ্গে একটু খেলা করি।”

ওরা একটু লজ্জা পেল। তারপর দু’জনকেই ‘নমস্কার’ জানিয়ে ওরা ছুটল মেঘবর্ণের খোঁজে।

তাকে পাওয়া গেল সম্মেলন কক্ষে। সেখানে তিন সমরোত্তম বসে গম্ভীরমুখে কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলেন। ওদের দেখে মুখ তুলে তাকালেন তাঁরা।

অভীই ছিল দলের সামনে। অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, “ভেতরে এসো তোমরা।”

গুটি গুটি পায়ে কক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়াল ওরা। বজ্রধর বললেন, “বলো, কী ব্যাপার?”

পেছন থেকে লীনা আর নিধি একসঙ্গে চিমটি কাটল তার পিঠে। অর্থাৎ, “তুমিই বলো।”

অভী যেন হঠাৎ কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না; সামনে সমরোত্তমদের দেখে কথা হারিয়ে গেছে তার। আমতা আমতা করে সে বলল, “মানে, ইয়ে, আমি ভাবছিলাম, আমি ... আমিও যুদ্ধে যাব।”

পেছন থেকে নিধি ফিশফিশ করে বলল, “‘আমি’ নয়, গাধা! আমরা!”

কিন্তু বজ্রধরের আগেই শ্যামশ্রী বলে উঠলেন, “কোনো প্রশ্নই নেই।”

অভী তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। শ্যামশ্রী বললেন, “আমাদের দল নির্বাচন প্রায় সমাপ্ত। দুটি কারণে তোমাকে, না, তোমাদের নিতে পারব না আমরা। এরা দু’জনও যুদ্ধে যেতে চায়, বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের পক্ষে তা অসম্ভব। কারণ, প্রথমত এই দলে আমরা তাদেরই রাখছি, যাদের যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা আছে, এবং দ্বিতীয়ত যারা এই আয়তনে অনেকদিনের শিক্ষার্থী – অর্থাৎ যারা বয়সে তোমাদের চেয়ে কিছুটা বড়ো।”

অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, “অভী, লীনা, নিধি। তোমরা ভালো যোদ্ধা হয়ে উঠবে একদিন, এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই যুদ্ধ তো সহজ জায়গা নয়। এত কম বয়সে তোমাদের শরীর বা উর্গায়ুর মতো ভয়াবহ রাক্ষসযোদ্ধাদের মুখোমুখি হতে দেওয়া আমরা সমীচীন মনে করছি না।”

অভী কাতরভাবে তাকাল মেঘবর্ণের দিকে। সে মৃদু হাসিমাখা মুখ নিয়ে দিব্যি উপভোগ করছিল ওদের কথাবার্তা। এবার সে মুখ খুলল। - “অভী, অধিনায়ক বজ্রধর এবং সমরোত্তম শ্যামশ্রীর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।”

আঁ! অভী যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এই লোকটাই কিনা তাকে বলেছিল...

মেঘবর্ণ বলল, “আচ্ছা, তুমি বলো, কেন তুমি যুদ্ধে যেতে চাও। কেন তুমি যেতে আগ্রহী, আমাদের বোঝাও।”

অভী সত্যি কথাই বলল। - “আমার বাবা এই আয়তনের সমরোত্তম হয়েও একটা অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যদি আমি কোনো ভালো কাজ করতে পারি, তাহলে অন্তত বাবার সেই আচরণের কিছুটা ক্ষতিপূরণ হবে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “আর যদি বিশেষ কিছু করার আগেই মারা যাও, তখন?”

অভী বলল, “তাহলে অন্তত সমরগরিমা অটুট রেখে মরতে পারব।”

বজ্রধর বললেন, “শোনো অভী, যুদ্ধক্ষেত্রে কিন্তু এইরকম আবেগের কোনো দাম নেই। তোমার বাবা যা করেছেন, তার প্রতিদান হিসেবে তুমি কিছু করতে চাও – এই রকম মনের অবস্থা নিয়ে যুদ্ধে না যাওয়াই ভালো। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, তুমি সমরগরিমা বজায় রেখে বীরের মৃত্যু বরণ করলে। কিন্তু তাতে কার কী লাভ হবে? যুদ্ধের প্রধান শর্ত হল, নিজের পক্ষের যত কম সম্ভব ক্ষতি করে বিপক্ষের যত বেশি সম্ভব ক্ষতি করা। তোমরা অনভিজ্ঞ যোদ্ধারা যদি ওখানে ওইসব ভয়ংকর রাক্ষসদের সম্মুখীন হও, তাহলে আমাদের পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা বেশি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ তো সহজ অঙ্ক।”

শ্যামশ্রী বললেন, “অভী, আমরা তোমাদের যুদ্ধ করতে শেখাই ঠিকই, কিন্তু আসল যুদ্ধটা লড়তে হয় আমাদের মনের ভেতরে। সেখানে যে রাক্ষস-

খোঁকসগুলো আছে, যারা তোমাকে মনে মনে বলছে, ‘এ-ই তোমার বাবার কাজের ক্ষতিপূরণ করার সুযোগ’, তারাই এখন তোমার শত্রু। তোমার বাবা যে কাজ করেছিল, আমরা এখনও জানি না তার পেছনে কারণ কী ছিল; কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে সে সত্যিই একজন বীর যোদ্ধাও ছিল এবং আমাদের অনেক যুদ্ধ জিততে সে বহুবার অমূল্য সাহায্য করেছে। এ-ব্যাপারটা তোমার মাথায় রাখা উচিত।”

মেঘবর্ণ বলল, “অতএব অভী, আমারও মত, তুমি যেয়ো না।” – বলেই বাকিদের লুকিয়ে এক চোখ টিপল সে।

অভী সঙ্গে সঙ্গে বলল, “আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি তাহলে। লড়াই করে ফল ঠিক হোক। দেখা যাক, কার হাত থেকে প্রথম তরবারি পড়ে।”

বজ্রধর আর শ্যামশ্রী চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল। নিধি আর লীনারও মুখ শুকিয়ে গেছে। স্বয়ং একজন সমরোত্তমকে যে অভী সত্যিই শেষপর্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে ডেকে বসবে, ওরা ভাবেনি।

শ্যামশ্রী তারপর হেসে উঠলেন। - “কাজটা খুবই ছেলেমানুষের মতো করলে, অভী। সমরোত্তম মেঘবর্ণ সারা জীবনে একবারই তরবারি ফেলেছে হাত থেকে, আর সেবার সেই বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইতে তার উলটোদিকে ছিল নীলাভ্র। এমনকি গত যুদ্ধে শর্বরও পারেনি ওকে নিরস্ত্র করতে। ...হ্যাঁ, যে লোকটিকে তুমি এখনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলে, আমাদের সময়ের ভয়ংকরতম রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই করেও সে অপরাজিত ছিল।”

মেঘবর্ণ বলল, “আঃ শ্যামশ্রী, থামো না। এইটুকু ছেলেকে ওসব বলার কী দরকার?”

বজ্রধর ভ্র কুঁচকে তাকিয়ে আছেন মেঘবর্ণের দিকে। তিনি সম্ভবত আন্দাজ করছেন, ব্যাপারটার মধ্যে কিছু গুণগোল আছে। মেঘবর্ণ যেন তা খেয়ালই করেনি। সে বলল, “যদি অভী আমাকে নিরস্ত্র করতে পারে, তাহলে ও যাবে আমাদের সঙ্গে অচলগুহায়। আপনি সম্মত দ্বন্দ্বযুদ্ধের এ শর্তে, অধিনায়ক বজ্রধর?”

বজ্রধর কিছু বলার আগেই অভী বলল, “না, শুধু আমি নয়, আমরা তিনজনেই যাব।”

বজ্রধর গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, “হুম, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না। কিন্তু মেঘবর্ণ, এ শর্তে আমি রাজি।”

ওরা সবাই বেরিয়ে এল বাইরের অলিন্দে। অভী তার তরবারি নিষ্কোষিত করল। মেঘবর্ণ বাম হাতে চর্মকোষ ধরে ডানহাতে টেনে বার করল তার তরবারি।

একদিকে দাঁড়াল লীনা আর নিধি, আর অন্যদিকে শ্যামশ্রী আর বজ্রধর। মাঝে মেঘবর্ণের মুখোমুখি অভী। মেঘবর্ণ হাসল তার দিকে তাকিয়ে; অভীও পালটা হাসল।

বজ্রধর ওদের যুদ্ধ শুরু করতে আদেশ দিলেন। লীনা ফিশফিশ করে বলল, “নিধি, আর যাই হোক, সমরোত্তম মেঘবর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে ওঠা অভীর পক্ষে সম্ভব নয়।”

নিধি বলল, “নাই হোক, মেঘবর্ণের ওপর ভরসা রাখো। একটা ব্যবস্থা ঠিক হবেই।”

মেঘবর্ণ বলল, “অভী, তৈরি তো?”

অভী মাথা নাড়ল। - “হ্যাঁ।”

মেঘবর্ণ এগিয়ে এসে আলতো করে তরবারি ছোঁয়াল অভীর তরবারির ফলকে। মৃদু ঝিনঝিন শব্দ হল। অভী তার তরবারির কায়দায় সরিয়ে দিল মেঘবর্ণের অস্ত্রটা।

তারপর যুদ্ধ শুরু হল। অভী আক্রমণ করতে লাগল, মেঘবর্ণ শুধু সে আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগল। লীনা চুপিচুপি নিধিকে বলল, “মেঘবর্ণ চাইছে অভীকে জিতিয়ে দিতে। তাই আক্রমণে যাচ্ছে না।”

নিধি বলল, “হুঁ, আমিও খেয়াল করেছি সেটা। মেঘবর্ণ খুবই হালকা চালে তরবারি চালাচ্ছে। অধিনায়ক বজ্রধরও দেখছেন। ভুরুদুটো কীরকম কুঁচকেছেন দেখো উনি।”

বজ্রধরের দিকে একবার তাকিয়েই লীনা চোখ সরিয়ে নিল। সত্যিই বজ্রধর ক্রকুটি করে দেখছেন ওদের।

আর তখনই অভীর আঘাতটা এসে পড়ল মেঘবর্ণের হাতে, আর ঝনঝন শব্দে তার তরবারি পড়ে গেল মাটিতে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল লীনা আর নিধি।

অভীও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না যে স্বয়ং সমরোত্তম মেঘবর্ণকে নিরস্ত্র করতে পেরেছে সে। অবশ্য পরমুহূর্তেই সে কারণটা বুঝতে পারল।

শ্যামশ্রী উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, “এটা কী হল, মেঘবর্ণ? তুমি ইচ্ছে করে হেরে গেলে!”

মেঘবর্ণ হেসে বলল, “শ্যামশ্রী, এ ছেলেটা আমাদের নীলাভর ছেলে। সেদিন রাতে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ওকে চন্দ্রহাস হাতে যুদ্ধ করতে দেখেছি আমি। আমি জানি, ও কী করার ক্ষমতা রাখে। আবার যদি যুদ্ধ লাগে, তাহলে ও আমার পাশে দাঁড়িয়ে লড়ছে, এটা জানলে আমি স্বস্তিই পাব।”

“আর এই মেয়েদুটো?”

“নিধির কথা তো তুমি জানোই, শ্যামশ্রী। খুবই ভালো মায়াযোদ্ধা ও। আর লীনা তো ধনুর্বেদ আর অসিবিদ্যা দুটোতেই চমৎকার ফল করছে আজ অনেকদিন। আত্মরক্ষা করার ভালো ক্ষমতা ওদের দু'জনেরই আছে, তাই ওরা থাকলে ক্ষতি তো নেই-ই, বরং লাভ আছে। আর লড়াই শুরুর আগে তো কথা হয়েই ছিল, তাই না?”

বজ্রধর বললেন, “হুম, নিয়ম নিয়মই। যদিও মেঘবর্ণ তুমি চালাকি করে নিয়মের ফাঁদে ফেলে আমাদের বাধ্য করলে এই তিনজনকে দলে নিতে,

কিন্তু এখন আমি ভাবছি, নিয়তি হয়তো এ-ই চান। এরা যাবে আমাদের সঙ্গে অচলগুহায়। সমরোত্তম শ্যামশ্রী, এদের নামগুলো তালিকাভুক্ত করে নিয়ো আজকেই।”

মেঘবর্ণের দিকে ফিরে নীরবে চোখের ইঙ্গিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল অভী। মেঘবর্ণ একটু হেসে মাথা নোয়াল।

তারপর আনন্দে প্রায় নাচতে নাচতে ওরা ফিরল মিত্রভবনে। লীনা আর নিধির খুশি দেখে কে!

“অভী, তুমি হচ্ছে সত্যিকারের বন্ধু!” – নিধি ঘরে ঢুকেই ঘোষণা করল। “তোমার জন্যই আমরা কাল যুদ্ধে যাচ্ছি!”

অভী বলল, “যাক, আর তাহলে আমার কঙ্কালটা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ঝুলিয়ে না, কেমন?”

নিধি হি হি করে হাসল। লীনা চোঁচিয়ে উঠে বলল, - “তাই বলে একেবারে একজন সমরোত্তমকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান? যতই মেঘবর্ণ তোমাকে বলে রাখুক, এ কাজ করতে সাহস লাগে।”

অভী বলল, “সাহস আমার কম আছে, ভাবছ কেন?”

মিত্রমাসি এসে ঢুকলেন ঘরে। লীনাদের ঘরে বসেই কথা বলছিল ওরা। নিধি আনন্দে চিৎকার করে বলল, “মিত্রমাসিই-ই! কাল যুদ্ধে যাচ্ছি আমরা!”

মিত্রমাসি একটু শঙ্কিতকণ্ঠে বললেন, “তাতে অত আনন্দের কী আছে, বাপু? সাবধানে থেকো সবাই; ফিরে এসো ভালোয় ভালোয়। আর হ্যাঁ, অভী, সহকারী নিয়ামক নারদ এসেছিলেন তোমার খোঁজ করতে। তুমি নেই শুনে এখানে বসেই একটা চিঠি লিখে খামে ভরে মুখ বন্ধ করে আমার কাছে দিয়ে গেছেন; বলে গেছেন, তুমি এলেই তোমাকে দিতে।”

সাদা খাম একটা এনে ওর হাতে তুলে দিলেন মিত্রমাসি। খামের মুখ আটকানো আছে আঠা দিয়ে। অভী অবাক হয়ে বন্ধুদের মুখের দিকে তাকাল।

লীনা বলল, “খোলো, খোলো। দেখা যাক কী আছে?”

খামটা খুলে চিঠিটা বার করে আনল অভী। হাতের লেখা দেখে মিত্রমাসি অবাক হয়ে বললেন, “এ কী? আমাদের সহকারী নিয়ামক মহোদয়ের হাতের লেখা তো বেশ সুন্দর গোটা গোটা ছিল। এই লেখাগুলো এমন বিচ্ছিরি, কাঁপা কাঁপা লাগছে কেন?”

অভীর তিনদিকে সাগ্রহে ঘিরে রইল তিন মহিলা; সে চিঠিটা পড়তে লাগল - “অভী, খুব জরুরি দরকারে চিঠি লিখছি তোমাকে। এটা হাতে পাওয়ামাত্রই আমার কার্যালয়ে একবার আসবে; তোমাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলার আছে। একা এসো; কাউকে এনো না সঙ্গে। আমরা সবাই ঘোর বিপদের মধ্যে আছি - এমন একটা বিপদ, যার কথা এখনও কেউ ভাবতেই পারছে না। সব কথা আমি এই মুহূর্তে সমরোত্তমদের কাছেও বলতে পারব না। কিন্তু তোমাকে আমি কথাটা বলতে চাই। তুমি একবার এসো - যত দ্রুত সম্ভব। উর্গায়ুর ব্যাপারে আমার কাছে একটা খবর আছে; আমাদের সবার জীবন-মরণ নির্ভর করছে এর ওপর।”

চিঠিটা পড়েই অভী বলল, “আমি যাচ্ছি।”

লীনা বলল, “চলো, আমিও যাচ্ছি সঙ্গে।”

অভী বলল, “থাক, দরকার নেই। আমাকে একা আসতে লিখেছেন তো উনি।”

বন্ধুদের রেখে অভী বেরিয়ে পড়ল। নারদের কার্যালয়ে সে কখনও যায়নি, শুধু দেখেছে বাইরে থেকে। আয়তন থেকে বেশ কিছুটা দূরে তাঁর কার্যালয়টা।

দুপুর হয়ে এসেছে, মাথার ওপরে রোদটা বেশ চড়া। হাঁটতে হাঁটতে কপালের ঘাম মুছে নিল অভী।

কী এমন খবর আছে উর্গায়ু সম্বন্ধে তাঁর কাছে? কী ঘোর বিপদের কথা বলছিলেন তিনি?

নিধির কাছে সে শুনেছিল, ওঁর এক সহকারী বসে থাকে কার্যালয়ের বহির্কক্ষে। কিন্তু আজ সে ছিল না। ছুটি নিয়েছে হয়তো।

কার্যালয়ে প্রবেশের দরজার সোজাসুজিই বসেন সহকারী নিয়ামক নারদ। অভী দেখল, দরজাটা অল্প খোলাই আছে।

নারদ সম্ভবত ভেতরে তারই প্রতীক্ষা করছেন।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দৃশ্যটা দেখেই অভী বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

নারদ পড়ে আছেন মেঝের ওপরে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, দেহে প্রাণ নেই। চোখ খোলা; মুখে বিস্ময় আর যন্ত্রণার ছাপ। একটা দীর্ঘ তির বিদ্ধ করেছে তাঁর বুক; তার পশ্চাৎভাগ উঁচু হয়ে আছে নিষ্পন্দ দেহটার বুক থেকে।

আর একটা জিনিস চিনতে পারল অভী। তিরটার শেষপ্রান্তে লাগানো পাতলা সোনালি বস্তুটা যেন ঝলমল করছে দিনের আলোয়।

সেই স্বর্ণখেচরের পালক!



।। অষ্টাদশ অধ্যায় ।।

যুদ্ধযাত্রা

অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, “আমাদের মধ্যে শর্বরের গুপ্তচর যেই থাকুক, সে যে দারুণভাবে সক্রিয়, এ-কথা অস্বীকার করা যাবে না। অতীকে নারদ চিঠি লিখে উর্ণায়ুর ব্যাপারে কিছু বলতে চান, এ বিষয়টা সম্ভবত সে জানত। তাই অতীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই তাঁকে সরিয়ে দিল সে পৃথিবী থেকে।”

মেঘবর্ণ বলল, “এই স্বর্ণখেচরের পালকগুলোই রাক্ষসরা প্রচুর পরিমাণে জোগাড় করছিল। মারীচের দোকানে এইগুলোরই গোপনে আদান-প্রদান হতে দেখেছিলে তুমি, অতী। তোমার রবিকাকা অবশ্য জানত না যে এগুলোকে রাক্ষসরা অব্যর্থলক্ষ্য তির তৈরির কাজে ব্যবহার করছে।”

সম্মেলন কক্ষে বসে কথা বলছেন ওঁরা। আছেন তিনজন সমরোত্তম, অতী, লীনা আর নিধি। নারদের কার্যালয় থেকে ছুটে পালিয়ে এসে অতী আগে তার বন্ধুদের ডেকেছে, তারপর তিনজনে মিলে গেছে সমরোত্তমদের খবর দিতে। সহকারী নিয়ামকের মৃতদেহ উদ্ধার করে আনা হয়েছে আয়তনে। অতী তাঁর লেখা শেষ চিঠিটা তুলে দিয়েছে অধিনায়ক বজ্রধরের হাতে।

নারদের কথা বারবার মনে পড়ছে অতীর। মানুষটার কথা ভাবতে গেলেই শিউরে উঠছে সে। এই তো গতকালই দেখেছে তাঁকে এই মাঠ দিয়ে হেঁটে যেতে, কথা বলতে। সেই মানুষটা আজ...!

শ্যামশ্রী বললেন, “সেবার কল্পনাথ, আর এবার নারদ। একই লোকের কাজ কি?”

মেঘবর্ণ বলল, “আমার কিন্তু তা মনে হয় না। কল্পনাথকে মারা হয়েছিল সুপ্তসর্পের মতো উঁচুমানের রাক্ষসমায়া ব্যবহার করে। আর নারদের বেলায় দূর থেকে তির ছুড়ে। একই লোকের কাজ না হওয়াই সম্ভব। তবে মস্তিষ্কটা সম্ভবত একজনেরই। উর্গাযু।”

শ্যামশ্রী বললেন, “খুনি একজনই – এমনটা হতেও তো পারে। হত্যাকারী যে সবসময় একই পদ্ধতিতে হত্যা করবে, তার নিশ্চয়তা কী?”

নিধি বলল, “না, দুটো হত্যাকাণ্ড এক লোকের কাজ নয়।”

এমন জোর দিয়ে সে কথাটা বলল যে কক্ষের সবাই অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। অতীত হঠাৎ মনে পড়ে গেল, নিধি মাঝেমধ্যেই দেখা করতে যেত নারদের সঙ্গে, কিন্তু কারণটা কখনও বলেনি তাদের।

বজ্রধর স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নিধির দিকে। তিনি বললেন, “নিধি, তোমার সম্ভবত এ বিষয়ে কিছু বলার আছে, তাই না?”

নিধির মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। সে বলল, “হ্যাঁ, অধিনায়ক বজ্রধর। আমার সত্যিই কিছু বলার আছে। তবে সহকারী নিয়ামক মহোদয়ের ব্যাপারে নয়, কল্পনাথের ব্যাপারে। আমি জানি তাকে কে খুন করেছিল।”

“কে?”

“আমি।”

কক্ষের মধ্যে নীরবতা। অতী আর লীনা বিস্ফারিত চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল। নিধি কী বলছে, তারা যেন বুঝতে পারছে না।

সমরোত্তমরা নিঃশব্দে তাকিয়ে আছেন তার দিকে, অপেক্ষা করছেন। নিধি বলল, “সুপ্তসর্প যে কী জিনিস, আমি তখন জানতামই না। ওই মায়ানির্মিত ডিমের মতো জিনিসটা আমাকে দিয়েছিলেন নারদ; নির্দেশ দিয়েছিলেন, ওটা কল্পনাথকে দিয়ে আসতে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “সুপ্তসর্প তোমার না চেনারই কথা। সবে শিক্ষার্থী তোমরা; অত উঁচুদের মায়া তোমরা জানবে না, এ তো প্রত্যাশিত। কিন্তু তাহলে নারদ তোমার মাধ্যমে কল্পনাথকে মারার ব্যবস্থা করেছিলেন?”

মেঘবর্ণ বলল, “কিন্তু তাঁর কী স্বার্থ থাকতে পারে এর পেছনে? আর নারদের পক্ষে অত কঠিন রাক্ষসমায়ার অস্ত্র নির্মাণ করাও সম্ভব নয়। তাহলে?”

বজ্রধর বললেন, “তার মানে যা ভাবছ, ঠিক তাই। নারদই ছিলেন উর্গাযুর এক চর। উর্গাযুর কাছ থেকেই সুপ্তসর্পের ডিম পেয়েছিলেন তিনি। এতে দুটো লাভ হল। কল্পনাথ সম্ভবত নারদের সঙ্গে উর্গাযুর যোগ জানতে পেরে গিয়েছিল; তাকে মেরে শুধু যে উর্গাযুর খবর চেপে দেওয়া গেল, তাই নয়; তার সঙ্গে নিয়ামক বিনীতেশকে যুদ্ধের জন্য খেপিয়ে তোলাও গেল। বিনীতেশও এক নিরীহ অর্ধরাক্ষসকে শাস্তি দিয়ে অর্ধরাক্ষসমহলে সবার বিরাগভাজন হলেন। অর্থাৎ উর্গাযুর পরিকল্পনা পুরোপুরি সফল হল। তার বজ্রতায় সে এই প্রসঙ্গ তুলে রাক্ষসদের উত্তেজিত করে তুলছিল, মনে আছে?”

মেঘবর্ণ বলল, “আপনি ঠিকই বলছেন, অধিনায়ক বজ্রধর। নারদই তাহলে সেদিন সংগ্রহশালা থেকে পরশুরামের কুঠার চুরি করেছিলেন। নিয়ামক বিনীতেশের কাছ থেকে চাবি চুরি করে সবার অলক্ষ্যে সংগ্রহশালায় ঢোকা একমাত্র ওঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। উর্গায়ুর একাধিক সহচর এখানে আছে, আমরা তো জানিই। সেইরকম কোনো সহযোগীর হাতে উনি অস্ত্রটা পাচার করেছেন, আর সেই সহযোগী সে অস্ত্র পৌঁছে দিয়েছে রাক্ষসদের হাতে। কিন্তু নিধি, একটা কথা বলো। নারদ যে তোমাকে ব্যবহার করে এই কাজটা করালেন, সে কথা আমাদের একবারও বললে না কেন?”

নিধি বলল, “আমাকে নারদ বলেছিলেন, আমাকে বিশ্বাস করে তিনি একটা কাজ দিতে চান, যাতে সমরগরিমা আয়তনের মঙ্গল হবে। ডিমটা এনে আমাকে দিয়ে তিনি বলেছিলেন এটা চুপিচুপি কল্পনাথকে দিয়ে আসতে। তখনও আমি জানতাম না, ওটা দিয়ে ওকে মারার ষড়যন্ত্র করেছেন তিনি। কল্পনাথের মৃত্যুর পর আমি গিয়ে জানতে চাইলাম, আমাকে দিয়ে তিনি এই জঘন্য কাজটা করালেন কেন! তখন উনি বললেন, কল্পনাথ ছিল শর্বরের চর। আয়তনের ভেতরের খবর নাকি গোপনে পাচার করত সে বাইরে। তাই আয়তনের স্বার্থেই তাকে সরিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। আমি বললাম, ‘তাহলে সমরোত্তমদের এবার বলুন পুরো ব্যাপারটা।’ উনি বললেন, ‘আমি সময়মতো ঠিক বলব’।”

শ্যামশ্রী বললেন, “তুমি তো আমাদের বলতে পারতে।”

নিধি অসহায়ভাবে বলল, “কী করে বলব? পরের দিনই সহকারী নিয়ামক মহোদয় আবার ডেকে পাঠালেন আমাকে। বললেন, আমি যদি এ-ব্যাপারে মুখ বন্ধ না রাখি, তাহলে আমার বাবা যে ছায়াভবনে মাল্যপর্বতের রাক্ষসদের বজ্রতা গুনতে যায়, সে কথা তিনি নিয়ামক বিনীতেশের কানে তুলে দেবেন। কী করে তিনি ও খবর জোগাড় করেছিলেন জানি না, কিন্তু কথাটা সত্যি। নিয়ামক মহোদয় এ সংবাদ পেলে আমার বাবাকে আর জীবন্ত খুঁজে পাওয়া যেত না। তিনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন, আয়তনের নিরাপত্তার জন্যই নাকি আমার এখন চুপ করে থাকা প্রয়োজন; সময় হলে তিনি নিজেই সমরোত্তমদের সব জানাবেন। আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আমি নাকি দারুণ একটা কাজ করেছি, আর এ-ব্যাপারটা যেহেতু সমরগরিমার নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত, তাই আমার নাম আপাতত উনি গোপন রাখবেন।”

মেঘবর্ণ বলল, “তোমার একবারও সন্দেহ হল না?”

নিধি বলল, “আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি। অধিনায়ক বজ্রধর, আমি... আমাকে কি আপনারা বিশ্বাসঘাতক ভাবছেন?”

বজ্রধর একটু হেসে বললেন, “না, নিধি। তুমি বাচ্চা মেয়ে – নারদ অনেক বড়োমাপের ধুরন্ধর ছিলেন। তোমাকে স্রেফ ব্যবহার করেছেন তিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে। আর আজ সম্ভবত নিজের বিপদ বুঝতে পেরেই অভীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু উর্গায়ুর অন্য কোনো চর তার আগেই তাঁকে চিরতরে চুপ করিয়ে দিল।”

শ্যামশ্রী এসে হাত রাখলেন নিধির কাঁধে; বললেন, “যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে ভেব না। আপাতত আগামীকালের অভিযান নিয়ে মানসিক প্রস্তুতি নাও বরং।”

বজ্রধর বললেন, “হ্যাঁ, প্রস্তুতি নাও। আর আজ লীনা এবং নিধি দু’জনেই গিয়ে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে দেখা করে আসবে। আয়তনের নিয়ম, যুদ্ধে যাওয়ার আগে প্রতিটি যোদ্ধাকে দেখা করে আসতে হয় প্রিয়জনদের সঙ্গে। আমি বাকিদেরও জানিয়ে দিচ্ছি।”

মেঘবর্ণ খুশিমুখে বলল, “ঐশিকশ্রেষ্ঠ এই নিয়মটা বেশ ভালো তৈরি করেছিলেন। যুদ্ধে যাওয়ার আগে প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করে যাওয়াটাই ভালো – যদি আর দেখা না হয়!”

বজ্রধর যেন শুনতেই পাননি এমন মুখের ভাব করে বললেন, “নিয়ম নিয়মই। সবাইকে তা মানতে হবে। তোমরা দেখা করে আসবে তোমাদের নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে – তবে আজ সময় বেশি পাবে না। মেঘবর্ণ, তুমি থেকে ওদের সঙ্গে।”

মেঘবর্ণ মাথা দুলিয়ে “হ্যাঁ” বলল।

বজ্রধর বললেন, “কাল ভোরবেলা সূর্যোদয়ের সময় সবাই উপস্থিত হবে অনুশীলন মঞ্চের মাঠে। সঙ্গে সাধ্যমতো অস্ত্র নেবে – যে অস্ত্রে সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করো, সেই অস্ত্রই নেবে। অস্ত্রাগার খোলা থাকবে আজ রাত থেকেই।”

ওরা নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এল সম্মেলন কক্ষ থেকে। মেঘবর্ণও এল ওদের সঙ্গে।

সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই। দ্রুত সারতে হবে সাক্ষাৎকার পর্ব। কাল যারা যুদ্ধে যাবে, তারা জড়ো হচ্ছে মাঠে। মেঘবর্ণ বলল, “প্রথমে আমরা যাচ্ছি সুদক্ষিণসারি।”

ওরা তিন বন্ধু বাকিদের সঙ্গে মেঘবর্ণের পেছন পেছন চলল। অভী চুপ করে ভাবছিল নারদের কথা। ওই লোকটি যে তলে তলে এত গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, সে ধারণাও করতে পারেনি। নারদেরই বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। - “বুদ্ধিমান এখানে সবাই, অভী। শুধু কে কার বুদ্ধিকে টেক্কা দিতে পারল, সেটাই আসল কথা।”

নারদই যে এতদিন ওদের সবার ওপর টেক্কা দিয়ে আসছিলেন, সেটা আজ বোঝা যাচ্ছে।

ওঁর কাছেই তাহলে উর্গায়ু সংবাদ পেয়েছিল যে নীলাদ্রর ছেলে আয়তনে এসেছে, আর তার নাম অভী।

চলতে চলতে নিধির কথা কানে এল তার। - “সত্যি বলছি, আমি অনেকবার ভেবেছি তোমাদের কথাটা বলব, কিন্তু নারদের সাবধানবাণী উপেক্ষা করে আর বলে উঠতে পারিনি।”

লীনা বলল, “আরে ঠিক আছে। চলো তো। বাড়ির সবার সঙ্গে দেখা হবে। মুখ শুকনো করে রেখো না; আনন্দ করো।”

নিধির মুখটা তবু এখনও শুকনোই হয়ে আছে। সে বলল, “সত্যি বলছ, তোমরা আমাকে খারাপ ভাবছ না?”

অভীর মনে পড়ে গেল, তার যখন মন খারাপ ছিল, তখন নিধি কতরকম ভাবে তার মন ভালো করতে চেয়েছে, তাকে হাসাতে চেয়েছে। সে বলল, “নিধি, যদি আবার এই কথা বলো, তাহলে কী হবে জানো কি?”

“কী হবে?”

“আমি অর্ধরাক্ষস নই, তাও আমি তোমার কঙ্কাল ঝুলিয়ে রাখব আমার ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে।”

নিধি হেসে ফেলল। - “উত্তর-পশ্চিম কোণে অর্ধরাক্ষসের কঙ্কাল? নাঃ, আমাদের অর্ধরাক্ষস বাস্তুশাস্ত্রেও সম্ভবতঃ এর কোনো মানে লেখা নেই।”

হাসিঠাটা করতে করতে ওরা এসে পৌঁছোল সুদক্ষিণসারিতে।

নিধির বাড়িতে আজ অবশ্য ওরা গতবারের চেয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেল। নিধির মা খুব করে ওদের বাড়ির ভেতরে ডাকছিলেন। কিন্তু নিধি বলল, “না মা, আজ আর ভেতরে গিয়ে বসা হবে না আমাদের। সময় খুব কম দিয়েছেন অধিনায়ক বজ্রধর। সবাইকে একবার এইখানেই ডাকো। একবার দেখা করে নিয়ে চলে যাব।”

নিধির বাবা বেরিয়ে এলেন। “যুদ্ধে যাচ্ছিস? মানুষদের সঙ্গে? রাক্ষসদের মারতে?”

নিধি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে কিছুক্ষণ। তারপর বলল, “না, যারা আমাদের অর্ধরাক্ষসদের শত্রু, যারা আমাদের সমরগরিমার শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি।”

নিধির মা তার বাবাকে বললেন, “তুমি থামো তো বাপু। মেয়েটা যাওয়ার আগে সবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, আর তুমি তোমার সেইসব উলটোপালটা কথা বকবক করে চলেছ। অভী, লীনা, সাবধানে থেকো কিন্তু তোমরা। আর আমার এই ক্ষাপা মেয়েটাকে একটু নজরে রেখো।”

ওরা মাথা নাড়ল। নীপা এসে নিধিকে খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, একটু ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে নিল। তারপর লীনা আর অভীকে শুভেচ্ছা জানাল সে চোখের জল মুছতে মুছতে।

অভী হাসল তার দিকে তাকিয়ে। বাবা-মায়ের কান এড়িয়ে নীপা বলল, “অভীদাদা, লীনাদিদি, ও-ও যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে। ওকে দেখো কিন্তু।”

অভী বলল, “দেখব।”

লীনা হেসে বলল, “কোনো চিন্তা নেই, নীপা। তোর জিনিস তোর কাছে আস্ত ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব রইল আমাদের। যদি আমরা বেঁচে ফিরি, তাহলে তরুণও ফিরবে।”

গুরুজনদের সবাইকে প্রণাম করে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অভী-রা চলল মানবমন্দিরের দিকে। অভী খেয়াল করল, মেঘবর্ণ বিশেষ কথা বলছে না - কী যেন ভাবছে সে।

নিধি বলল, “বাবার সঙ্গে এই মুহূর্তে বেশি কথা বলতে চাইছিলাম না। তাই আর ভেতরে ঢুকলাম না। লীনা, তুমি গিয়ে বরং তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসো। আমরা এখানেই দাঁড়াচ্ছি।”

লীনা আপত্তি করে বলল, “তা কেন? তোমরাও চলো। বেশিক্ষণ তো এমনিতেই থাকা হবে না আজ।”

অগত্যা মানবমন্দিরে পৌঁছে ওরাও বাড়ির ভেতরে এল লীনার পিছু পিছু; প্রণাম করল লতাদেবীকে। তিনি ওদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, “যুদ্ধে যাচ্ছ, তাই আর চোখের জল ফেলে অমঙ্গল করব না। কিন্তু প্রার্থনা করি, তোমরা বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো।”

একটু পরেই ওরা উঠে পড়ল। কালকের প্রস্তুতি নিতে দ্রুত ফিরতে হবে আয়তনে।

লতাদেবী বললেন, “লীনা, সমরোত্তম মেঘবর্ণ এসেছেন নিশ্চয়ই তোদের সঙ্গে?”

লীনা বলল, “হ্যাঁ, মা। বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন। ডাকব?”

লতাদেবী বললেন, “থাক। ডাকলেও উনি আসবেন না। আমিই যাচ্ছি বাইরে।”

বাইরে এসে দাঁড়ালেন তিনি ওদের সঙ্গে। মেঘবর্ণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে আনমনে কী যেন ভাবছিল। লতাদেবী এগিয়ে গেলেন। - “সমরোত্তম মেঘবর্ণ।”

প্রচণ্ড চমকে উঠে সে পেছনে ফিরে তাকাল।

লতাদেবী আবার বললেন, “কাল যুদ্ধে যাচ্ছেন শুনলাম। ছেলেমেয়েগুলোকে দেখবেন। আর সাবধানে থাকবেন আপনিও।”

অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মেঘবর্ণ। তারপর বলল, “তোমার মেয়েকে নিয়ে চিন্তা নেই, লতা। ও খুব ভালো যোদ্ধা। ও ফিরে আসবে নিরাপদেই।”

লতাদেবী শান্তস্বরে বললেন, “শুধু আমার মেয়ের কথা বলিনি তো।”

মেঘবর্ণ একটু হাসল। “আচ্ছা। ধন্যবাদ। চেষ্টা করব সাবধানে থাকার।”

আর কোনো কথা না বলে ফিরে গেলেন লতাদেবী।

ফেরার পথে অভী ফিশফিশ করে নিধিকে বলল, “ছেলেদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার সেই ব্যাপার নাকি হে?”

নিধিও ফিশফিশ করে বলল, “মনে হচ্ছে তো সেইরকমই। লীনা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলে মারবে না তো?”

তার বলার ভঙ্গিতে একটু হেসে লীনা বলল, “বুঝেছি। যা ভাবছ, কিছুটা তাই বটে। মেঘবর্ণের বরাবরই একটু ইয়ে ছিল মায়ের প্রতি। মা বুঝেছিল, কিন্তু সে তো ভালোবাসত বাবাকে। মেঘবর্ণও নিপাট ভদ্রলোক; কখনও কিছু বলেইনি। বাবা মারা যাওয়ার পরেও চুপ করেই থেকেছে।”

নিধি ফিক ফিক করে হেসে বলল, “জানি, জানি। নিপাট ভদ্রলোকগুলো এইরকম আত্মত্যাগ করেই মরে। আচ্ছা লীনা, তোমার মায়ের মন এখন ওর প্রতি একটুও কি নরম হয়নি?”

লীনা তার মাথায় এক চাঁটি মেরে বলল, “সাহস থাকলে সেটা মাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো না!”

জিভ কেটে হাসল নিধি। অভীও হাসল। মেঘবর্ণ অনেকটা এগিয়ে গেছে ওদের থেকে। সে এসব গুনতে পাচ্ছে না, অভী জানে। তার প্রতি হঠাৎ খুব শ্রদ্ধা অনুভব করল সে।

আত্মত্যাগ বড়ো সহজ কাজ নয়। সবাই পারে না।

আয়তনে ফিরে ওরা সম্মেলন কক্ষে দেখা করল অধিনায়ক বজ্রধরের সঙ্গে। তিনি বললেন, “আজ সবাই তাড়াতাড়ি গুয়ে পড়বে। ঘুম আসুক বা না আসুক, গুয়ে থাকবে। আগামীকাল সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সবাইকে যেন পাই অনুশীলন মঞ্চের মাঠে।”

আয়তনের অনেক ছাত্রছাত্রীও ছিল সম্মেলন কক্ষে। চঞ্চল আর পর্বতও ছিল। বজ্রধর বললেন, “যারা এখানে থাকবে, তাদের ওপর দায়িত্ব থাকছে আমাদের অনুপস্থিতিতে আয়তনকে রক্ষা করার। পর্বত আমাদের সঙ্গে কাল যাবে। চঞ্চল, তোমার ওপর রইল আয়তনের সিংহদরজা রক্ষার ভার। শিক্ষার্থীগণ, এবার তোমরা যাও। কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিযান শুরু হবে।”

ওরা চলে যাচ্ছিল, পেছন থেকে বজ্রধর ডাকলেন, “অভী।”

অভী ঘুরে দাঁড়াল। বজ্রধর বললেন, “চন্দ্রহাস সঙ্গে নিয়ে যেয়ো কাল। একটা মহৎ কার্যে যাচ্ছ তুমি, যাতে অনেক মানুষের প্রাণরক্ষা হতে পারে। আমার বিশ্বাস, কাল ওই তরবারি তোমার কাজে আসবে।”

সম্মতি জানিয়ে অভী মিত্রভবনে ফিরে এল বন্ধুদের সঙ্গে। খাওয়া-দাওয়া সেরে গুয়েও পড়ল তাড়াতাড়ি। আশ্চর্যের বিষয়, ঘুমও আজ তার এল খুব একটা কষ্ট না করেই।

কিন্তু ঘুমের মধ্যে সেই দুঃস্বপ্নটা আবার দেখল সে। জ্বলন্ত অগ্নিগহ্বরে তাকে লাথি মেরে ফেলে দিচ্ছে শর্বর। পড়তে পড়তেও সে দেখতে পাচ্ছে, শর্বরের ডান গালে সিংহের উক্কিটা যেন জ্বলজ্বল করছে। সে পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে...

ঘুমটা ভেঙে গেল। জানালার বাইরে শান্ত, নিঃশব্দ রাত্রি। কপালের ঘাম মুছল অভী।

বালিশের তলায় রাখা ছিল স্বপ্ন-উপলটা। জিনিসটার কথা মনে হতেই হাতড়ে হাতড়ে বার করে আনল সে ওটাকে। এই বস্তু মাথার নীচে রেখে ঘুমানোর জন্যই কি এইসব অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছে সে? ওটাকে বার করে এনে সে গুঁজে রাখল তার পোশাকের মধ্যে; তারপর আবার চোখ বন্ধ করল।

ঘুমটা তার ডাঙল ভোরের একটু আগেই। দ্রুত তৈরি হয়ে নিল সে। আজ যুদ্ধে যাবে। মনের মধ্যে উত্তেজনা টগবগ করছে।

কক্ষের বাইরে এসে অভী দেখল, লীনা আর নিধি দু'জনেই তৈরি। মিত্রমাসি বললেন, “পেটভরে খেয়ে নাও। কখন কী খেতে পাবে আবার, কেউ জানে না। আর সঙ্গেও শুকনো খাবার কিছু বেঁধে দিচ্ছি। খুব দরকার পড়লে

কাজে লাগবে।”

অভী আপত্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু লীনা বলল, “হ্যাঁ, দরকারের সময় প্রাণরক্ষা করতে পারে এই রসদ। নিয়ে নাও অভী, আর ‘না না’ কোরো না।”

বেরোবার আগে মিত্রমাসিকে প্রণাম করল ওরা। মিত্রমাসি বিড়বিড় করে বললেন, “হে ঐশিকশ্রেষ্ঠ, হে যুদ্ধদেব, এই ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করুন।”

মিত্রভবন থেকে বেরিয়ে এসে অভী বলল, “তোমরা যাও। আমি এক দৌড়ে চন্দ্রহাসকে নিয়ে আসছি।”

আয়তনে পৌঁছে অভী দেখল, শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণ কথা বলতে বলতে আসছেন এই পথ দিয়েই। অভী বলল, “সমরোত্তম মেঘবর্ণ, অধিনায়ক বজ্রধর আমাকে চন্দ্রহাস নিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন।”

মেঘবর্ণ বলল, “হ্যাঁ, জানি। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এসো।”

সংগ্রহশালার চাবি খুলে সে বলল, “যাও, নিয়ে এসো।”

অভী দ্রুতপায়ে গিয়ে চন্দ্রহাসকে তুলে নিল হাতে; ফলকের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, “আমি শরণাগত। তুমি আমার ন্যায়যুদ্ধে সহায় হও।”

সাদা আলোর মৃদু আভা খেলে গেল বন্ধিম ফলকের দেহে। অভী অনুভব করল, খুব হালকা লাগছে তরবারিটা তার হাতে। অর্থাৎ চন্দ্রহাস তাকে সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছে।

অস্ত্রটা নিয়ে সে বেরিয়ে এসে বলল, “আমরা কীসে যাব মাল্যপর্বত পর্যন্ত? জটায়ুবাহিনীর সঙ্গে?”

শ্যামশ্রী বললেন, “সেরকম হলে ভালোই হত, কিন্তু শিক্ষার্থীদের সকলের নিজস্ব গৃধ্রপক্ষী নেই। আমাদের যেতে হবে জলপথে – মৃত দেবতার নদী পেরিয়ে।”

মেঘবর্ণ বলল, “এই মুহূর্তে আকাশপথে যাওয়ার বিপদও আছে। রাক্ষসদের হাতে সম্ভবত প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণখেচরের পালক লাগানো তির আছে। ওরা যদি ইতিমধ্যেই ওখানে পৌঁছে গিয়ে থাকে, তাহলে জটায়ুবাহিনীর সঙ্গে গেলে ওরা আমাদের স্রেফ উড়ন্ত পাখিশিকারের মতো করে মারবে।”

সবার সঙ্গে যখন যোগ দিল ওরা, তখন পূর্ব আকাশটা গোলাপি হয়ে উঠেছে। সূর্য উঠবে আর অল্লক্ষণের মধ্যেই।

সমরোত্তমরা আর পর্বতকে নিয়ে মোট কুড়িজনের দল। অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, “শিক্ষার্থীরা, তোমরা অনেকেই এই প্রথম সমরগরিমার হয়ে কোনো অভিযানে যাচ্ছ। মনে রাখবে, আমরা কিন্তু সরাসরি যুদ্ধে নামতে যাচ্ছি না। তাই খুব প্রয়োজন না হলে আমরা যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকব। শর্বরকে যেখানে বন্দি করে রাখা হয়েছে, তা খুবই দুর্গম স্থান। মায়াবন্ধনী দিয়ে সেই স্থান ঘিরে রেখেছিলেন স্বয়ং ঐশিকশ্রেষ্ঠ। সে বন্ধনী ছেদন করে শর্বরের কাছে রাক্ষসদের পৌঁছোনো অসম্ভব বললেই চলে। যদি সে অসম্ভব কোনোক্রমে সম্ভব হয়ও, তারপর অচলগুহার ভেতরে শর্বর যেখানে আছে, সেখানে সে বরুণপাশে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে একটা হ্রদের ওপরে। সেই হ্রদ থেকে বেরিয়েছে মৃত দেবতার নদী, কাজেই বুঝতেই পারছ, জলটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমাদের কাজ,

অচলগুহায় পৌঁছে নিশ্চিত করা যে শর্বরের বন্ধন অটুট আছে।”

একটু থেমে সবার মুখগুলো একবার দেখে নিয়ে বজ্রধর বললেন, “রাক্ষসদের হাতে পরশুরামের কুঠারের মতো দৈব-অস্ত্র থাকায় আমরা আন্দাজ করতে পারি, তারা শর্বরের বাঁধন কেটে ফেলবে। যদি সেরকম হয়, আমাদের কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অবশ্য রাক্ষসরা এসে পৌঁছোনোর আগেই আমাদের শর্বরের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ওরা যদি ততক্ষণে খুব কাছে এসে গিয়ে থাকে, তাহলে অচলগুহাতেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে, যদিও আমরা চেষ্টা করব আপাতত সমরগরিমায় ফিরে এসে আমাদের পুরো সেনাশক্তি নিয়ে যুদ্ধে নামার। কিন্তু ওরা যদি ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়ে থাকে ওখানে, তাহলে কিন্তু যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকাই ভালো।”

শ্যামশ্রী বললেন, “এবার সমরগরিমার যোদ্ধাগণ, আমার সঙ্গে সঙ্গে শপথবাক্য উচ্চারণ করো। বলো, আমি সমরগরিমার যোদ্ধা; আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যুদ্ধে বিজয় অর্জন করব। যদি মৃত্যু আসে, তাকে বীরের মতো বরণ করব, কিন্তু কোনোভাবেই আমার অমূল্য সমরগরিমার অমর্যাদা করব না।”

ওরা সবাই একসঙ্গে শপথবাক্য উচ্চারণ করল তাঁর সঙ্গে। কথাগুলো বলতে বলতে অভীর মনে হল, তার সারা শরীরে যেন অদ্ভুত একটা জোর পাচ্ছে সে, মনে বল পাচ্ছে। তারপর বজ্রধর বললেন, “চলো, এবার আমরা যাব মৃত দেবতার নদীর দিকে।”

পীতপত্রবনের মধ্যে এই ভোরবেলাটা কী সুন্দর লাগছে। কোমল আলোয় ভরে আছে গাছপালাগুলো; কতরকমের পাখি যে ডাকছে ডালে ডালে। দল বেঁধে সারি দিয়ে চলেছে ওরা। পায়ের তলায় মচমচ করে ভাঙছে শুকনো পাতা। সূর্য উঠছে সবে; পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে পূর্বদিকের লাল আকাশটা দেখা যাচ্ছে। নির্মল প্রভাতি হাওয়ায় মনটা যেন ভালো হয়ে যাচ্ছে অভীর। একবার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে অকারণেই হেসে নিল সে।

লীনা আর নিধির মুখে উত্তেজনার ছাপ। এতদিন যার গল্পই শুধু শুনে এসেছে, সেই শর্বরকে সামনাসামনি দেখবে বলে তাদের যেন আর তর সইছে না।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর ওরা পৌঁছোল মৃত দেবতার নদীর তীরে। সেদিন রাতে অভী আর লীনা যেখানটায় এসে পড়েছিল, এটা তার অনেক পশ্চিম দিকের তীর। নদীর হলদে জলটা বয়ে চলেছে – জলে স্রোত খুব। অভী ভাবল, এই নদী পেরোবে কী করে তারা!

অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, “তোমরা সবাই স্থির হয়ে দাঁড়াও। কেউ কোনো কথা বোলো না। আমি মৃত দেবতার কাছে মনে মনে প্রার্থনা করব। প্রসন্ন হলে তিনি আমাদের সাহায্য করবেন।”

নদীর দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে বসে বজ্রধর বুকের কাছে হাতজোড় করে চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর দেহ নিষ্পন্দ হয়ে গেল, যেন ধ্যান করছেন তিনি।

সমরগরিমার যোদ্ধারা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, অপেক্ষা করতে লাগল। একটু দূরের বন থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে পাখির ডাক; এছাড়া পুরো

অঞ্চলটা নিস্তব্ধ। পূর্বদিকের নদীর বাঁকে সকালের আলো পড়েছে; পেছনের বনটা ভরে আছে হালকা সবুজ একটা আভায়। আর বজ্রধর বসে আছেন স্থির হয়ে – সেদিকে দেখতে দেখতে অভীর মনে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল।

বজ্রধর যেন মনে মনে কথা বলছেন অদৃশ্য কারও সঙ্গে।

বন্ধুদের মুখের দিকে একবার দেখে নিল সে। ওরা কেউ বোধহয় কিছু বুঝতে পারছে না। অভীর মনে হল, সে যেন তার মাথার মধ্যে কারও কথা শুনতে পাচ্ছে। অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছে না এসব কথা, কিন্তু সে পাচ্ছে – তার মাথার মধ্যে যেন ঢেউ উঠছে শব্দগুলোর।

অপার্থিব একটা সুরেলা, গম্ভীর কণ্ঠ যেন বলছে, “বজ্রধর, তুমি তৈরি তো?”

বজ্রধর যেন বলছেন, “আয়তনকে রক্ষা করার জন্য আমি সব কিছু করতেই তৈরি। একটা মানুষের প্রাণের আর কী এমন দাম?”

সেই কণ্ঠ বলল, “অভী, একদিন দেখা হবে তোমার সঙ্গে আমার।”

নিজের মাথার মধ্যে সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর তার নাম ধরে ডাকছে শুনে অভী ভয়ানকভাবে চমকে গিয়ে বুঝতে পারল, সে যে এই কথাবার্তা শুনছে, তা বুঝতে পেরে গেছে ওই অপার্থিব কণ্ঠের অধিকারী। আপনা থেকেই হাঁটু মুড়ে চোখ বন্ধ করে সে বসে পড়ল নদীর দিকে মুখ করে। লীনা ছিল তার পাশে; সে অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে।

তার মাথার মধ্যে সেই কণ্ঠস্বর তখন বলছে, “আজ মৃত্যু আসবে তোমাদের মাঝখানে। প্রস্তুত থেকো।”

অভী বলল, “কার মৃত্যু?”

“যাদের সময় ফুরিয়েছে, তাদের সবার মৃত্যু। তাই শোক কোরো না। প্রস্তুত থেকো। ...বজ্রধর, তোমার হাতের অস্ত্রে সেই মৃত্যুর স্পন্দন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। যাও, যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। নীরসেনারা আসছে তোমাদের কাছে। তারা তোমাদের পার করে দেবে এই নদী।”

মাথার মধ্যে মিলিয়ে গেল সেই কণ্ঠস্বর। অভী চোখ খুলে দেখল, বজ্রধর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন। সেও উঠে পড়ল।

বজ্রধর বললেন, “দেবতা সাড়া দিয়েছেন। নীরসেনারা আসছে, তারা আমাদের পার করে দেবে। তাদের দেখে কেউ ভয় পেয়ো না যেন। আর হ্যাঁ, কেউ তাদের সামনে অস্ত্র বার করবে না। এই নদীর তীরে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র নিষ্কাশন করা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ।”

অভীর মনে পড়ে গেল সেই রাক্ষসগুলোর কথা; লীনার দিকে একবার তাকিয়ে নিল সে।

ওদের সামনে নদীর তলা থেকে উঠে এল চারখানা নৌকা। এরকম নৌকা অভী কখনও দেখেনি। তাদের দেহগুলো তৈরি হয়েছে অদ্ভুত কোনো সোনালি ধাতু দিয়ে – সকালের রোদে সে ধাতু সোনার মতোই উজ্জ্বল লাগছে। নৌকার সামনে একটা মহিষের মুখের ধাতুর ডাক্ষর্য – এইরকম মহিষমুখী নৌকা দেখে ওদের কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। নৌকার বাইরেটা সোনালি

হলেও ভেতরটা নিকষ কালো – যেন কোনো আলো, কোনো রং ওর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। প্রত্যেক নৌকায় বসে আছে একজন করে নীরসেনা।

অভী আর লীনা এর আগে এদের দেখেছে, কিন্তু দলের অনেকেই দেখেনি। ভয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল তারা আঁশভরতি শরীর আর মাথায় শিংযুক্ত ভয়ংকর আকৃতির নীরসেনাদের দেখে। অভী গুনল, তরুণ হেঁচকি তুলল একটা।

বজ্রধর একবার হাত তুলে সবাইকে বললেন, “ভয় নেই। মোট কুড়িজন আছি আমরা; পাঁচজন করে উঠতে হবে প্রত্যেকটি নৌকায়।”

নীরসেনাদের দিকে ফিরে নমস্কার করে তিনি বললেন, “হে মাননীয় নীরসেনাগণ, আপনারা যে আমাদের সাহায্যার্থে এসেছেন, সে জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।”

নীরসেনাদের একজন প্রতিনমস্কার করল। “আমাদের প্রভু আপনার ওপর প্রসন্ন, অধিনায়ক বজ্রধর। কিন্তু আজ মৃত্যু আসবে অনেককে নিয়ে যেতে, ভুলবেন না।”

অধিনায়ক বজ্রধর তাঁর হাতের দণ্ডটা দেখিয়ে বললেন, “আমি তার সংকেত পাচ্ছি এখানে।”

মেঘবর্ণ দাঁড়িয়ে ছিল অভীদের কাছে। সে ওদের বলে দিল, “তাড়াহুড়ো করবে না একদম। নীরসেনাদের এই নৌকায় কোথায় পা দিচ্ছ, দেখতে পাবে না। তাই পায়ের তলায় শক্ত কিছু না পাওয়া পর্যন্ত পা নামিয়ে যাবে। সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, তীর থেকে নৌকায় লাফ দিয়ে পড়া।”

প্রতিটি নৌকায় চারজন করে যোদ্ধা উঠল। তিনজন সমরোত্তম এবং পর্বত – প্রত্যেকে একটি করে নৌকায় উঠলেন।

অভীদের নৌকায় মেঘবর্ণ উঠছিল; সে বলল, “আমাকে দেখো। এই ভাবে লাফ দিয়ে পড়বে ভেতরে।” অভী দেখল, নৌকায় লাফিয়ে পড়তেই মেঘবর্ণকে আর বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না; যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে সে।

নৌকায় চড়ার অভ্যাস কোনোদিনই ছিল না অভীর। টলমল করতে করতে কোনোক্রমে উঠবার চেষ্টা করতে লাগল সে। নৌকার ভেতর থেকে অদৃশ্য মেঘবর্ণ বলল, “অভী, লাফ দাও, লাফ দাও।”

অন্যান্য নৌকাতেও টলমল করতে করতে উঠছে শিক্ষার্থী যোদ্ধারা। এই নৌকাগুলোতে কেউ একবার নেমে গেলেই তাকে আর দেখা যাচ্ছে না বাইরে থেকে।

নদীতীরে দাঁড়ানো নীরসেনাদের মুখ ভাবলেশহীন, যেন এসবে তাদের কিছু যায় আসে না। তাদের ত্রিশূলের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে হীরার মতো চকচক করছে সকালের রোদ।

নিধি বলল, “অভী, সাহস করে একটা লাফ দাও। তারপর আমাদের উঠতে দাও।”

অগত্যা অভী লাফিয়ে পড়ল নৌকার মধ্যে। মনে হল, যেন একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে লাফ দিল সে।

পরক্ষণেই দেখল, মেঘবর্ণের পাশে এসে বসেছে সে। ভেতরটা কালো হলেও এখন সব দেখা যাচ্ছে। পাশের নৌকাটার সামনে দাঁড়িয়ে কীভাবে উঠবে বুঝে উঠতে পারছে না তরুণ। এই নৌকায় নিধি আর লীনা ভয়ে ভয়ে লাফ দিয়ে পড়ার উদ্যোগ করছে। ওদের সঙ্গে আছে মৃগেন্দ্র।

বন্ধুরা একে একে এসে পড়ল নৌকার মধ্যে। ওদের চোখে অবাক দৃষ্টি। মেঘবর্ণ বলল, “এবার শান্ত হয়ে বোসো। নদী পেরিয়ে ওপারে গিয়ে পাহাড়ে উঠতে হবে আমাদের।”

এক নীরসেনা উঠে এল নৌকায়। হাতে দাঁড় তুলে নিয়ে সেটাকে জলে ডুবিয়ে রাখল সে - নৌকা চলতে শুরু করল নিজে থেকেই।

মেঘবর্ণ বলল, “ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আজ হয়তো আমাদের যুদ্ধ না-ও করতে হতে পারে; তার সম্ভাবনাই বরং বেশি। শর্বর ঠিকভাবে বন্দি আছে, এইটুকু দেখে আসাই আজ আমাদের প্রধান কাজ।”

অভী বলল, “আচ্ছা, অধিনায়ক বজ্রধরের হাতের দণ্ডটার ব্যাপারে একটু বলবে? উনি বলছিলেন, ওই অস্ত্রটায় মৃত্যুর সংকেত পাচ্ছেন উনি!”

মেঘবর্ণ একটু গম্ভীরভাবে বলল, “ওটিকে বড়ো সামান্য অস্ত্র ভেবো না। ওই দণ্ড একটি মহাশক্তিশালী মায়া-অস্ত্র। ওকে নিয়ন্ত্রণ করতে অধিনায়ক বজ্রধর ছাড়া আর কেউ পারে না। ওর মধ্যে কী আছে জানো?”

“কী?”

“স্বয়ং মৃত্যুদেবতা যম যে কালদণ্ড ব্যবহার করতেন, তার শক্তির একটা অংশ। তাই ও বড়ো ভয়ংকর অস্ত্র। অধিনায়ক বজ্রধর কীভাবে ও জিনিস পেয়েছিলেন, তার পেছনে আবার এক অদ্ভুত গল্প আছে। পরে কখনও শুনবে সে গল্প। আপাতত এইটুকু জেনে রাখো, যদি বিরাট প্রভাবশালী কোনো লোক বা একসঙ্গে অনেক মানুষের মৃত্যুযোগ উপস্থিত হয়, তাহলে ওই দণ্ডের কম্পনে উনি তা বুঝতে পারেন।”

নিধি পাশ থেকে মন্তব্য করল, “তাহলে যুদ্ধ এড়ানো যাবে না, মনে হচ্ছে।”

মেঘবর্ণ আর কিছু বলল না। ওরা নৌকা থেকে দেখতে লাগল, মসৃণভাবে সকালের রোদে ঝিলঝিল করা হলদে জল কেটে চলেছে ওদের মহিষমুখী নৌকা। অপর তীরের মাল্যপর্বত ক্রমশ এগিয়ে আসছে কাছে।

নৌকা এসে ভিড়ল তীরে। নামাটা অবশ্য নৌকায় ওঠার মতো অত কঠিন নয়; খুব একটা অসুবিধা হল না ওদের।

সামনেই নাতিদীর্ঘ বেলাভূমির পর সুবিশাল মাল্যপর্বতের পাদদেশ। সবাই নেমে আসার পর অধিনায়ক বজ্রধর নীরসেনাদের নমস্কার জানিয়ে বললেন, “আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। দেবতার উদ্দেশে আমার প্রণাম রইল।”

ভাবলেশহীন মুখে নীরসেনাদের একজন বলল, “আমরা আপনার প্রণাম জানাব তাঁকে। বিদায়।”

ভুস করে মৃত দেবতার নদীর জলে ডুবে গেল অদ্ভুত সোনালি নৌকাগুলো। বজ্রধর ফিরে দাঁড়ালেন শিক্ষার্থীদের দিকে; বললেন, “এই পাহাড়ের একটি

চূড়ার কিছুটা নীচে আছে শর্বরের বন্দিশালা - অচলগুহা।”

যোদ্ধারা অনেকেই অস্ত্র নির্গত করছে দেখে তিনি হেসে বললেন, “আরে দাঁড়াও। এত তাড়াহুড়ো কোরো না এখন থেকে। অচলগুহার রাস্তা অতি দুর্গম। এই পাহাড়ের মাথায় ওঠা সহজ নয় মোটেই। তোমরা প্রায় কেউই পর্বত আরোহণে দক্ষ নও। তাহলে আমরা যাব কী করে?”

শিক্ষার্থীরা তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। তিনি বললেন, “এসো আমার সঙ্গে।”

পাহাড়ের ধার বরাবর হাঁটতে হাঁটতে চলল ওরা। মেঘবর্ণ বলল, “এখানে একটা দারুণ ব্যাপার দেখবে তোমরা আজ। শর্বরের গুহাটা অনেক রকম মায়া দ্বারা সুরক্ষিত রাখা ছিল, আগেই তো শুনেছ। আজ সেইরকম একটা মায়ার সুবিধা আমরা কীভাবে নিই, দেখতে পাবে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “শর্বরের গুহার চারপাশে ঐশিকশ্রেষ্ঠ খুব শক্ত দেবমায়ার বাঁধন দিয়েছিলেন। কিন্তু এছাড়াও আরও একটা মায়া দিয়ে ঘেরা আছে অচলগুহা। পৃথিবীর আকর্ষণবলকে গুহার চারপাশে ওইটুকু জায়গায় উলটো করে রাখা আছে। ওই জায়গাটায় একবার পা দিলেই দেখবে কী হয়।”

একটা সরু পাহাড়ি গলিপথে ওদের নিয়ে চললেন অধিনায়ক বজ্রধর। অভী দেখছিল, পাহাড়ের ধূসর গায়ে শ্যাওলা জমে আছে। চলতে চলতে এক জায়গায় সামনে একটা বিশাল খাদ পড়ল। এর পরে আর যাওয়ার রাস্তা নেই।

মনে হচ্ছে, একটা সরু পাথরের চোঙের মধ্যে ঢুকে পড়েছে ওরা। সামনে খাদ, আর তারপরে খাড়া পাহাড়ের দেয়ালটা এতটাই উঁচু যে এখান থেকে তার চূড়াটা দেখাই যায় না। বজ্রধর বললেন, “এইখানে আর কয়েক পা এগোলেই আমরা পড়ব বিপরীত আকর্ষণ মায়াক্ষেত্রে। এই খাদে লাফিয়ে পড়তে হবে আমাদের।”

শুনে অভীর গলা শুকিয়ে গেল। কী বিশাল খাদ - এত গভীর যে এর তলায় কী আছে দেখা যাচ্ছে না! এই খাদে লাফ দিলে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, সে নিশ্চিত।

ওদের শুকনো মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে সমরোত্তমরা সবাই একটু হাসলেন। তারপর মেঘবর্ণ বলল, “বিপরীত আকর্ষণ মায়াক্ষেত্র সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা নেই বলেই এত ভয় পাচ্ছ। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা আমার পেছনে এসো।”

মেঘবর্ণ গিয়ে দাঁড়াল সেই সুগভীর খাদের প্রান্তে। একবার সবার মুখগুলো দেখে নিয়ে বলল, “ভয় পাবে না একদম। শরীরকে খুব টানটান রাখার দরকার নেই। স্বাভাবিকভাবে আমরা যেমন কোনো অল্প উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিয়ে পড়ি, সেইরকমই লাফ দেবে। ব্যস, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। যা করার, মায়াক্ষেত্রই করবে।”

ওদের চোখের সামনে মেঘবর্ণ লাফ দিয়ে পড়ল সেই অন্ধকার খাদে। ভয়ে অভী মুখে হাত চাপা দিয়ে ফেলল।

কিন্তু পরক্ষণেই সে দেখল, মেঘবর্ণের শরীরটা জ্যা-মুক্ত তিরের মতো উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। সোজা উঠে গেল সে প্রচণ্ডবেগে, আর নেমে এল না।

শ্যামশ্রী বললেন, “তোমাদের সমরোত্তম মেঘবর্ণ পৌঁছে গেছেন অচলগুহার সামনে। এবার তোমরা যাও এক এক করে। আমি, অধিনায়ক বজ্রধর আর পর্বত শেষে যাব। অভী, এসো।”

ভয়ে ভয়ে অভী এসে দাঁড়াল খাদের পাশে, একবার উঁকি মেরে দেখে নিল নীচটা। দেখা যাচ্ছে না কিছুই, শুধু কেমন একটা ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকারে ভরে আছে খাদের তলাটা। শ্যামশ্রী বললেন, “ভয় নেই। লাফ দাও। মেঘবর্ণ ওপরে আছে, ও তোমাকে ধরে নেবে।”

“যা থাকে কপালে” ভেবে লাফ দিল অভী গভীর খাদে। আর সঙ্গে সঙ্গেই সে অনুভব করল, তীব্র গতিতে তার শরীরটা উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। যেন অত্যন্ত শক্তিশালী একটা অদৃশ্য স্রোত তাকে ধাক্কা মেরে পৌঁছে দিচ্ছে ওপরে। তার একপাশের পাহাড়ের দেয়াল বরাবর হুশহুশ করে উঠে যাচ্ছে সে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই ওপরে ওঠার বেগ কমে গেল। এবার পড়ছে সে নীচের দিকে। ঠিক পড়ছে না, ভাসতে ভাসতে নামছে – উঁচু থেকে ফেলে দেওয়া একখণ্ড কাগজের মতো। মেঘবর্ণের গলা পাওয়া গেল, “অভী, এই দিকে ভেসে এসো।”

উঁচু পাহাড়ি দেয়ালটার গায়ে একটা বিশাল গুহামুখ দেখা যাচ্ছে; সেখানেই দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকছে মেঘবর্ণ। অভী একটু চেষ্টা করতেই নামতে পারল সেই গুহার সামনের খোলা অঙ্গনে।

“সাহসী ছেলে!” মেঘবর্ণ হেসে বলল। “এখানেই দাঁড়াও। সবাই আসুক, তারপর আমরা যাব।”

তারপরেই এল তরুণ। অভীর দিকে তাকিয়ে একটু বোকামির মতো হেসে সে বলল, “যা ভয়টা পেয়েছিলাম না!”

অভীও একটু হাসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একে একে এসে পড়ল সবাই। সবার শেষে এলেন অধিনায়ক বজ্রধর। বললেন, “যোদ্ধাগণ, অস্ত্র তৈরি রাখো। আমরা এসে পড়েছি। এই হচ্ছে অচলগুহার মুখ। শর্বর বন্দি আছে এইখানেই।”

লীনা আর নিধি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল; ওদের দু’জনেরই কপালে ফুটে উঠেছে ঘামের বিন্দু। মৃগেন্দ্র ওদের তুলনায় অনেক বড়ো এবং অভিজ্ঞ, কিন্তু অভী দেখল, সেও হাতের নখ কামড়াচ্ছে।

আলোহীন গুহার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে অভীর মনে হচ্ছিল, তারা যেন এক নিষিদ্ধ জগতে এসে পড়েছে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই এই জায়গাটার। এই সুগভীর খাদের ওপরে পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে থাকা একচিলতে অঙ্গনে ওরা দাঁড়িয়ে আছে; তির্যক রোদ এসে পড়ছে ওদের সামনে একফালি জমিতে। হাঁ করা কালো গুহার মধ্যে একটুও পৌঁছোচ্ছে না সে আলো। এই সকালেও কেমন যেন একটা দমবন্ধ করা পরিবেশ। কোমরে ঝোলানো চন্দ্রহাসকে স্পর্শ করে একটু সাহস পেতে চাইল অভী।

বজ্রধর বললেন, “আমি আগে যাচ্ছি। মেঘবর্ণ আমার সঙ্গে থাকো। তারপর ছাত্রছাত্রীরা পাশাপাশি দু’জন করে আসবে সারিবদ্ধ ভাবে। একদম শেষে থাকবে শ্যামশ্রী আর পর্বত। বোঝা গেছে?”

সবাই মাথা নাড়ল। বজ্রধর বললেন, “জেনে রাখো সবাই, এখানে যা কিছু নড়তে দেখবে, জানবে তাই তোমার শত্রু। আজ আমরা আর অনুশীলন মঞ্চে নেই; আসল যুদ্ধের মাঝখানে এসে পড়েছি। আজ অস্ত্র যখন চালাবে, নিজের প্রাণরক্ষার জন্যই চালাতে হবে, মনে রেখো। চোখ-কান খোলা রাখো। বাইরের এই আলোর মধ্য থেকে প্রথমবার গুহার ভেতরে ঢুকলে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। তাই আমরা অস্ত্র তৈরি রাখব। রাক্ষসরা যদি এসে গিয়ে থাকে, তাহলে যুদ্ধ হবেই।”

দলটা এগিয়ে চলল গুহার দিকে। অভী আছে বজ্রধর আর মেঘবর্ণের ঠিক পেছনেই। তার সঙ্গে আছে মৃগেন্দ্র। তার পেছনেই আছে নিধি আর লীনা।

গুহার ভেতরে ঢুকতেই সে বুঝতে পারল, বজ্রধর ঠিকই বলেছিলেন। বাইরের আলো একটুও এসে পৌঁছেছে না এখানে। চোখে অন্ধকার নেমে এসেছে যেন হঠাৎ করেই। বজ্রধর ফিশফিশ করে বললেন, “এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াব আমরা। চোখ সয়ে গেলে তারপর এগোব।”

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দলটা। বিরাট অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে কেবল কুড়িটা প্রাণীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। খসখসে গুহার দেয়ালে হাত রেখেছিল অভী। কী ঠান্ডা পাথর! নাকে একটা ভেজা ভেজা গন্ধ আসছে তার।

মনে পড়ল, এই গুহার মধ্যে একটা বিরাট হৃদ আছে।

বজ্রধরের সংকেত পেয়ে আবার এগোতে শুরু করল ওরা। মৃগেন্দ্র ফিশফিশ করে অভীকে বলল, “সমরোত্তম শ্যামশ্রীর কাছে আমি শুনেছি, শর্বর নাকি দু’হাতে একটা মানুষকে ধরে দু’টুকরো করে ফেলার ক্ষমতা রাখে।”

অভী একটু হাসল। শর্বর মারাত্মক শক্তিধর তো বটেই, নতুবা স্বয়ং ঐশিকশ্রেষ্ঠ বরুণপাশের মতো মায়া-অস্ত্র দিয়ে তাকে বাঁধবেন কেন?

অনেকক্ষণ হাঁটা হল ওদের। সুড়ঙ্গটা ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। বজ্রধর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

“কী হল, অধিনায়ক বজ্রধর?” মৃগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করল।

বজ্রধর ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, “খারাপ খবর। সুড়ঙ্গের শেষ মুখে আমরা পৌঁছেছি। গুহাটা এইখান থেকেই বিরাট কক্ষের মতো প্রশস্ত হয়ে গেছে। এই জায়গা থেকেই গোটা গুহাটা মায়াবন্ধনী দিয়ে গতবার ঘিরে দিয়ে গিয়েছিলেন ঐশিকশ্রেষ্ঠ।”

ওরা চুপ করে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। এইবার তিনি খারাপ খবরটি দিলেন। “সেই বন্ধন আর নেই। কেউ তাকে ভেঙে দিয়েছে।”

মেঘবর্ণ বলল, “অর্থাৎ রাক্ষসেরা ইতিমধ্যেই হানা দিয়েছে এখানে।”

লীনা পেছন থেকে ফিশফিশ করে বলল, “কিন্তু সেই বন্ধন তো মানুষ-রাক্ষস কারও পক্ষেই ভাঙা সম্ভব নয় শুনেছিলাম। তাহলে কী করে...?”

মেঘবর্ণ বলল, “সে-কথা পরে ভাবা যাবে। আপাতত সবাই অস্ত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকব আমরা। নিজেদের তৈরি রাখব আক্রমণের জন্য। শর্বর সম্ভবত আর ভেতরে নেই। এই বন্ধন ভাঙতে পেরেছে মানে তাকে ওরা নিয়ে চলে

গেছে। তাও সাবধানের মার নেই। তৈরি থাকাই ভালো।”

বজ্রধর এগিয়ে গেলেন। তাঁর পেছনে সবাই চলল। গুহাটা প্রশস্ত হতে হতে বিরাট আকার ধারণ করেছে। এই জায়গাটা পুরোপুরি অন্ধকার নয়; গুহার পাথরগুলো থেকেই মৃদু আলোর আভা বেরিয়ে আসছে। সেই আলোয় ওরা দেখতে পেল অনেকটা দূরের বিরাট জলাশয়টাকে। পুষ্করিণীর পাশের নারকেল গাছ যেমন ঝুঁকে থাকে, তেমনই গুহার ভেতরে অনেকগুলো ধূসর পাথরের উঁচু উঁচু চাঁই ঝুঁকে পড়েছে জলতলের ওপরে। আর তাদের একটার সঙ্গে উজ্জ্বল একটা বন্ধনীতে আবদ্ধ হয়ে জলের ওপর ঝুলে আছে...

শর্বর!

মেঘবর্ণ বিড়বিড় করে বলল, “এটা কেমন হল? মায়াবন্ধনী ভাঙা হয়েছে, অথচ শর্বরকে ওরা নিয়ে যায়নি কেন?”

বজ্রধর বললেন, “তার মানে একটাই। ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এখানে। লুকিয়ে।”

হাতের দণ্ডটা শূন্যে তুলে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, “সাবধান যোদ্ধাগণ! আক্রমণ আসছে!”

সেই মুহূর্তেই বিশাল গুহার নানা কোণ থেকে অন্তত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশজন সশস্ত্র রাক্ষস বিকট শব্দ করে তেড়ে এল ওদের দিকে। শুরু হয়ে গেল প্রবল যুদ্ধ।

সমরগরিমার যোদ্ধারা সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। রাক্ষসদের বেশিরভাগের হাতেই তরবারি; কারও কারও হাতে বর্শা আর গদাও আছে। অভী পড়ে গেল এক গদাধারীর সামনে।

চন্দ্রহাস হাতেই ধরা ছিল তার। গদাধারী রাক্ষস শূন্যে লাফিয়ে উঠে আঘাত হানতে গেল তার মাথায়; অভী দ্রুত পাশে সরে গিয়ে চন্দ্রহাস ঘোরাল। দুটুকরো হয়ে রাক্ষসটা পড়ে গেল মাটিতে। অভী বুঝতে পারছে, চন্দ্রহাস জেগে উঠেছে; প্রবল শক্তিতে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শত্রুনিধনের মধ্য দিয়ে।

তার ডান পাশে পর্বত চারটে রাক্ষসকে একসাথে ধরে মাথায় মাথায় ঠুকে দিতেই প্রচণ্ড একটা শব্দে পরিষ্কার বোঝা গেল, খুলি ফেটে গেছে তাদের। বাম পাশে নিধি তরবারি ঘোরাচ্ছে নিপুণহাতে। একসঙ্গে দুটো রাক্ষস আক্রমণ করেছে তাকে। দু'জনের আঘাত একসঙ্গে ঠেকাচ্ছে সে। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে সে একজনের পায়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করল। পা-কাটা রাক্ষস পড়ে গেল মাটিতে; আর সেই দৃশ্য দেখে তার সঙ্গীর মুহূর্তের অসতর্কতায় নিধি তার তরবারি বিঁধিয়ে দিল তার বুকে।

তরুণ লড়ছিল চারজন রাক্ষসের সঙ্গে। ভালো যোদ্ধা সে; কিন্তু একসঙ্গে চারজনের সঙ্গে একলা ঠিক পেরে উঠছিল না। কোনোক্রমে সে ঠেকিয়ে রাখছিল ওদের। কিন্তু একটা জোর আঘাত আটকাতে গিয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল সে।

তাকে বিপদে পড়তে দেখে অভী এগিয়ে গেল; তার ঘূর্ণায়মান চন্দ্রহাসের সামনে রাক্ষসগুলো মারা পড়ল অল্প সময়ের মধ্যেই।

তরুণ মৃদু স্বরে একবার বলল, “ধন্যবাদ অভী।”

কয়েকটা রাক্ষস ঘিরে ধরল বজ্রধরকে। তিনি একটু এগিয়ে এসে অলস ভঙ্গিতে তাঁর দণ্ড ছোঁয়ালেন সামনের তিন রাক্ষসের শরীরে। ধপ ধপ করে মরে মাটিতে পড়ে গেল তারা – যেন হঠাৎই দেহ ছেড়ে প্রাণ বেরিয়ে গেল তাদের।

মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রীও হালকা চালে তরবারি চালাচ্ছিলেন। আক্রান্ত না হলে আক্রমণ করছিলেন না তাঁরা। যারা সামনে আসছিল, তারা অবশ্য লুটিয়ে পড়ছিল তৎক্ষণাৎ।

অভী দেখতে পেল, গুহার মধ্যে একটা উঁচু পাথরের ওপরে উঠে গেছে লীনা। সেখান থেকে একটা একটা তির ছুড়ছে সে নির্ভুল নিশানায়, আর মাটিতে পড়ে যাচ্ছে একটার পর একটা রাক্ষস। একজন বর্শাধারী তার হাতের অস্ত্রটা ছুড়ে দিল তাকে লক্ষ্য করে। নিধি চিৎকার করে বলল, “লীনা, সাবধান!”

লীনা সতর্কই ছিল; মুহূর্তের মধ্যে মাথা নামিয়ে বসে পড়ল সে। বর্শাটা তার মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

নিধি লাফিয়ে পড়ল আক্রমণকারী রাক্ষসের সামনে; রাক্ষসটা তার কোমরে ঝোলানো তরবারি বার করে তাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই নিধির অস্ত্র তার বুক বিদীর্ণ করে দিল।

মৃগেন্দ্রসহ বাকি ছেলেমেয়েগুলোও দারুণ লড়াই করছে। এ পর্যন্ত তাদের দলের আহত হয়েছে অনেকেই, কিন্তু একজনও মরেনি।

অভীর দিকে তেড়ে এসেছিল আরও দু’জন রাক্ষস। তার চন্দ্রহাসে যেন কী প্রচণ্ড শক্তি ভর করেছে। অভী হাত ঘোরাতে লাগল; রাক্ষসগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল।

যুদ্ধ করতে করতেই একটা জিনিস সে খেয়াল করল। একদম প্রাথমিক আক্রমণটুকু সামলে দেওয়ার পর তিনজন সমরোত্তম আর পর্বত সরে গেছেন একদিকে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন শিক্ষার্থীদের যুদ্ধ। রাক্ষসদের সংখ্যা কমে এসে ঠেকেছে জনা দশেকের। অচলগুহার মাটি ভরে উঠেছে মৃত রাক্ষসের ছিন্ন দেহ আর রক্তে।

ওঁরা দেখছেন ওঁদের ছাত্ররা কতখানি শিক্ষা অর্জন করেছে।

লড়াই করতে করতে ওঁদের কাছে এসে পড়েছিল সে; এমন সময় শুনতে পেল শ্যামশ্রী বলছেন, “হ্যাঁ, ওকে দেখে তার কথা মনে পড়ছে আমার।”

মেঘবর্ণ বলল, “হ্যাঁ, সেই সংগ্রহশালার যুদ্ধেও আমার এই কথাই মনে হচ্ছিল।”

বজ্রধর বললেন, “হবে না কেন? তিনজন অসামান্য যোদ্ধার রক্ত আছে ওর শরীরে, ভুলো না।”

অভী অবাক হয়ে ভাবল, “তিনজন?”

আর কিছু ভাবার আগেই চন্দ্রহাস কেঁপে উঠল তার হাতের মধ্যে; সামনে এসে পড়া রাক্ষস তিনটে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিহত হল। তারপর অভীর চোখ গেল মায়াহুদের ওপর ঝুলে থাকা শর্বরের দিকে।

স্থিরভাবে যুদ্ধদৃশ্য দেখছে সে। কী শীতল সে চোখের দৃষ্টি – যেন এই ক’টা রাক্ষসের প্রাণের মূল্য তার কাছে কিছুই নয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল যুদ্ধ। রক্তে ঘামে ভেজা যোদ্ধাদের দিকে ফিরে একসাথে করতালি দিয়ে উঠলেন তিনজন সমরোত্তম ও পর্বত। অধিনায়ক বজ্রধর বললেন, “যোদ্ধাগণ, তোমরা আজ সমরগরিমার নাম উজ্জ্বল করেছ। তোমাদের শিক্ষক হিসেবে এ আমাদের কাছে অতি আনন্দের ব্যাপার। তোমাদের জন্যই আজ আমরা এক ভয়ংকর বিপদের হাত থেকে সমরগরিমাকে রক্ষা করতে পারলাম। দুষ্ট রাক্ষস শর্বর পালাতে পারেনি তার বন্দিদশা থেকে।”

অভী তাকাল তার বন্ধুদের দিকে। সবার মুখে চওড়া হাসি। লীনা নিধির হাত চেপে ধরে বলল, “এই না হলে বন্ধু!”

শ্যামশ্রী বললেন, “কিন্তু অধিনায়ক বজ্রধর, একটা ব্যাপার একটু সন্দেহজনক লাগছে না?”

“কী?”

“রাক্ষসরা বাইরের মায়াবন্ধনী যেভাবেই হোক ছিন্ন করেছিল, কিন্তু শর্বরকে নিয়ে ওরা পালাল না কেন? ওরা তো আমাদের জন্য লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল। কেন? যারা এখানে লড়াই করছিল, তারা কেউ ওদের প্রথম সারির যোদ্ধা নয় বলেই মনে হচ্ছিল আমার। তাহলে সেইসব ভয়ংকর যোদ্ধা গেল কোথায়? উর্গায়ুই বা কোথায়?”

অভীও বুঝতে পারছিল, ব্যাপারটাতে কোথায় যেন একটা গুপ্তগোল আছে। এই ক’জন অনুগামীর ভরসায় উর্গায়ু নিশ্চয়ই এত বড়ো পরিকল্পনা করেনি। রাক্ষস যোদ্ধাদের আরও দল নিশ্চয়ই আছে। এই রাক্ষসগুলো যে খুব ভালো যোদ্ধা নয়, সে-কথা সেও বুঝতে পারছিল। এর চেয়ে সেদিন রাতে যারা এসেছিল সংগ্রহশালায়, তারা বরং অনেক কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল।

বজ্রধর এগিয়ে গেলেন মায়াহ্রদের দিকে। বললেন, “শর্বর।”

শর্বর তাকাল তাঁর দিকে, কিন্তু কোনো কথা বলল না।

বজ্রধর বললেন, “উর্গায়ু কোথায়, শর্বর?”

শর্বরের নিষ্ঠুর মুখটায় একটা তচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু সে নীরব রইল।

মেঘবর্ণ বলল, “ওর কাছ থেকে কোনো কথা বার করা যাবে না। কিন্তু উর্গায়ু একটা কোনো পরিকল্পনা করেছে, এটা ঠিকই। যদিও ওদের নেতা শর্বরকে এখানে আমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে ওর কোন্ পরিকল্পনা সিদ্ধ হবে, বুঝতে পারছি না।”

পর্বত বলল, “উর্গায়ু এখানে নেই বলেই আমার বেশি চিন্তা হচ্ছে। এই ক’জন রাক্ষস আমাদের সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না, ও কি জানত না? আমাদের এখনই আয়তনে ফেরা উচিত।”

শ্যামশ্রী বললেন, “একদম ঠিক বলেছ, পর্বত। শুধু একটা কথা। অচলগুহার মায়াবন্ধনী আর নেই। রাক্ষসদের কাছে পরশুরামের কুঠারও আছে। এই অবস্থায় একে এখানে রেখে যাওয়াটা ঠিক হবে না। শর্বরকে আমরা আপাতত আয়তনে নিয়ে গেলেই ভালো হবে না কি?”

বজ্রধর বললেন, “আমিও তাই ভাবছিলাম। এসো, ওকে সাবধানে নামিয়ে আনি।”

পর্বত, মেঘবর্ণ আর বজ্রধর বরুণপাশে বদ্ধ শর্বরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। অভী ভাবল, বরুণপাশ তো দৈব অস্ত্র। তার বাঁধন এঁরা কাটবেন কী করে?

দেখা গেল, বাঁধন কাটার দিকে এঁরা গেলেনই না। বজ্রধর বললেন, “শ্যামশ্রী, তুমি তৈরি তো?”

শ্যামশ্রী বললেন, “হ্যাঁ, অধিনায়ক বজ্রধর।”

বজ্রধর তাঁর দণ্ড দিয়ে স্পর্শ করলেন পাথরটার গায়ে; মাঝবরাবর ফাটল ধরল তার গায়ে। পাথরটার অগ্রভাগ শর্বরসহ ভেঙে গিয়ে পড়তে লাগল হৃদের জলের দিকে।

অভী ভয় পেয়ে গেল। ওই জলে পড়া মানে শর্বরের নিশ্চিত মৃত্যু তো!

কিন্তু তার আগেই দেখা গেল, শ্যামশ্রী হাত দোলাচ্ছেন একটা বিশেষ ভঙ্গিতে। শর্বরের নিম্নগতি রোধ হয়ে গেল; সে ভেসে রইল শূন্যে।

তারপর শ্যামশ্রীর হাতের ইঙ্গিতে সেই পাথরটা ভাসতে ভাসতে চলে এল ওদের দিকে। পাথরসহ তাকে এনে গুহার দেয়ালের পাশে বসিয়ে রাখা হল। যোদ্ধারা ঘিরে ধরল তাকে।

রাক্ষসদের মধ্যেও যে সবচেয়ে ভয়ংকর, তাকে এইভাবে দেখার সুযোগ হবে, ওরা ভাবেনি কোনোদিন।

শর্বরের মুখে বাঁকা হাসি; যেন এদের সে মানুষ বলে ভাবতেই রাজি নয়। কিন্তু কিছু সে বলল না, একবার কেবল তাকিয়ে নিল বজ্রধরের দিকে। তারপর তার চোখদুটো এসে স্থির হল অভীর মুখের ওপর।

অভীকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখছে সে। কী দেখছে, সে-ই জানে। তার গালে জ্বলজ্বল করছে সিংহের উল্কিটা, ঠিক যেরকম অভী দেখেছিল স্বপ্নে। স্বপ্নে দেখা দৃশ্যটার কথা মনে হতেই অভীর অস্বস্তি হতে লাগল। চোখ সরিয়ে নিল সে তার দিক থেকে।

শ্যামশ্রী বললেন, “ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। আমি কি ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাব?”

বজ্রধর কী একটা উত্তর দিলেন, অভী শুনল না। সে তখন আবার এগিয়ে এসেছে শর্বরের দিকে।

একটা যেন সন্দেহ হচ্ছে তার।

একটু ভালো করে দেখেই সে চোঁচিয়ে উঠল, “অধিনায়ক বজ্রধর, এ লোকটা শর্বর নয়!”

“মানে?”

“এ একটা ছদ্মবেশী। এ শর্বর হতেই পারে না! ওর গালের সিংহটাকে দেখুন।”

মুহূর্তের মধ্যে বজ্রধর বুঝে ফেললেন অভী কী বলতে চাইছে। যোদ্ধারা সবাই তার কথা শুনে ঘিরে ধরেছে নকল শর্বরকে। বজ্রধর বিস্ফারিত চোখে বললেন, “হে ভগবান! এর যে বাম গালে সিংহের ছবি!”

অভীর স্পষ্ট মনে আছে, শর্বরের ডান গালে সিংহের উষ্ণি দেখেছিল সে। তাড়াহুড়োয় ছদ্মবেশ নিতে ভুল করে ফেলেছে এ লোকটা।

বরুণপাশের বন্ধনটা ভালো করে খুঁজতেই দেখা গেল, এক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের কোপে কাটা আছে সেটা – কেবল গ্রন্থি দিয়ে আবার সে বন্ধন কোনো ক্রমে জড়ানো আছে তার গায়ে।

মেঘবর্ণ সঙ্গে সঙ্গে তরবারি বার করে ঠেকাল লোকটার গলায়। “বল তুই কে? নয়তো এইখানেই তোকে শেষ করে দিয়ে যাব!”

এইবার নকল শর্বরের চোখে ভয় ফুটে উঠল। সে হাতজোড় করে বলল, “আজ্ঞে, আমি শর্বর নই, আমি শর্বর নই! আমাকে প্রভু উর্ণায়ু নির্দেশ দিয়েছিলেন, রূপান্তর মায়া প্রয়োগ করে শর্বর সেজে এখানে বুলে থাকতে। আমি সামান্য রাক্ষস, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। এখানে যারা রয়ে গিয়েছিলাম, তারা সবাই মরার জন্যই ছিলাম। আমাকে মারবেন না, দয়া করুন। আসল শর্বরকে তো ওঁরা আগেই ছাড়িয়ে নিয়ে গেছেন।”

অভী এবার পরিষ্কার বুঝতে পারছে উর্ণায়ুর পরিকল্পনাটা। উর্ণায়ু আসল শর্বরকে উদ্ধার করেও সমরগরিমা আক্রমণ করেনি। সে অপেক্ষা করছিল ওদের এখানে আসার। এখানে যাতে ওদের কিছুটা সময় নষ্ট হয়, তাই একটা সাধারণ রাক্ষসকে শর্বর সাজিয়ে কিছু অদক্ষ রাক্ষসকে এখানে রেখে গিয়েছিল যুদ্ধ করার জন্য। সমরোত্তমদের এইখানে ব্যস্ত রেখেছে সে, আর সেই সুযোগে...

“আয়তনে! ওরা এতক্ষণে নির্ঘাৎ আয়তনে আক্রমণ করেছে!” চৈচিয়ে উঠল সে।

অধিনায়ক বজ্রধরের মুখ ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন, “হুম, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না। এই মুহূর্তে সবাইকে ফিরতে হবে আয়তনে। আমাদের ভুলিয়ে এখানে এনে ফেলেছে উর্ণায়ু, আর আমরাও পা দিয়েছি তার ফাঁদে।”

পর্বত বলল, “দুঃখুখো আক্রমণের ব্যবস্থা করেছিল ধূর্তটা। অধিনায়ক বজ্রধর, জটায়ুবাহিনীর সাহায্য নিতে হবে আমাদের। এছাড়া দ্রুত ফেরার আর কোনো উপায় তো নেই।”

শ্যামশ্রী বললেন, “হ্যাঁ, সেই ভালো। এখানে তোমাদের অনেকেরই নিজস্ব গৃধ্র আছে, না? জটায়ুবাহিনীর একটি গৃধ্র তিনজনের ভার বহন করতে পারে। আমরা কুড়িজন আছি এখানে। সাতটি পাখি হলেই চলে যাবে।”

অভীসহ শিক্ষার্থীরা অনেকেই হাত তুলল। কিন্তু অভীকে অবশ্য ডাকতে হল না অপরাজিতাকে। তিন সমরোত্তম আর পর্বতের গৃধ্রসহ অন্য তিনজনের পাখিদের ডাকা হল শঙ্খধ্বনি করে। পাখিগুলো এসে ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ করতে করতে উড়তে লাগল গুহামুখের বাইরে।

বজ্রধর বললেন, “এই রূপান্তরিত নকল শর্বরকে এখানে ফেলে যাওয়া ঠিক নয়। ও শরণাগত, তাই ওকে হত্যা করাও ঠিক নয়। আপাতত যুদ্ধবন্দি হিসাবে ও চলুক আমাদের সঙ্গে আয়তনে। পরে দেখা যাবে ওকে নিয়ে কী

করা যায়।”

সবাইকে নিয়ে অচলগুহা ছেড়ে বাইরে এলেন ওঁরা। সাতটা বিশালাকৃতির শকুন ঘুরে ঘুরে উড়ছে গুহার সামনে। বজ্রধর বললেন, “অভী, লীনা, তোমরা দু’জন এই নকল শর্বরকে নিয়ে চেপে বোসো আমার গৃধ্র সুসভ্যের পিঠে। আমি উঠছি মেঘবর্ণ আর মৃগেন্দ্রর সঙ্গে মেঘবর্ণের গৃধ্র আত্মাদির পিঠে।”

সুসভ্যের চেহারা বিরাট। তার পিঠে উঠে পড়ল অভী, তারপর উঠল লীনা। দু’জনের মাঝখানে নকল শর্বরকে হাত বাঁধা অবস্থায় ধরে বসিয়ে দিল পর্বত।

লীনা একটু ভয় পাচ্ছিল – আগে কোনোদিন ওড়েনি তো সে। শ্যামশ্রী তার পিঠে হাত রেখে বললেন, “কোনো ভয় নেই। এই জটায়ুবাহিনীর পিঠ থেকে কেউ পড়ে না।”

ওরা উড়ে চলল আকাশে। নীচে পড়ে রইল মাল্যপর্বত; সাতটা বিশালকায় শকুন চলল সমরগরিমা আয়তনের দিকে।

অভীর বুক ধুকপুক করছে। সমরগরিমা আয়তনকে অরক্ষিত রেখে সমরোত্তমরা সবাই চলে এসেছেন এখানে। শর্বর আর উর্গায়ু যদি ইতিমধ্যেই সদলবলে আক্রমণ করে থাকে, চঞ্চল আর বাকি শিক্ষার্থীরা কি পারবে তাদের আটকাতে?

হুহু করে কানে এসে লাগছে হাওয়া। সেই হাওয়ার মধ্যে দিয়েই নকল শর্বর একবার বলল, “তুমি অভী, না?”

অভী একটু অবাক হয়ে মাথা ঘুরিয়ে বলল, “হ্যাঁ। কেন?”

অদ্ভুতভাবে হাসল নকল শর্বর। “তোমার কথা অনেক শুনেছি।”

বাকি রাস্তাটায় আর একটা কথাও বলল না সে। সুসভ্য উড়ে চলল বাতাস কেটে।

মৃত দেবতার নদী, পীতপত্রবন পেরিয়ে ওরা যখন সমরগরিমার সীমায় ঢুকছে, তখন ওপর থেকে আয়তনের দৃশ্যটা দেখেই অভীর সারা দেহ আতঙ্কে কাঁপতে লাগল।

সর্বনাশ যা হবার, হয়ে গেছে!



।। উনবিংশ অধ্যায় ।।

উর্গায়ু

গোটা সমরগরিমা আয়তন ভরে গেছে রাক্ষস সেনায়।

বিনীতেশের সৈন্যরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিলে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল ঠিকই, কিন্তু এই বিরাট সংখ্যক রাক্ষসবাহিনীর কাছে সে প্রতিরোধ নিতান্তই বালির বাঁধ।

অনুশীলন মঞ্চের মাঠ ভরতি হয়ে উঠেছে সশস্ত্র রাক্ষসবাহিনীর যুদ্ধ-হংকারে। কিন্তু ওরা সিংহদরজা পেরিয়ে এতটা বিনা বাধায় এল কী করে?

রাক্ষসরা বন্দি করে রেখেছে সব শিক্ষার্থীকে। প্রত্যেকের গলায় তরবারি ঠেকিয়ে আটকে রেখেছে একজন করে ভীষণাকৃতির রাক্ষস। বোঝাই যাচ্ছে, প্রায় বিনা প্রতিরোধে আয়তন দখল করার পর ওরা অপেক্ষা করছিল তাদের ফেরার জন্য।

বিকেল হয়ে এসেছে। সব রাক্ষসের মাঝে মাঠের ওপর একটা উঁচু টিপির ওপর বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে যে, তাকে অতী চিনতে পারল সহজেই।

শর্বর!

মায়াবলে নিজের কণ্ঠস্বর কয়েক গুণ বাড়িয়ে আকাশ কাঁপিয়ে শর্বর কথা বলে উঠল। - “সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর, তোমাকে আগে থেকেই সাবধান

করে দিচ্ছি। যদি যুদ্ধ করতে চাও, তাহলে কিন্তু তোমরা নেমে আসার আগেই প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ছিন্নমুণ্ড লুটাবে এই আয়তনের মাঠে।”

জটায়ুবাহিনী পাক খাচ্ছে মাঠের ওপরে, কিন্তু নামতে সাহস পাচ্ছে না। অভী বুঝতে পারছে, ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পড়ে গেছে ওরা। এই অবস্থায় নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কী উপায় আছে, তার মাথায় আসছে না।

সে দেখতে পাচ্ছে, পাশেই আহুদির পিঠে বজ্রধর আর মেঘবর্ণের কপালে চিন্তার ভাঁজ। তাঁদের পেছনে মৃগেন্দ্রর মুখ শুকনো। সে বেচারি বেশ ভালোই ভয় পেয়ে গেছে।

ভয় পেয়েছে তার পেছনে বসে থাকা লীনাও। একবার সে কাঁপা গলায় বলল, “অভী, এবার কী হবে?”

ওদের সঙ্গে বসে থাকা নকল শর্বর হেসে উঠল। “অবস্থা ভালো নয়, বুঝতেই পারছ। প্রভু শর্বর সত্যিই অপ্রতিরোধ্য।”

অভী মুখ ঘুরিয়ে ধমক দিল, “চুপ করো তুমি।”

নীচ থেকে শর্বর বলে উঠল, “আমাদের হাতে স্বর্ণখেচরের পালক লাগানো তির আছে। চাইলে এক মুহূর্তের মধ্যে তোমাদের আকাশেই তিরবিদ্ধ করে হত্যা করতে পারি। কিন্তু আমি চাই তোমরা নেমে এসো। তোমাদের সঙ্গে অনেকদিনের অনেক জমানো কথা বলার আছে আমার, সমরোত্তমগণ।”

বজ্রধর আকাশেই বাকিদের চোখের ইশারা করে নামতে বললেন। অভী বুঝতে পারছে, এছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই তাঁর। এতগুলো ছাত্রছাত্রীর জীবনের ঝুঁকি তিনি নিতে পারবেন না কোনোমতেই।

জটায়ুবাহিনীর গৃধ্রেরা গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে নেমে এল মাঠের মাঝখানে। তাদের পিঠ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে একজন করে শত্রুসৈন্য এসে তরবারি ঠেকাল তাঁদের পিঠে।

অভী অবাক হয়ে দেখল, অধিনায়ক বজ্রধরের গায়ে তরবারি ঠেকিয়েছে চঞ্চল।

বজ্রধর একবার শুধু তাকালেন ওর দিকে, কিন্তু কিছু বললেন না। চঞ্চল চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, “আমার বাবার সঙ্গে আপনি কী করেছিলেন, আমি ভুলিনি, বজ্রধর। আমার মায়ের সঙ্গে কী হয়েছিল, ভুলিনি সে-কথাও। সেদিন থেকেই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, একদিন আমি আপনাকে শেষ করে ছাড়ব। মহান শর্বরের দয়ায় আজ আমার সামনে সেই সুযোগ এসেছে এতদিন পরে।”

বজ্রধর কোনো উত্তর দিলেন না, কিন্তু হঠাৎ রক্ষোবৈদ্যের বলা সাবধানবাণীটা মনে পড়ে গেল অভীর। কোথায় তিনি এখন? ওই যে দাঁড়িয়ে আছেন এককোণে। সম্ভবত বৃদ্ধ এবং নিরস্ত্র বলেই এখনও কেউ তাঁর শরীরে অস্ত্র ঠেকিয়ে পাহারা দিচ্ছে না। তবে যে বিশাল রাক্ষসসমষ্টি ঘিরে রেখেছে সবাইকে, এখান থেকে কারও পক্ষেই পালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

রক্ষোবৈদ্যই ঠিক বুঝেছিলেন চঞ্চলকে। সিংহদরজা রক্ষার দায়িত্ব ছিল তার; সে-ই শত্রুর সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে আয়তনকে। বিশ্বাসঘাতক!

মেঘবর্ণ চিৎকার করে বলল, “শর্বর, তুমি ভেবো না, আমরা যুদ্ধ করতে জানি না। সাহস থাকলে সামনাসামনি লড়ে দেখো।”

শর্বর বলল, “যুদ্ধ করতে তোমরা জানো, আমি তো জানি ভালো করেই। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে এই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে মারতে আমাদের হাত কাঁপবে না, তুমি সে-কথা জানো তো?”

বজ্রধর বললেন, “ওদের মৃত্যুভয় দেখিয়ে না। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসের সঙ্গে লড়াই করে বীরের মৃত্যুবরণ করতে ওরা কেউ দু’বার ভাববে না, জেনে রেখো।”

“যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু?” শর্বর হেসে উঠল। “এ যে আর যুদ্ধক্ষেত্র নেই, সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর। তোমরা একটু নড়াচড়া করে দেখো, আমি এ জায়গাটাকে কসাইখানা বানিয়ে দেব। যুদ্ধক্ষেত্রে মরলে বিরাট সম্মান, তাই না? তোমাদের এই ‘সমরগরিমা’র ধারণাটাই তোমাদের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা, জানো তো?”

বজ্রধর উত্তর দিলেন না; অতী দেখল ব্যর্থ ক্রোধে যেন ফুঁসছেন তিনি।

শর্বর আবার বলল, “যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরায় সম্মান থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু কসাইয়ের অস্ত্রের তলায় মরলে কীসের সম্মান, অধিনায়ক বজ্রধর? না সমরোত্তম শ্যামশ্রী, মায়াবিদ্যা প্রয়োগ করার দুঃসাহস দেখাতে যেয়ো না। তাহলে সম্মানের সঙ্গে মরা আর তোমার কপালে জুটবে না।”

উপস্থিত রাক্ষসের দলবল হেসে উঠল হো হো করে। শ্যামশ্রীর মুখভাব তাঁর মুখোশের তলায় দেখা গেল না, কিন্তু তাঁর দু’হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠল।

অতীর হঠাৎ মনে হল, “এত কাণ্ড ঘটছে, কিন্তু উর্গাযু কই?”

চারপাশে তাকাল সে, কিন্তু তাকে দেখতে পেল না কোথাও। গেল কোথায় ধূর্তশিরোমণি? এই সময় তার তো এখানে থাকা উচিত ছিল!

মেঘবর্ণ আবার বলে উঠল, “শর্বর, আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি। এসো, যুদ্ধ করো আমার সঙ্গে। যদি তুমি জয়লাভ করো, তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো। আর যদি আমি জিতি, তাহলে তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে চলে যাবে। বলো, রাজি আছ এই শর্তে?”

আবার একপ্রস্থ হাসল শর্বর। “মেঘবর্ণ, আমাকে এতটাই বোকা মনে করো তুমি? চঞ্চলের কাছে আমি খবর পেয়েছি, তোমার বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর ছেলেকে তুমি ইচ্ছা করে তোমার হাত থেকে তরবারি ফেলে দিতে দিয়েছিলে। কিন্তু আমার প্রতি তুমি অতটা উদারতা দেখাবে না, আমি নিশ্চিত। এ কথা বলতে আমার কোনো সংকোচ নেই, নীলাদ্র মরার পর দুনিয়ায় এমন কোনো লোক নেই যে তরবারি হাতে তোমাকে পরাস্ত করতে পারে। কথাটাকে তুমি তোমার উপযুক্ত শত্রুর প্রশংসা বলেই ধরে নিতে পারো। আমি কিন্তু তোমাদের আয়তনের শিক্ষার্থী নই, মেঘবর্ণ। তোমার দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করতে আমি বাধ্য নই, এবং আমি তা গ্রহণ করছি না। আমি চাইলে তো এই মুহূর্তেই তোমাদের সবকটাকে খতম করে সমরগরিমায় রাক্ষসদের আধিপত্য স্থাপন করতে পারি। তার জন্য তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়তে যাব কেন?”

বজ্রধর গম্ভীরমুখে বললেন, “সে আশা তোমার কোনোদিনই পূরণ হবে না, শর্বর। গতবারের কথা ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই। ঐশিকশ্রেষ্ঠ যুদ্ধদেব নেমে আসবেন এখানে, তাঁর প্রতি সে বিশ্বাস আমাদের আছে। তাঁর হাতেই পতন হবে তোমার।”

সে কথার উত্তরে শর্বর কিছু একটা বলছিল, কিন্তু অভীর মনটা হঠাৎ অন্যদিকে সরে গেল। কী যেন নড়ছে তার পাশে।

নকল শর্বর বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল তার ডানদিকে। হাত নাড়ছে সে অদ্ভুতভাবে। অভী অবাক হয়ে দেখল, তার চোখের সামনে লোকটার আকৃতি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।

এই তাহলে রূপান্তরমায়া! নিজের আসল চেহারা ধরছে মায়াবী নকল শর্বর।

অভী তাকিয়ে রইল সেইদিকে। আর কেউ দেখছে না এই নাটক। সবাই ব্যস্ত শর্বরের কথা শুনতে।

নকল শর্বর মৃদু কণ্ঠে ডাকল, “অভী!”

তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ংকরভাবে চমকে উঠল অভী। “তুমি?”

উর্গায়ু একটু হাসল। “চিনতে পেরেছ তাহলে?”

অভী বলল, “তুমি কী করছ এখানে? তোমার তো আজ তোমার নেতা শর্বরের পাশে থাকা উচিত ছিল!”

“আমার নেতা শর্বর? থুঃ!” তাচ্ছিল্যের একটা হাসি হাসল উর্গায়ু। “আমার নেতা কেউ নেই। আমি নিজেই নিজের মালিক। শর্বরকে আমি শুধু ব্যবহার করেছি, যাতে আজ এই মুহূর্তটা তৈরি করতে পারি; যাতে তোমার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি।”

“মানে?”

“এত কাণ্ড – সবই যে তোমার জন্যে, অভী। তোমাদের মায়াবিদ্যায় তুখোড় সমরোত্তম শ্যামশ্রী এই আয়তনের চারপাশে গম্ভী টেনে রেখেছেন, যাতে সমরোত্তমদের কেউ নিয়ে না এলে বা আহ্বান না করলে আমি ঢুকতে না পারি। তাই তো এত নাটক করতে হল। শর্বরের সঙ্গে আমার কথাই হয়েছিল এইরকম – ওকে মুক্ত করার বদলে আমি ‘শর্বর’ সেজে পাথর থেকে ঝুলে তোমাদের অপেক্ষা করে থাকব অচলগুহায়। তবে তো আমাকে তোমরা আদর করে নিয়ে আসবে আয়তনের মধ্যে। তবে তো তোমাকে একটু নিরিবিলিতে পাব। শর্বর এই সামান্য অনুরোধ রাখতে রাজি হবেই, জানতাম।”

“আমার প্রতি এত আগ্রহ কেন তোমার?”

“ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শোনোনি? এক ত্রিরক্তসম্পন্ন প্রলয়যোদ্ধার জন্য পতন হবে দেবতাদের, জানো না? তোমার প্রতি আগ্রহ থাকবে না তো কার প্রতি থাকবে?”

“দেবতাদের পতনে তোমার কী আসে যায়? আমার সঙ্গে দেখা করতে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন?”

সে-কথার উত্তর না দিয়ে উর্গায়ু বলল, “অভী, তুমি কি এই ছেলেমেয়েগুলোকে বাঁচাতে চাও?”

অভী বলল, “চাই। অবশ্যই চাই।”

“তাহলে আমি যা বলব, তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে।”

“তোমাকে বিশ্বাস? তুমি শর্বরকে ফিরিয়ে এনেছ। তুমি আমাদের অচলগুহায় আটকে রেখেছ যাতে এখানে বিনা বাধায় শর্বর সমরগরিমা আয়তন দখল করতে পারে। তোমাকে বিশ্বাস করার মতো বোকা আমি নই।”

“আঃহা! পুঁচকে ছেলে! সাহসের অভাব নেই – বাবার মতোই।”

অভী থমকে গেল। “আমার বাবাকে জানতে তুমি?”

“আর মায়ের মতোই নিরেট বোকা – নিজের কীসে ভালো, কিছু বোঝে না।”

“তুমি আমার মাকেও জানতে?”

“জানতাম। কিন্তু সে-কথা এখন অপ্রাসঙ্গিক। তুমি বলো, এদেরকে বাঁচাতে তুমি চাও, না চাও না?”

“চাই বললাম তো।”

“তাহলে যাও, তোমার কোমরে যে তরবারি ঝুলছে – শর্বরের পায়ের কাছে সমর্পণ করো, ঠিক যেমন তোমার বাবা করেছিল। বলো, ‘আমি আত্মসমর্পণ করছি’। শর্বর তখন নরকগহ্বর আহ্বান করে তার মধ্যে ফেলে দেবে তোমাকে। একমাত্র এইভাবেই তুমি এখানের সবাইকে বাঁচাতে পারো।”

অভী স্থিরচোখে তাকিয়ে রইল। “কী বলতে চাও তুমি?”

“আমি বলতে চাই, একমাত্র তখনই ঐশিকশ্রেষ্ঠ যুদ্ধদেব নেমে আসবেন স্বর্গলোক থেকে। কোনো রাক্ষস, এমনকি শর্বরেরও সাধ্য নেই তাঁর সামনে টিকতে পারে। আগেরবার শর্বরকে তিনিই তো বন্দি করেছিলেন।”

“কিন্তু আমি কেন বিশ্বাস করব তোমার কথা, উর্গায়ু? তুমি তো ওদেরই একজন। তুমি যে সত্যি কথা বলছ, তার কী প্রমাণ আছে?”

উর্গায়ু বিচিত্র একটা হাসি হাসল। “প্রমাণ দেখবে? এই দেখো প্রমাণ।”

জামার হাতা গুটিয়ে ওপরের দিকে তুলে নিতেই ডান বাহুতে অতি পরিচিত চিহ্নটা দেখতে পেল অভী। একটা তীক্ষ্ণধার তরবারির হাতলে যেন জ্বলছে উজ্জ্বল সূর্যের ছবিটা। কতবার এই আয়তনে এই চিহ্নের সামনে সমরোত্তমদের শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করতে দেখেছে সে।

“ঐশিকশ্রেষ্ঠ! আপনি!” ফিশফিশ করে বলল সে।

শর্বর এখনও করে যাচ্ছে দম্ভোক্তি; সমরোত্তমরা মাথা নীচু করে শুনছেন তার কথা; মাঝে মাঝে উল্লাসধ্বনি দিয়ে উঠছে রাক্ষসরা। কিন্তু অভীর কানে যেন আর কিছু ঢুকছে না – সারা পৃথিবীর কোন শব্দই যেন আর তাকে ছুঁতে পারছে না। চোখের সামনে শুধু জ্বলছে একটা তরবারির হাতলে সূর্যের ছবি।

অভীর বিহ্বল অবস্থা দেখে ঐশিকশ্রেষ্ঠ হাসলেন। “দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ফসল তোমার আমার আজকের এই সাক্ষাৎ, অভী। কতগুলো প্রাণের বিনিময়ে আজ তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হতে পারছি, ভাবো শুধু একবার। তোমাকে রক্ষাও

করেছি আমি বেশ কয়েক বার। মনে করে দেখো, বৈদূর্যের কাটামুণ্ডু তোমাদের উপহার পাঠাইনি আমি? আমার নির্দেশের অবাধ্য হয়ে বৈদূর্য আক্রমণ করতে চেয়েছিল তোমাদের; আয়তনের সহকারী নিয়ামক নারদ সেদিন ছিলেন ওর সঙ্গে কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে – দেখেছিলে নিশ্চয়ই। তাঁর কাছে সব খবরই পেতাম আমি। লোকটি বেশ কাজের ছিলেন।”

তাহলে নারদ ছিলেন সেই লোক!

ঐশিকশ্রেষ্ঠ আবার বললেন, “কল্পনাথ আন্দাজ করতে পেরেছিল, নারদ আমার, মানে উর্গায়ুর হয়ে কাজ করছেন। সে প্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টায় ছিল। তাই সুগুসর্প প্রয়োগ করে এক টিলে দুই পাখি মারলাম আমি। কল্পনাথকেও সরিয়ে দেওয়া গেল, আর নিয়ামক বিনীতেশের যুদ্ধবাসনাতেও একটু ঘটাহুতি দেওয়া গেল।”

অভী বলল, “কিন্তু এই আয়তন তো আপনার নিজের হাতে গড়া। একে এইভাবে পেছন থেকে ছুরি মারতে আপনার বাধল না?”

“পেছন থেকে ছুরি? না জেনেই একটা ভালো কথা মনে করিয়ে দিলে তুমি। আসছি সে-প্রসঙ্গে। তার আগে বলি, আয়তন যেমন চলছিল তেমনই চলবে। কিন্তু সেটা পুরোপুরি নির্ভর করছে তোমার ওপর। তুমি যদি আমার কথা শোনো, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, আয়তনের কোনো ক্ষতি শর্বরকে করতে আমি দেব না। নারদও তাই বিশ্বাস করতেন, তাই আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। ওঁকে বলেছিলাম, বিনীতেশকে খতম করার পর উনিই হবেন সমরগরিমার নিয়ামক। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসতে চাইলেন উনি। চঞ্চল আমার হয়ে আয়তনের সব খবর রাখত। ওকেই দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। দূর থেকে অভ্রান্তলক্ষ্যে তির ছুড়ে তাঁকে চিরতরে চূপ করিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল ও।”

“কিন্তু কেন? আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এত কিছু করার কী দরকার ছিল? আমার সঙ্গে শত্রুতা থাকলে আমাকে গোপনেই মেরে ফেলা আপনার পক্ষে খুব কঠিন ছিল কি?”

অদ্ভুত চোখে তার দিকে চেয়ে রইলেন ঐশিকশ্রেষ্ঠ। “না, ছিল না। চাইলে এই মুহূর্তেই কি তোমাকে শেষ করে দিতে পারি না? আমার সামনে তোমার ক্ষমতা কতটুকু? কিন্তু না, ত্রিরক্তসম্পন্ন যে অসামান্য যোদ্ধার জন্য নাকি একদিন ঐশিকদের অমরত্বও ধ্বংস হয়ে যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল, সেই ছেলে তার সমরগরিমা সবার সামনে ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করেছে, এটা আমাকে নিশ্চিত করতে হত।”

“কীসের ত্রিরক্ত? কীসের ভবিষ্যদ্বাণী? আমি কেনই বা যাব ঐশিকদের অমরত্ব ধ্বংস করতে?” অভী অসহায়ের মতো হাত ওলটাল।

“ধ্বংস করতে যাবে, কারণ তোমার নিয়তি তোমাকে বাধ্য করবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী এসেছিল এক অভ্রান্ত ভবিষ্যৎবক্তার কাছ থেকে, তোমার জন্মের বহু আগে। তখন আমি সবে সমরগরিমা আয়তন স্থাপন করেছি। বজ্রধর তখন আমার একমাত্র শিক্ষার্থী। বাকিরা কেউ তখনও এসে পৌঁছোয়নি।”

অভী শুনতে লাগল। শব্দর এখনও আশ্ফালন করে চলেছে তার শক্তিদৃষ্টি। অভীর মনে হল, বেচারী জানেই না ওকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে – কত বড়ো খেলার কত সামান্য একটা ঘুঁটি ও।

ঐশিকশ্রেষ্ঠ বললেন, “ত্রিরক্তসম্পন্ন মানে তোমার শরীরে তিন ধরনের রক্ত আছে, অভী। মানুষ, রাক্ষস, আর ...”

“আর?”

“ঐশিক।”

প্রচণ্ড অবিশ্বাস নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল অভী। তিনি বললেন, “তোমার মাকে আমি বারবার নিষেধ করেছিলাম, নীলাভ্রর সঙ্গে কোনো সম্পর্কে না জড়াতে। কিন্তু আমার কোনো কথা সে শোনেনি।”

অভী যেন আর কথা বলতে পারছে না, জিভ শুকিয়ে গেছে। কোনোক্রমে সে বলল, “আমার মা আপনার কথা শুনবে কেন? আপনি কে তার?”

ঐশিকশ্রেষ্ঠ শান্তমুখে বললেন, “আমি তার বাবা। তুমি আমার মেয়ের একমাত্র ছেলে, অভী।”

অভীর কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে; সে যেন আর কিছু ভাবতে পারছে না। সে বলল, “কোথায় আমার মা?”

“পেছন থেকে ছুরি মারার কথা বলছিলে না তুমি একটু আগে? তোমার জন্মের পরেই বরফের ছুরির আঘাতে তাকে শেষ করে দিতে বাধ্য হয়ে ছিলাম আমি।”

স্বপ্নসরোবরের তীরে দেখা সেই দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে গেল অভীর। তার মাকে, নিজের মেয়েকে মারতে হাত কাঁপেনি এই শয়তানটার!

অভী বুঝতে পারল, তার হাত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। সে বলল, “তিনটে রক্ত হল কোথায় এখনও? বাবা ছিল মানুষ, আর মায়ের মধ্যে আপনার দিক থেকে ছিল ঐশিকের রক্ত। কিন্তু রাক্ষস?”

“আমার স্ত্রী, মানে তোমার মায়ের মা ছিল পত্রতিলক রাক্ষস,” ঐশিকশ্রেষ্ঠ বললেন। “তাকে যখন বিবাহ করেছিলাম, তখন বুঝতে পারিনি, নিয়তি আমার সঙ্গেও কী খেলা খেলতে চাইছেন।”

প্রচণ্ড ঘৃণায় অভীর দু’হাত যেন অবশ হয়ে আসছে। শব্দরের যা হয় হবে, এই শয়তানটাকে আজ শেষ করবে সে। মনে মনে সুবিশাল হিমবাহের ভেঙে পড়ার দৃশ্য কল্পনা করতে লাগল সে – ওই ভয়ানক স্রোতে সে এই ঘৃণিত জীবটাকে ডুবিয়ে মেরে ফেলতে চায়। আর একটু শুধু সময় দরকার; তাহলেই ওই ঘৃণার প্রাবল্যে...

কিন্তু তার আগেই খপ করে তার হাত ধরে ফেললেন ঐশিকশ্রেষ্ঠ। “উঁহু অভী। ভুলে যেয়ো না, আমি তোমার থেকেও অনেক অভিজ্ঞ হিমকুশল। তুমি কী করতে চাইছ, আমি অনেকক্ষণই বুঝতে পেরেছি। তোমার ভেতরে এই যে এত ঘৃণা, যে ঘৃণাকে তুমি ব্যবহার করো হিমকুশলতা তৈরির কাজে, সে যে আমারই রক্তের দান। আমি যুদ্ধের ঐশিক – ঘৃণা নিয়েই তো আমার অস্তিত্ব। তাই আমার সঙ্গে ও চালাকি করতে যেয়ো না।”

তার হাতের মুঠোর মধ্যে অভীর হাত গরম হয়ে উঠল। ঘৃণাবোধটা তার কমেনি, কিন্তু হাতগুলো আর কিছুতেই ঠান্ডা হচ্ছে না, আক্রমণের উপযোগী হচ্ছে না।

তিনি আবার বললেন, “আমার মেয়ের মধ্যে অনেক গুণ ছিল। বেঁচে থাকলে ও-ও হতে পারত মেঘবর্ণের মতো, নীলাভ্রর মতো অতুলনীয় যোদ্ধা। তখন এই আয়তনে থেকেই বাকিদের সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা অভ্যাস করত ও, যদিও আমি বারবার নিষেধ করেছিলাম নীলাভ্রর সঙ্গে বেশি না মিশতে। কিন্তু আমাকে লুকিয়ে বিয়ে করল ওরা। আমি খবরটা পেয়েছিলাম তোমার জন্মের পর। আর সেই মুহূর্ত থেকেই আমার ভালোবাসা হারাল ওরা।

“মেয়েকে বেশি কষ্ট দিয়ে মারতে চাইনি আমি, কিন্তু একদম বিনাকষ্টে মরুক, তাও আমি চাইনি। তাই পিঠে এমন জায়গায় ছুরি মেরেছিলাম যাতে বেশ কিছুক্ষণ প্রাণটা থাকে। আর নীলাভ্র – গর্বিত যোদ্ধা নীলাভ্রর জন্য ব্যবস্থা করেছিলাম আজকের মতো একটা পরিস্থিতির, যাতে ও বাধ্য হয় ওর প্রাণের চেয়েও প্রিয় ‘সমরগরিমা’ বিসর্জন দিয়ে মরতে। আজও দেখো, ওকে সবাই ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে।

“শাস্তি প্রাপ্য বজ্রধরেরও। তোমাকে ও লুকিয়ে রেখেছিল মানুষের দুনিয়ায়। ওখানে আমাদের ঐশিকদের ক্ষমতা খুব একটা চলে না। তার ওপর তোমার ওই রবিকাকাটিও তোমাকে এমনভাবে ঘিরে রাখত যে ওখানে ঘাতক পাঠিয়ে তোমার ওপর আক্রমণ করা সহজ ছিল না। বজ্রধরকে এর শাস্তি তো পেতে হবেই।

“শর্বরের মতো একটা গাধা হাতে থাকায় আমার বেশ সুবিধাই হয়েছে। গতবারও ওকে প্রলুব্ধ করে এনেছিলাম এখানে, যাতে নীলাভ্রকে উচিত শিক্ষা দিতে সুবিধা হয়। আর এবারও উর্ণায়ু সেজে ক্রমাগত ইন্ধন দিয়ে গেছি ওর প্রতিশোধের আগুনে। আর অর্ধরাক্ষসগুলোর অতি খারাপ অবস্থাটাকে কাজে লাগিয়ে নিতে পেরেছিলাম বলে এই চঞ্চলের মতো বঞ্চিত গরিবগুলো আমাকে ভগবান ভেবে বসে আছে। মানুষের কাছে সবচেয়ে ভালো কী বিক্রি করা যায় জানো? যার যে জিনিসের অভাব আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, সেই বস্তুটি। এখানকার গরিবদের অনেক ধরনের অভাব আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি অভাব আছে যেটির, সেইটি বিক্রি করেছি বলেই ওরা আমার পায়ে এসে পড়েছে। গরিবের কাছে সবচেয়ে ভালো বিক্রি হয় ‘স্বপ্ন’, বুঝলে অভী? ওদের উজ্জ্বল একটা ভবিষ্যৎ দেওয়ার স্বপ্ন, ওদের ছেলেপুলেরা সুখে থাকবে – এই স্বপ্ন, ওদের কেউ ‘গরিব’ বা ‘অর্ধরাক্ষস’ বলে আর অপমান করবে না – এই স্বপ্ন দেখাতে পেরেছিলাম বলেই আজ এত অনায়াসে জয় পেলাম আমরা। অবশ্য গরিব মূর্খগুলো জানে না, ওরা যেমন ছিল, তেমনই থাকবে চিরটাকাল। সবাই যদি মালিক হয়ে যায়, তাহলে চাকর হবে কে?”

ফিক ফিক করে হাসলেন তিনি। অসহনীয় ক্রোধে, ঘৃণায় অভীর সারা শরীর যেন ফেটে পড়তে চাইছে, কিন্তু ঐশিকশ্রেষ্ঠ মায়াপ্রয়োগ করে তার হিমকুশলতা সাময়িকভাবে নষ্ট করে দিয়েছেন। কী ভীষণ অসহায় লাগছে তার!

“কী চান আপনি?” অভী প্রশ্ন করল দাঁতে দাঁত চেপে।

“কী চাই, বললাম তো তোমাকে। যাও, গিয়ে শর্বরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলো, ‘আমি আমার সমরগরিমা বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণ করছি’ – ঠিক তোমার বাবা যেমন করেছিল। কোনো যোদ্ধা সমরগরিমা বিসর্জন দিলে শর্বরের তাকে মারতে সুবিধা হয়। ওই চন্দ্রহাস হাতে নিয়েও এই বিশাল রাক্ষসসমুদ্রের মাঝে তুমি কিছুই করতে পারবে না, বুঝতে পারছ নিশ্চয়। এবার তোমার সামনে দুটো রাস্তা খোলা আছে। এক, সবাইকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে নিজের সমরগরিমা অক্ষুণ্ণ রেখে মৃত্যুবরণ করা – যদিও সে চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত কেউই বাঁচবে না। আর দুই, সমরগরিমা ত্যাগ করে ভীরুর মৃত্যু, বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুকে স্বীকার করে নেওয়া – এতে অবশ্য বাকিরা সবাই বেঁচে যাবে, কারণ তুমি মরলেই আমি আমার ঐশিক যুদ্ধদেবরূপে আবির্ভূত হব সবার সামনে; পরাজিত করব শর্বরকে। এবার তুমি কী করবে, স্থির করো।”

একমুহূর্ত সময় লাগল অভীর সিদ্ধান্ত নিতে।

তার বাবা ভীরু ছিল না, বিশ্বাসঘাতক ছিল না। তার বাবার মতো বীর কেউ নেই। সকলের মঙ্গলের জন্য বাবা তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় সমরগরিমাকেও ত্যাগ করতে পেরেছিল।

বাবা পেরেছিল; সে পারবে না? তার বন্ধুদের, তার প্রিয়জনদের, তার শিক্ষকদের প্রাণরক্ষার জন্য সে এইটুকু করতে পারবে না?

তার বাবা এক বিরাট হৃদয়ের মানুষ ছিল। মৃত্যুর আগে এই তার পরম সান্ত্বনা।

তাকে ভিড় ঠেলে এগোতে দেখে পেছন থেকে উৎসাহের সুরে ঐশিকশ্রেষ্ঠ বললেন, “শাবাশ! এই তো চাই।”

সে কথার কোনো উত্তর দিল না অভী। কয়েক পা এগিয়ে এসে সে চিৎকার করে উঠল, “শর্বর!”

শর্বরের কথা থেমে গেল; সে এদিকে তাকাল মুখ তুলে। সমরোত্তমরা, আয়তনের শিক্ষার্থীরা – সবাই বিস্মিতভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অভী দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল উঁচু টিপিটার দিকে। শর্বরের চোখের ইশারায় রাক্ষসসৈন্যরা তাকে পথ করে দিল।

“আমার সমরগরিমা ত্যাগ করে আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করছি, শর্বর।”

কোমর থেকে চন্দ্রহাস খুলে শর্বরের পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসল সে।

বাক্যহারা হয়ে তাকে দেখছেন সমরগরিমার সমরোত্তমরা। মেঘবর্গ, বজ্রধর যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজেদের চোখকে। শ্যামশ্রীর হাত প্রচণ্ড অবিশ্বাসে উঠে এসেছে মুখের ওপর। লীনা, নিধির চক্ষু বিস্ফারিত, মুখ হাঁ। বাকি ছাত্রছাত্রীরাও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এ দৃশ্য। পর্বত রক্ষোবৈদ্যের হাত চেপে ধরল। “না, না, অভী এ কী করছে?”

রক্ষাবৈদ্যও কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। শর্বর হেসে উঠল হা হা করে।

অভীর মনটা যেন শূন্য হয়ে গেছে। পরবর্তী ঘটনা কী ঘটতে চলেছে, সে জানে। স্বপ্নসরোবর এ দৃশ্য তাকে আগেই দেখিয়ে রেখেছে।

“যেমন বাপ, তেমনি ব্যাটা!” বলে উঠল শর্বর।

অভী শুনতে পাচ্ছে মন্ত্রবলে নরকগহ্বর আহ্বান করছে শর্বর। তার পায়ের তলার মাটি কাঁপছে, গরম হয়ে উঠছে। যেন নরকের বিকট হাঁ-করা মুখ উঠে আসছে কোন অতল পাতাল থেকে। গুমগুম করে শব্দ হচ্ছে। এতগুলো মানুষ – বিস্ফারিত চোখে অসহায় দর্শকের মতো তারা দেখছে এই দৃশ্য।

অভী বসে রইল কাঠপুতুলের মতো। ওই যে দূরে পড়ে আছে চন্দ্রহাস; বিকেলের আলো এখনও ঝিলিক দিচ্ছে তার শুভ্র চাঁদের মতো গায়ে।

মাটি ফেটে গিয়ে বেরিয়ে এল লেলিহান শিখা; সুবিশাল গহ্বরের মুখের ভেতর থেকে উঠে আসছে অকল্পনীয় তাপ আর লালচে হলুদ অগ্নিশিখা; মারাত্মক উষ্ণ বাষ্প যেন মুখ ঝলসে দিচ্ছে এত দূর থেকেও। এক মুহূর্তের জন্য ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল অভী।

আচ্ছা, মৃত্যু কি খুব যন্ত্রণাদায়ক? একটা মানুষের কতক্ষণ সময় লাগে নরকগহ্বরের মধ্যে মরতে?

উদ্ধত পদক্ষেপে এগিয়ে এল শর্বর, তার হাতে তীক্ষ্ণ বর্শা। “ভীরুর ছেলে ভীরুই হয়!” ঘোষণা করল সে। “আজ আবার প্রমাণ হয়ে গেল।”

কী মনে করে একবার চোখ ফেরাল অভী বন্ধুদের দিকে। অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছে লীনার গাল বেয়ে; নিধির চোয়াল শক্ত, চোখে অবিশ্বাস। দু’জন দু’জনের হাত ধরে রেখেছে শক্তভাবে। ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে শ্যামশ্রী কাঁপছেন থরথর করে।

তারপর আর কিছু দেখা হল না তার।

পিঠে প্রচণ্ড বেগে এসে পড়ল শর্বরের লাথি। হুমড়ি খেয়ে সে গড়িয়ে গেল অগ্নিময় নরকগহ্বরের মধ্যে। রাক্ষস, অর্ধরাক্ষস, মানুষ – যারা উপস্থিত ছিল, সবাই কোনো শব্দ না করে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লকলকে আগুনের শিখাপূর্ণ গহ্বরের মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

নীচের দিকে পড়তে থাকল অভী; পড়তেই থাকল। দ্রুতবেগে লুপ্ত হয়ে যেতে থাকল তার চেতনা।



॥ বিংশ অধ্যায় ॥

শেষ যুদ্ধ

এই চূড়ান্ত বিহ্বলতার মধ্যে সবার আগে যিনি পরিস্থিতি সামলে নিলেন, তিনি অধিনায়ক বজ্রধর।

ক্রুদ্ধ একটা গর্জন করে তিনি হাতের ধাতব দণ্ডটা আকাশের দিকে তুলতেই আকাশ বিবর্ণ হয়ে গেল, ঢাকা পড়ল সূর্য কালো মেঘে, আর সারি সারি ডানাওয়ালা বাদুড়ের মতো জীব নেমে এল সেই মেঘ থেকে। যে রাক্ষসগুলো তরবারি ঠেকিয়ে রেখেছিল শিক্ষার্থীসহ সমরগরিমার সকলের গায়ে, চোখের নিমেষে তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে তাদের কণ্ঠনালী ছিন্ন করে দিল তারা। ভয়াবহ রাক্ষসদের আতনাদে ভরে উঠল সমরগরিমা আয়তনের মাঠ।

মুক্তি পেতেই শিক্ষার্থীরা অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধে। শ্যামশ্রী চিৎকার করে বললেন, “আজ রাক্ষসদের দেখিয়ে দাও সবাই, আমরা মরতে ভয় পাই না। আমাদের যেন ওরা মৃত্যুভয় না দেখায়।”

একসঙ্গে উল্লাসধ্বনি করে উঠল শিক্ষার্থীরা।

লীনা চোখের জল মুছে অসিচালনা করতে শুরু করল। তার পাশে লাফ দিয়ে এসে পড়ল পর্বত – ছ’জন রাক্ষসকে একসঙ্গে ধরে শূন্যে ঘুরিয়ে সে ছুড়ে ফেলে দিল দূরে।

আকাশ থেকে ঘুরে ঘুরে আক্রমণ করেই চলেছে সেই দানবিক বাদুড়গুলো। রাক্ষসরা পারছে না তাদের সঙ্গে। অধিনায়ক বজ্রধরের ইঙ্গিতে তারা রাশি রাশি

শত্রুনিধন করে চলেছে পলকে পলকে। আয়তনের মাঠ রক্তে কাদায় পিচ্ছিল হয়ে গেল।

নিধি তরবারি ঘোরাচ্ছে পাগলের মতো - তার সামনে দাঁড়াতে পারছে না কেউ। তার নিজেরও হাত-পা কেটে গেছে অজস্র জায়গায় - তার ক্রম্প নেই।

সুদক্ষিণসারি আর মানবমন্দির থেকেও এসে জুটেছে মানুষ আর অর্ধরাক্ষসরা - যোগ দিয়েছে তারাও যুদ্ধে। লীনাকে দেখতে পেয়ে নীপা ছুটে এল। “লীনা দি!”

একটা রাক্ষসের আক্রমণ প্রতিহত করতে করতেই লীনা বলল, “ওই যে তোর দিদি! সামলা ওকে।”

নীপা বলল, “ওকে সামলানোর কিছু নেই। এই রাক্ষসগুলো ওকে সামলাক আগে।”

মেঘবর্ণ লাফিয়ে পড়ল ওদের সামনে। একটা রাক্ষস বর্শা ছুড়েছিল নিরস্ত্র নীপাকে লক্ষ্য করে; সে আঘাত প্রতিহত করে মেঘবর্ণ বলল, “অভী কেন এমন কাজ করল, লীনা?”

অসহায় ভাবে লীনা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “আমি জানি না, মেঘবর্ণ।”

নিধি পাশ থেকে বলল, “আজ আমরা এখান থেকে কেউ বেঁচে বেরোব না, আমি জানি। কিন্তু যদি বেরোই, আর তারপরেও যদি কেউ আমার সামনে আমার বন্ধুকে ‘কাপুরুষ’ বলে, তার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। মেঘবর্ণ, সব কিছু দেখার পরেও আমি বিশ্বাস করি না, অভী কাপুরুষ ছিল।”

মেঘবর্ণ বলল, “আমিও করি না। আমি তো খুব ভালো করেই জানি অভী কেমন ছেলে ছিল। কিন্তু কেন এমন কাজ করল ও? কেন?”

প্রবল যুদ্ধ চলতে লাগল। তরবারি তরবারির সংঘর্ষে আকাশে ছিটকে উঠতে লাগল অজস্র আগুনের ফুলকি। রক্ত, ঘামের গন্ধ আর আর্তনাদ-রণহংকারে ভরে উঠল যুদ্ধক্ষেত্র। মনে হতে লাগল, বাতাসটাও যেন উষ্ণ হয়ে উঠেছে। পা পিছলে যাচ্ছে রক্তমাখা কাদায়।

অধিনায়ক বজ্রধরকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন স্বয়ং যমরাজ অবতীর্ণ হয়েছেন দণ্ডহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে। তাঁর সামনে যারাই পড়ছিল, নিমেষের মধ্যে লুটিয়ে পড়ছিল মাটিতে। প্রচণ্ড তেজ বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে; তাঁর হাতের দণ্ড জ্বলছে তীব্র লালচে আলোকশিখায়। নিমেষের মধ্যে কয়েকশত রাক্ষসনিধন করে তিনি ছুটলেন শর্বরের উদ্দেশে।

উদ্দেশ্য তাঁর স্পষ্ট। আজ এই শত্রুবাহিনীর নেতাটিকে হত্যা করে তিনি এই যুদ্ধের ভাগ্যনির্ধারণ করে দেবেন।

রাক্ষসসেনারা তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল। এই মূর্তিমান মৃত্যুকে তারা কিছুতেই দেবে না তাদের প্রভুর কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে। সেই জনপ্রাচীরের পেছনে টিবির ওপরে দাঁড়ানো শর্বরের মুখ এই প্রথমবারের জন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, দেখতে পেল সবাই। সে বুঝতে পারছে, এই প্রচণ্ডকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তার নেই। অধিনায়ক বজ্রধরের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল সমরগরিমার বাহিনী।

বাস্তবিক অর্থেই যুদ্ধ থেমে গেল। প্রত্যেকটি মানুষ, অর্ধরাক্ষস এবং রাক্ষস

নিজেদের মধ্যে লড়াই থামিয়ে তাকিয়ে রইল এইদিকে - তারা বুঝতে পারছে, এই একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধই নির্ধারণ করে দেবে আজকের সমগ্র যুদ্ধের ফলাফল।

লীনার পাশে দাঁড়িয়ে পর্বত কম্পিতকণ্ঠে ফিশফিশ করে বলল, “আমার যেন ভয় করছে। অধিনায়ক বজ্রধরের এই ভয়ংকর রূপ আমি কখনও দেখিনি।”

মেঘবর্ণ বলল, “আমিও না।”

বজ্রধর এগিয়ে চলেছেন অপ্রতিহত গতিতে। রাক্ষসসেনাদের যে প্রাচীর সুরক্ষা দিচ্ছিল শর্বরকে, সে প্রাচীর যেন তাঁর সামনে অগ্নিস্পর্শে জলবিন্দুর মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। শর্বর সভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

তার সামনে এসে দাঁড়ালেন বজ্রধর; গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “অসি নিষ্কাশন করো শর্বর।”

শর্বর বুঝতে পারছে, আর তার পরিত্রাণ নেই। বজ্রধরের সারা দেহ যেন দীপ্ত হয়ে উঠেছে অন্তরীণ প্রভায়। শর্বর কোমরের চর্মকোষ থেকে তার দীর্ঘ অসি টেনে বার করল।

হাতের দণ্ডটিকে নিজের কোমরে গুঁজে রেখে নিজ অসি নিষ্কাশন করলেন বজ্রধরও। গোটা মাঠভরতি দর্শক নীরবে চেয়ে রইল সেই দিকে।

“তুমি চাইলে যুদ্ধ করতে পারো, শর্বর,” বজ্রধর বললেন। “অথবা আত্মসমর্পণ করতে পারো। আমি তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি। কী চাও তুমি?”

শর্বর একবার দেখে নিল তার অনুগামীদের মুখের দিকে। ভয় সে একটু পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু লড়াই থেকে পিছিয়ে আসার পাত্র সেও নয়। সে বলল, “যুদ্ধ।”

“অতি উত্তম। যুদ্ধ করো আমার সঙ্গে।”

ওঁরা নেমে এলেন টিপি থেকে সমতলে; সকলে পেছনে সরে গিয়ে জায়গা করে দিল তাঁদের; শুরু হল দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

শর্বর অতি ভয়ংকর যোদ্ধা; কিন্তু আজ বজ্রধরকে পরাভূত করা অসম্ভব। শর্বরের প্রতিটি আক্রমণ তিনি প্রতিহত তো করছেনই, তার সঙ্গে প্রতিআক্রমণে পর্যুদস্ত করে দিচ্ছেন তাকে। মেঘবর্ণ ফিশফিশ করে বলল, “ওরে বাবা! এতকাল আছি এঁর সঙ্গে, কিন্তু এই মানুষটার এইরকম ভয়ংকর তরবারিকুশলতা আমিও আগে কখনও দেখিনি।”

বৃন্তাকারে ওঁদের ঘিরে রয়েছে দর্শকেরা। লড়াই করতে করতে ওঁরা কখনও চলে আসছেন সে বৃন্তের প্রান্তদেশে, আবার কখনও ফিরে যাচ্ছেন কেন্দ্রস্থলে। চাপা গর্জন করে বজ্রধর বলে উঠলেন, “আজ তোমার নিস্তার নেই, শর্বর।”

যুদ্ধ করতে করতেই একহাতে কপালের ঘাম মুছল শর্বর। কথাটা সত্যি, উপলব্ধি করতে পারছে সেও।

কিন্তু হঠাৎ যন্ত্রণাকাতর একটা শব্দ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন বজ্রধর।

তাঁর পিঠে আমূল বিধে গেছে একটা তরবারি। বিস্ফারিত নেত্রে সেদিকে তাকিয়ে রইল দর্শকেরা। এমনকি শর্বরও অবাক হয়ে গেছে।

দর্শকসমষ্টির মধ্য থেকে চিৎকার করে উঠল চঞ্চল। “কে আছেন সমরগরিমার

বীর; এগিয়ে আসুন, হত্যা করুন আমাকে। আপনাদের অধিনায়ক বজ্রধরের বিরুদ্ধে আমার যা প্রতিশোধ নেওয়ার ছিল, নিয়ে নিয়েছি আমি।”

বজ্রধর পড়ে আছেন মাটিতে; ঈষৎ কুঞ্চিত তাঁর মুখ – সম্ভবত যন্ত্রণায়। কিন্তু তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, “চঞ্চল, এবার তুমি শান্তিলাভ করেছ তো?”

চোখ বন্ধ হয়ে এল তাঁর, বুকের ওঠানামা থেমে গেল। স্থিরভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে শুয়ে রইলেন সমরগরিমার অধিনায়ক বজ্রধর।

দর্শকরা যেন নিশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে। অধিনায়ক বজ্রধর – আর নেই!

একহাতে নিধির হাত ধরে আর এক হাতে চোখের জল মুছল লীনা। তার পাশে সন্দীপ কাঁদছে নিঃশব্দে। মৃগেন্দ্র, তরুণ, উষসীরা দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভিত হয়ে। শ্যামশ্রীর হাত শক্ত হয়ে ধরে রেখেছে হাতের তরবারির মুষ্টি; তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন রক্ষাবৈদ্য।

গর্জন করে সামনে লাফিয়ে পড়ল পর্বত; দু’হাতে চঞ্চলের মাথাটা ধরে তাকে আছাড় মারল মাটিতে। ফট করে একটা বিশ্রী শব্দে বোঝা গেল, খুলি ফেটে গেছে তার।

আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল পুরোমাত্রায়। মেঘবর্ণ চিৎকার করে উঠল, “সমরগরিমার সেনানীরা। আজ আমাদের অধিনায়ক দেখিয়ে দিয়েছেন, হাতে অস্ত্র থাকলে আমরা কাউকে ভয় পাই না। মৃত্যু আমাদের কী ভয় দেখাবে? আজ আমরা হয় জয়লাভ করব, আর নয়তো সমরগরিমা নিয়ে বীরের মৃত্যু বরণ করব – আমাদের অধিনায়কের মত। অধিনায়ক বজ্রধরের জয় হোক।”

গর্জন করে উঠল সমরগরিমার সেনাসমষ্টি। “জয় হোক! জয় হোক!”

শর্বর পালটা চিৎকার করল। “দাঁড়াও সবাই। যুদ্ধ থামাও।”

তার চিৎকারের এমনই মহিমা, এক নিমেষে সবাই থেমে গেল। শর্বর বলল, “আজ আমাদের অনেক রাক্ষস অর্ধরাক্ষস ভাইরা তাঁদের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। আমার অনুরোধ, যে অর্ধরাক্ষস ভাইবোনেরা এখনও সমরগরিমার হয়ে লড়ছেন, তাঁরা আমাদের দলে যোগ দিন। এই মানুষেরা আপনাদের কেউ নয়। আমরা রাক্ষসেরা আপনাদের স্বজন। এই শত্রুর দলে থেকে আপনারা আর আপনাদের স্বজনহানি করবেন না, এ আমার একান্ত অনুরোধ। আমাদের দলে যোগ দিন; রক্ষা করুন নিজের প্রাণ, নিজের আপনজনেরদের প্রাণ।”

সারা মাঠ চুপ হয়ে গেল। মানুষগুলো তাকিয়ে রইল তাদের অর্ধরাক্ষস বন্ধুদের দিকে – যেন দেখতে চায়, এরা এবার কাদের দিকে যায়! নিঃশব্দ হয়ে গেল গোটা পরিবেশটা।

লীনা ছেড়ে দিল নিধির হাত। “যদি যেতে চাও, আমি তোমাকে আটকাব না।”

“তোমাদের ত্যাগ করে? আমার সমরগরিমা ত্যাগ করে? তুমি ভাবতে পারলে এ-কথা?” নিধির চোখে জল এসে পড়ল।

সমরগরিমা আয়তনের মাঠভরতি সেই নিঃশব্দতা ছাপিয়ে জেগে উঠল নীপার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। - “আমি অর্ধরাক্ষস। আমার অভীদাদাকে অন্যায়ভাবে মেরে ফেলেছ তুমি, শর্বর। তোমার যেন নরকেও ঠাই না হয়।”

মুহূর্তের মধ্যে যেন স্থির হয়ে গেল অর্ধরাক্ষসরা কোন পক্ষে থাকবে। পূর্ণ তীব্রতায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আবার।

কিন্তু বজ্রধর না থাকায় মেঘবর্ণ, শ্যামশ্রী আর পর্বতের পক্ষে এই সুবিশাল সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করা ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছিল। বজ্রধরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়েছে সেই অতিকায় বাদুড়ের ঝাঁক। ফলে রাক্ষসেরাও হয়ে উঠেছে আরও অপ্রতিরোধ্য। শ্যামশ্রী ফিশফিশ করে মেঘবর্ণকে বললেন, “আর বেশিক্ষণ নয়, বুঝতে পারছি।”

মেঘবর্ণ বলল, “আমিও বুঝতে পারছি। আর কোনো উপায় নেই।”

রাক্ষসরা ঘিরে ধরছে তাঁদের; আর লড়াই করতে পারছে না সমরগরিমার বাহিনী। আতর্জনাদে ভরে উঠছে যুদ্ধক্ষেত্র। পর্বত বলে উঠল, “সমরোত্তম শ্যামশ্রী, কী করব, আদেশ দিন।”

শ্যামশ্রী বললেন, “এতগুলো প্রাণকে ধ্বংস হতে দেওয়া যায় না। আমরা সমরোত্তমরা জীবন বিসর্জন দিচ্ছি। আমাদের প্রাণের বিনিময়ে হয়তো শর্বর শিক্ষার্থীদের জীবনভিক্ষা দেবে। মেঘবর্ণ, কী বলছ?”

মেঘবর্ণ বলল, “সমরগরিমা বিসর্জন দিতে হচ্ছে না তো তাহলে। হ্যাঁ, আমি খুব রাজি। পর্বত, তুমি থাকো, ছেলেমেয়েগুলোকে দেখো। আমরা যতক্ষণ বেঁচে আছি, শর্বর যুদ্ধ থামতে দেবে না। আমাদের যাওয়াই ভালো। ঐশিকশ্রেষ্ঠ সবাইকে রক্ষা করুন।”

ঠিক তখনই ঘটে গেল অদ্ভুত ঘটনাটা। আকাশ যেন ফেটে পড়ল অদ্ভুত জ্যোতিতে; কোথা থেকে বেজে উঠল শঙ্খ। সেই প্রচণ্ড আলোর মধ্য থেকে দেখা গেল নেমে আসছেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। তাঁর মাথায় স্বর্ণমুকুট - তার কেন্দ্রস্থলে জ্বলজ্বল করছে নীলকান্ত মণি, কোমরে কোষবদ্ধ অসি, হাতে ধনুর্বাণ ও গদা এবং পিঠে আটকানো আছে বর্শা। ডান বাহুতে অঙ্কিত আছে সুতীক্ষ্ণ তরবারির হাতলে উজ্জ্বল সূর্যের ছবি। এই অমিতপ্রভাব পুরুষকে নেমে আসতে দেখেই পালাতে লাগল রাক্ষসসৈন্যরা। মেঘবর্ণ ভক্তিভরে তাকিয়ে রইল হাতজোড় করে তাঁর দিকে - আর শ্যামশ্রীও তাকিয়ে রইলেন, তবে হাতজোড় করলেন না। শর্বর প্রায় কেঁদে উঠল, “না না, আবার নয়! আবার নয়!” আর পর্বত চোঁচিয়ে উঠল, “বেঁচে গেছি! আমরা বেঁচে গেছি!”

ঐশিকশ্রেষ্ঠ যুদ্ধদেব নেমে এলেন সমরগরিমার মাঠের মধ্যে, হাতে তুলে নিলেন উন্মুক্ত তরবারি; এসে দাঁড়ালেন তিনি শর্বরের সম্মুখে; গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “আবার এখানে আসার স্পর্ধা করেছে তুমি, দুর্বিনীত!”

এইবার শর্বর ভয় পেয়েছে। সে কাতর কণ্ঠে ডেকে উঠল, “উর্গায়ু! কোথায় গেলে তুমি?”

কিন্তু উর্গায়ুর কোনো পাত্তা নেই কোথাও।

তার এক অনুচরের দিকে চেয়ে ভীতভাবে শর্বর বলল, “উর্গায়ু বলেছিল, ঐশিকশ্রেষ্ঠকে তুষ্ট করার মন্ত্র জানে সে! এই দরকারের সময় কোথায় গেল সে?”

অসহায়ভাবে সে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না উর্গায়ুকে।

রাক্ষসরা পালাচ্ছে; তাদের আটকাচ্ছে সমরগরিমার সৈন্যরা। ঐশিকশ্রেষ্ঠ এগিয়ে এলেন শর্বরের দিকে।

“তোমার পাপের কলস পূর্ণ হয়েছে, শর্বর।”

মুকুটের নীলকান্ত মণি যেন জ্বলে উঠল ঐশিকশ্রেষ্ঠের। উদ্যত তরবারি নেমে এল শর্বরের ওপর। সে বাধা দিতেও পারল না; তার আগেই তার ছিন্ন মুণ্ড লুটিয়ে পড়ল সমরগরিমার মাঠে। ফিনকি দিয়ে কর্তিত গলা থেকে বেরিয়ে এল রক্তের ধারা।

হর্ষনাদ করে উঠল বিজয়ী সমরগরিমার সেনারা আর শিক্ষার্থীরা। অবশেষে এই ভয়ানক যুদ্ধে জয়লাভ করেছে তারা।

জয়ধ্বনি দিল তারা দেবতার নামে। “জয় ঐশিকশ্রেষ্ঠ যুদ্ধদেবের জয়!”

অভী পড়ে যাচ্ছিল নীচের দিকে।

জ্ঞান তার ছিল না বললেই চলে। কেবল এক অতলান্ত পাতালের দিকে সে পড়ছে আর তাকে ঘিরে রয়েছে তপ্ত, লালচে কমলা অগ্নিশিখা – এইটুকু অনুভূতি তার তখনও জেগে ছিল।

একবার তার মনে হল, “আমি কি তাহলে মরে গেছি?”

আর যেন সে পড়ছে না, কেবল ভেসে আছে। সে ভাবল, “আমি নিশ্চয়ই মরে গেছি। মরে গিয়ে এসেছি এখানে।”

চেতনাটা যেন ফিরে আসছে ধীরে ধীরে। সামনে পেছনে ওপরে নীচে যদিকেই তাকায়, শুধুই দাউ দাউ অগ্নিশিখা জ্বলছে। তার মধ্য দিয়ে সে আর নীচে পড়ছে না, ভেসে আছে একটুকরো কাগজের মতো।

ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিল অভী। চারপাশের প্রচণ্ড তাপ লাগছে তার চোখে মুখে, সারা গায়ে। কিন্তু সে তাপ তাকে ছুঁতে পারছে না, পোড়াতে পারছে না। অদ্ভুত একটা শীতলতা ঘিরে রেখেছে তার সারা দেহ এক সুরক্ষাবর্মের আড়ালে।
হিমকুশলতা!

আপনা থেকেই তার সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে বরফের মতো – সেই বরফের চাদর ভেদ করে তার দেহ স্পর্শ করতে পারছে না নরকগহ্বরের আগুন। অভী ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

অবশ্য এই বিরাট অগ্নিগহ্বরে কোনটা সামনের দিক আর কোনটা পেছনের দিক, বলা একরকম অসম্ভব। চলতে চলতেই সে দেখতে পেল, তার সামনে পেছনে উড়ে উড়ে যাচ্ছে অসংখ্য কালো কালো ছায়া। কারা এরা? কোথায় যাচ্ছে এরা? অভী বুঝতে পারল না।

কী অদ্ভুত এই জায়গা! বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই – কেবল তীব্র আগুনে তাপ আর চোখ-ঝলসানো হলদে কমলা আলো। তাদের মাঝখান দিয়ে ভেসে যাচ্ছে কালো ছায়ামূর্তিগুলো। আচ্ছা, ওরা কি এই নরকের সাজাপ্রাপ্ত প্রেত?

ভাবতেই বুকটা ধুকধুক করে উঠল তার। সে নিজেও তো ওদের মতোই

বন্দি এই জগতে। আর তার ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। এখানে থাকতে থাকতে একদিন হয়তো সেও ওই কালো ছায়াগুলোর মতো হয়ে যাবে – দেহহীন, অন্তঃসারশূন্য একটা অস্তিত্ব। হয়তো ওই ছায়ামূর্তিগুলো একদিন তার মতই মানুষ ছিল। আজ আর ওদের সেই মনুষ্যত্ব বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই; ওরা ছায়া, শুধুই ছায়া, তার বেশি কিছু নয়।

এই কি তাহলে নরক? তার কি অনন্ত নরকভোগের শাস্তি হল?

নিজের শরীর স্পর্শ করে দেখল অভী। এখনও ঠান্ডা। হঠাৎ তার মনে হল, বাবাও তো তার মতোই হিমকুশল ছিল!

মনে হতেই মনের মধ্যে একটা জোর পেল সে। যে হতাশাটা গ্রাস করছিল তাকে, সেটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন উদ্যমে সে ভাসতে শুরু করল সামনের দিকে। এই জায়গাটা বিরাট হতে পারে, কিন্তু তার হাতে তো সময়ের অভাব নেই।

বাবা যদি এখনও বেঁচে থাকে!

সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছু অনুভব করছে না বহুক্ষণ ধরে। সম্ভবত এখানে ওগুলো অনুভূত হয়ও না। ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল সে; তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগল চারপাশে।

সামনে আগুনের ওপর ওগুলো কী ভাসছে? জিনিসগুলো তার চেনা চেনা লাগছে কেন?

এ তো স্বপ্ন-উপল!

হাত দিয়ে ধরতে গেল সে; পাথরগুলো শূন্যে মিলিয়ে গেল।

আশ্চর্য তো!

তার মনে পড়ে গেল, একটা স্বপ্ন-উপল তো তার সঙ্গেই আছে। জিনিসটা বার করে এনে সামনে ধরতেই ওটা সেই লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে ভাসতে লাগল শূন্যে। অভী তাকিয়ে রইল ওটার দিকে।

সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে স্বপ্ন-উপল। সেদিকেই উড়ে যাচ্ছে কালো কালো ছায়ামূর্তিগুলো। অভী শুনতে পেল অনেকগুলো যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ, যেন অনেক মানুষ একসঙ্গে গোঙাচ্ছে তীব্র কষ্টে, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

নরকের সাজাপ্রাপ্ত প্রেত নাকি এসব! কারা এরা?

যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু লাল-কমলা-হলুদ আগুনের শিখা। পায়ের অনেক নীচে সম্ভবত বয়ে যাচ্ছে তরল আগুনের নদী, তার ছলছল শব্দ আসছে কানে। কোথায় যেন কীসব পুড়ছে, তার গন্ধ পাচ্ছে অভী। জিভটা শুকনো হয়ে আসছে। একবার ঢৌক গিলল সে। তার ভয় ভয় করতে লাগল।

স্বপ্ন-উপল ভেসে যাচ্ছে সামনের দিকে। তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলল সে।

“যেয়ো না, যেয়ো না, অভী!”

“অভী, থাকো এখানে! আমাদের সঙ্গে থাকো!”

“আমাদের রক্ষা করো! আর আমরা সহ্য করতে পারছি না!”

কারা যেন ডাকছে তাকে। অভী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। লালচে রঙের তণ্ড

দেয়ালগুলো যেন কম্পিত হচ্ছে থরথর করে। সেগুলোর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে অজস্র লাল, অগ্নিদগ্ধ হাত – অসহায়ভাবে তারা ডাকছে তাকে; থাকতে বলছে; যেতে দিতে চাইছে না। যন্ত্রণায় আঙুলগুলো বঁকে মুচড়ে যাচ্ছে সেইসব জ্বলন্ত হাতের। প্রচণ্ড শব্দে বুকের মধ্যে দামামা বাজছে অভীর।

কারা এরা? কীসের এত যাতনা এদের?

শুধু ভয় না, অভীর খুব কষ্ট হতে লাগল। ওদিকে স্বপ্ন-উপলের জ্রঙ্কেপ নেই এসবে – সে এগিয়ে চলেছে গনগনে আগুনের আঁচের মধ্য দিয়ে আপন গতিতে।

অভীও বাধ্য হয়েই চলল তার পিছু পিছু। স্বপ্ন-উপলকে এই মুহূর্তে হারিয়ে যেতে দেওয়া চলবে না।

ওই দূরে কী ওটা? আর একটা ভাসমান ছায়ামূর্তি? স্বপ্ন-উপলটা ভেসে চলেছে ওই দিকেই।

না, ছায়ামূর্তি নয়; রক্তমাংসের দেহ।

কাছে আসতেই অভী চিনতে পারল তাকে। “বাবা!”

শুকনো পাতার মতো ভেসে রয়েছে নীলাভ্র। সম্ভবত জ্ঞান নেই তার। অভী তার ঠান্ডা হাত রাখল নীলাভ্রের কপালে।

“বাবা, শুনতে পাচ্ছ?”

চোখের পাতা অল্প কম্পিত হল তার, কিন্তু সে চোখ খুলল না।

“বাবা, আমি অভী, তোমার ছেলে। শুনতে পাচ্ছ?”

নীলাভ্র অসাড়ভাবে ভেসে রইল আগের মতোই; কোনো উত্তর দিল না।

অভীর খুব অসহায় লাগছে। বাবাকে খুঁজে তো পাওয়া গেল; কিন্তু এখন তার জ্ঞান ফেরাবে কী করে? আর এখান থেকে ফিরবার উপায়ও তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

একটা কণ্ঠস্বর কথা বলে উঠল তার মাথার মধ্যে, “ফিরতে হবেই বা কেন? মৃতেরা তোমাকে থাকতে বলছে তাদের মাঝখানে। অনেক যন্ত্রণাভোগ করছে ওরা এখানে। তোমার মতো কেউ এখানে থাকলে ওদের কষ্টের একটু আরাম হয়, অভী। তুমি কাছে থাকলে ওরা একটু স্বস্তি পায়।”

এ কণ্ঠস্বর অভী শুনেছে মৃত দেবতার নদীর তীরে। সে হাতজোড় করে বলল, “হে দেবতা, আমাকে একবার যেতে অনুমতি দিন। আমি কথা দিচ্ছি, আমি আবার ফিরে আসব এখানে। আমার বন্ধুরা খুব বিপদের মধ্যে আছে; আমি না গেলে ওরা ভীষণ অসুবিধায় পড়বে। একবার যেতে দিন দয়া করে; বাইরের পৃথিবীতে আমার কিছু কাজ রয়ে গেছে, সেগুলো মিটিয়েই আমি ফিরে আসব।”

“মৃত্যু তো এভাবেই আসে, অভী। সকলেরই কিছু না কিছু কাজ বাকি রয়ে যায়। তোমারও তাই হবে, এতে আর আশ্চর্য কী?”

“আমি কি মৃত?”

দেবতা হাসলেন। “না, তুমি মৃতদের মাঝে আছ বটে, কিন্তু তুমি নিজে মৃত নও। নীলাভ্রও নয়।”

“আমরা এখনও মরিনি কেন? হিমকুশলতার জন্য?”

“হিমকুশলতা তোমাদের প্রাথমিক ভাবে রক্ষা করেছে ঠিকই, কিন্তু এই

নরকগহ্বরের তীব্র আগুন থেকে নিজেকে চিরকাল রক্ষা করার ক্ষমতা কোনো হিমকুশলের নেই। কিন্তু তাও নীলাভ্র মরেনি, আর তুমিও রক্ষা পেয়েছ। কেন জানো?”

“কেন?”

“এই নরকে লোকে আসে ঘৃণা, ক্রোধ, ঈর্ষা এইসব গুণের দ্বারা কৃত অন্যায়কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে। কিন্তু তোমরা দু’জন এখানে এসেছিলে একদম ভিন্ন কারণে। অন্যদের প্রাণ রক্ষার জন্য তোমরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র সমরগরিমা বিসর্জন দিয়ে স্বেচ্ছায় এসেছিলে এখানে। তাই নরকের পাপদাহন অগ্নি তোমাদের স্পর্শ করতে পারেনি।”

“আমি আবার আসব এখানে। আমি এখানে থাকলে যারা কষ্ট পাচ্ছে তাদের যদি কোনো উপকার হয়, আমি আবার আসব। কিন্তু আমার বন্ধুদের বড়ো বিপদ; এই মুহূর্তে আমাকে দয়া করে বাইরে যেতে দিন।”

“যারা এখানে কষ্ট পাচ্ছে, এখানে থেকেও তাদের বিশেষ কোনো উপকার তুমি করতে পারবে না। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, এ জগতের নিয়ম। তুমি বরং বাইরেই যাও; আত্মদের সেবা করো। জীবিতের দাবি মৃতের চেয়ে সবসময়েই অধিক হয়। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে একদিন।”

“কবে?”

“সময় হোক। তুমি এখনও প্রস্তুত নও। ...যাও, নীলাভ্রকে নিয়ে যাও। ভয় নেই, ও জেগে উঠবে। এই স্বপ্ন-উপলকে অনুসরণ করে চলে যাও।”

অভী দু’হাত তুলে সেই অদৃশ্য বক্তাকে নমস্কার জানাল।

পেছন থেকে একটা দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে ফিরে তাকাল অভী। নীলাভ্র কোনোক্রমে অর্ধেক চোখ খুলে তাকিয়েছে, বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। “কে তুমি?” ফিশফিশ করে বলল সে। “এখানে কী করছ?”

আনন্দে অভীর মনে হল, সে যেন কেঁদে ফেলবে। “বাবা, আমি... আমি অভী!”

“অভী!” বড়ো করে চোখ খুলতে চাইল নীলাভ্র, পারল না। এতদিনে এই নরকগহ্বর তার শরীরের প্রায় সব শক্তি শোষণ করে নিয়েছে।

অভী নিজের মুখটা তার কাছে নিয়ে গেল। নীলাভ্র দুর্বলভাবে একটা হাত তুলে স্পর্শ করল তার মুখ। “তুই... অভী! এই এতটুকু দেখেছিলাম তোকে!”

এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল নীলাভ্রের চোখ থেকে। বেরিয়ে আসা মাত্রই সে জল বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেল তীব্র তাপে।

“তুই এখানে কী করছিস, বাবা?”

অভীর ভীষণ কান্না পাচ্ছে। কিন্তু সেই কান্না দমন করে সে বলল, “আমি তোমাকে নিতে এসেছি। এসো আমার সঙ্গে।”

নীলাভ্র মাথা তুলল। একটু যেন জোর ফিরে পেয়েছে সে।

“আর তো আমি ফিরে যাব না রে। ওরা জানে, আমি বিশ্বাসঘাতক। বজ্রধর, মেঘবর্গ, পর্বত – ওরা আমাকে ‘কাপুরুষ’ ভেবে এসেছে এতকাল। কতদিন হল আমার এখানে আসা? দিন মাস তারিখের আর ঠিক থাকে না এই জায়গায়!”

“পনেরো বছর।”

“এ-ত-দি-ন? অবশ্য এখানের সময়ের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর সময়ের গতি মেলে না। কিন্তু আমি ফিরে গেলেই তো ঐশিকশ্রেষ্ঠ জানতে পেরে যাবেন। তখন আবার সবার বিপদ হবে। আমার না যাওয়াই ভালো। তুই ফিরে যা, বাবা।”

অভী বলল, “আমাকেও ঐশিকশ্রেষ্ঠই এখানে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমি ফিরে যাবই, আর তোমাকেও নিয়ে যাব। আমাকেও ওরা ‘বিশ্বাসঘাতক’, ‘কাপুরুষ’ এইসব ভাবছে নিশ্চয়ই। আমি তোমাকে নিয়ে ফিরে গিয়ে ঐশিকশ্রেষ্ঠ যে আসলে কতবড়ো শয়তান, সেটা সবার সামনে প্রকাশ করে দেব।”

“তোকে মেরে ফেলবে ও।”

“তাতেই বা ক্ষতি কী? সবার চোখে তো আমরা মরেই গেছি। এবার অন্তত বীরের মৃত্যু হবে। কিন্তু ওর আসল রূপটা তো সবার সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে। তুমি চলো আমার সঙ্গে।”

“আমি যে বিশ্বাসঘাতক! আমি যে আমার সমরগরিমা রাখতে পারিনি!”

নীলাব্র হাতটা জড়িয়ে ধরে অভী বলল, “বাবা, এখন আমি বুঝতে পেরেছি, দুনিয়ায় এমন কিছু আছে, যার জন্য সমরগরিমাকেও বিসর্জন দেওয়া যায়। তুমিই প্রথম সেই আত্মত্যাগ করেছিলে – তোমাকে নিয়ে আমার গর্বের শেষ নেই।”

দুর্বল হাতে অভীকে একবার আলিঙ্গন করল নীলাব্র। চারপাশের আগুন যেন হঠাৎ স্তিমিত হয়ে এল এক মুহূর্তের জন্য।

তারপর সে বলল, “চল কোথায় নিয়ে যাবি।”

স্বপ্ন-উপলটা কাঁপছে ওদের সামনে। তার পেছনে ভাসতে শুরু করল ওরা। সামনে অজস্র অগ্নিময় সুড়ঙ্গ। তাদের ভেতর থেকে আসছে বিকট সব অজানা প্রাণীদের হুংকার – সে শব্দ শুনলে গায়ের রক্ত যেন জল হয়ে যায়। আর শোনা যাচ্ছে মনুষ্যকণ্ঠের কাতর আর্তনাদ। অভী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, একবার অন্তত এখানে সে ফিরে আসবেই – এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে যারা, তাদের জন্য তাকে ফিরে আসতেই হবে।

একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল ভাসমান স্বপ্ন-উপল। তার পেছনে চলল ওরাও।

সুড়ঙ্গটা খুব প্রশস্ত নয় – দু’জন মানুষ পাশাপাশি যেতে পারে না। ভেতরের পাথুরে দেয়ালগুলো তীব্র উত্তাপে গনগনে লাল হয়ে আছে। বাতাস নেই, কিন্তু যত্রতত্র ভেসে বেড়াচ্ছে ধূসর ছাইয়ের অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র টুকরো। ভাসতে ভাসতে অভী বুঝতে পারল, সামনের সুড়ঙ্গপথটা হঠাৎ একটা খাদের সামনে শেষ হয়ে গেছে।

স্বপ্ন-উপল ভাসছে সেই গভীর খাদটার ওপর।

সুড়ঙ্গমুখ থেকে অনেক নীচের খাদের তলাটা দেখেই মাথা ঘুরে গেল অভীর। বহু, বহু নীচে প্রচণ্ড গতিতে বয়ে যাচ্ছে তরল আগুনের নদী – তাতে আগুনের তরঙ্গ, আগুনের ফেনা; গলগল শব্দ হচ্ছে তার ঢেউয়ের আঘাতে।

“অসম্ভব! অসম্ভব!” অভী বলে উঠল।

স্বপ্ন-উপল ভাসতে ভাসতে চলল নীচের দিকে। ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। সে ওদের ঝাঁপ দিতে বলছে এই নদীতে।

নীলাভ্র পেছন থেকে বলল, “ভয় পাস না, অভী। ও আগুনে আমাদের কিছু হবে না। এখান থেকে বেরোবার ওই একমাত্র রাস্তা।”

ফুঁসে উঠছে তরল আগুনের ঢেউ; আগুনের বুদবুদ উঠছে, আবার ফেটে যাচ্ছে পরস্পরেই। ওর মধ্যে পড়লে আর কি রক্ষা থাকবে? অভী ঘামতে লাগল।

স্বপ্ন-উপল কিছু দিব্যি নেমে গেল খাদে; নদীর মধ্যে পড়ল না সে; অপেক্ষা করে রইল ওদের জন্য নদী থেকে হাতখানেক ওপরে শূন্যে।

নীলাভ্র আবার বলল, “ভয় নেই। ঝাঁপ দে। স্বপ্ন-উপল ভুল পথ দেখায় না। আচ্ছা, আমিই আগে যাচ্ছি, তুই আমার পেছনে আয়।”

খাদে ঝাঁপ দিল সে; নামতে লাগল ভেসে ভেসে। “যা থাকে কপালে” ভেবে নেমে পড়ল অভীও। উঁচু থেকে পড়া পালকের মতো হলে দুলে নামতে নামতে তার মনে হল, পাশের আগুনের দেয়াল যেন উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে।

নদী স্পর্শ করল ওরা – প্রথমে নীলাভ্র, তারপর অভী। নদী তাদের পোড়াল না, ডোবাল না, ভাসিয়ে নিয়ে চলল স্রোতের মুখে শুকনো পাতার মতো। ওদের সামনে ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে ভেসে চলল স্বপ্ন-উপল।

তারপর স্রোতের গতি বেড়ে গেল। অসম্ভব দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ওরা। বেশ কিছুটা দূরে নদীটা গিয়ে পড়ছে আর একটা খাদে; বহু উঁচু থেকে নেমে আসা জলপ্রপাতের মতোই অগ্নিপ্রপাতে অনেক নীচের পাথরে ছিটকে উঠছে আগুনের কমলা হলুদ ফেনা – তার গর্জনে কান পাতা দায়।

সেই প্রপাতে পৌঁছোনের আগেই অবশ্য আর একটা স্রোত এসে মিশছে এই আগুনের নদীর সঙ্গে – অদ্ভুত হলদে রঙের একটা জলের স্রোত। যেখানে আগুনের সঙ্গে জল মিশছে, সেখানে সুড়ঙ্গের ভেতরটা ভরে উঠছে হলদেটে বাষ্পে। স্রোতটা ওদের নিয়ে চলল সেই জলের দিকে। অতিকায় বাষ্পের মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেল ওরা।

আর আশ্চর্য ব্যাপার হল, ওই জলে স্পর্শ করতেই অভী অনুভব করল, জল যদিকে বয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ প্রপাতের দিকে, তার ঠিক উলটোদিকে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই জলস্রোত। স্রোতের বিপরীতে কীভাবে আপনা থেকেই তারা ভেসে যাচ্ছে, বিষয়টা সে কোনোমতেই বুঝতে পারল না। তবে জলের হলদেটে রংটা দেখে সে আন্দাজ করতে পারছে, এ জল আসলে কোথাকার।

মৃত দেবতার নদী!

এই নদীর জল স্পর্শ করা উচিত নয়, সে জানে। তবে আজ সব অন্যরকম ব্যাপার হচ্ছে। দেবতা নিজেই তো আজ তাকে নিয়ে যাচ্ছেন এই পথ দিয়ে।

গুহাপথ প্রশস্ত হচ্ছে। তারা বেরিয়ে এল উন্মুক্ত আকাশের তলায়। পেছনে রয়েছে গেল তীব্র উষ্ণ, লালচে নরকগহ্বর। অভী মাথা ঘুরিয়ে দেখল, নরকগহ্বরের দ্বার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যেন কিছু ছিলই না ওখানে।

তারা এখন ভাসছে মৃত দেবতার নদীর জলে। জলের ঢেউ তাদের এনে ফেলল তীরে।

তীরে উঠে আসতেই শরীর থেকে সেই পালকের মতো হালকা ভাবটা চলে গেল, ফিরে এল ভার – আর সঙ্গে সঙ্গে অভী বুঝতে পারল, কী ভীষণ ক্লান্ত লাগছে তার। শরীর থেকে ঝরে যাচ্ছে জল; একটুও লেগে থাকছে না শরীরে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেহ শুকনো হয়ে গেল তাদের; সামান্য ভিজেভাবও রইল না।

নীলাভ্র লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, খোলা চোখে চেয়ে রইল ওপরের দিকে।

অভী তাকে শুয়ে থাকতে দিল। কতকাল আকাশ দেখেনি মানুষটা! শ্বাস নেয়নি উন্মুক্ত বাতাসে! তারও খুব ইচ্ছা হল, একবার গিয়ে শুয়ে পড়ে বাবার পাশে।

কিন্তু তখনই সে দেখতে পেল, নদীর জল থেকে উঠে আসছে একটা অদ্ভুত আকৃতি – তার মাথায় শিং, সারা গায়ে আঁশ, হাতে ত্রিশূল।

নীরসেনা!

অভী সশ্রদ্ধ নমস্কার করল তাকে। সে একটা ছোট জিনিস ধরিয়ে দিল তার হাতে; বলল, “নরকগহ্বরে তোমার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে প্রভু তোমার ওপর প্রীত হয়েছেন। এইটি তাঁর উপহার।”

সেই স্বপ্ন-উপলটা! অভী ভাবছিল, ওটা ডুবে গেছে জলে।

নীরসেনা বলল, “এর মধ্যে একজনের কণ্ঠস্বর ধরা আছে তোমার অজান্তেই। কাছে রাখো, ব্যবহার করো একে। তোমার অনেক উপকারে আসবে।”

নীরসেনা ডুবে গেল মৃত দেবতার নদীর জলে। নীলাভ্র ডাকল, “অভী, একবার আয় না।”

অভী এগিয়ে গেল তার দিকে। “বলো।”

“এবার আমরা আয়তনে ফিরব তো?”

“হ্যাঁ।”

“তার আগে আয়, পাঁচ মিনিট শুয়ে পড় আমার পাশে।”

অভী বুঝতে পারল, বাবা বুঝতে পেরেছে তার মনোগত ইচ্ছার কথাটা। কোনো কথা না বলে সে এসে শুয়ে পড়ল বাবার পাশে।

সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু দিনের শেষ আলো এখনও সামান্য লেগে রয়ে গেছে আকাশের প্রান্তভাগে। সন্ধ্যাতারা দেখা যাচ্ছে পশ্চিম আকাশে। উড়ে যাওয়া পাখিগুলোকে দেখিয়ে নীলাভ্র বলল, “এবার ঘর ফেরার সময় হল।”

অভী চুপ করে পড়ে রইল। এই মানুষটা তো তার একেবারেই অপরিচিত, কিন্তু তাও যেন আর একে দূরের মানুষ মনে হচ্ছে না তার। এতদিনের জমানো কী যেন একটা অভিমান দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে এল তার। নীলাভ্র হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার মাথায়।

দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। আর দেরি করা চলে না।

অভী বলল, “বাবা, এবার চলো।”

“হ্যাঁ, চল।”

কিন্তু উঠতে গিয়ে দেখা গেল, নীলাভ্র এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে কয়েক পা হেঁটে যাওয়াও তার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। কাতর কণ্ঠে সে বলল, “কী হবে রে,

অভী? তোকে একা ছাড়তেও যে আমার মন সায় দিচ্ছে না।”

অভী হাসল। “চিন্তা কোরো না, আমাকে একা ছেড়ে যেতে আর দিচ্ছি না তোমাকে।”

পোশাকের মধ্য থেকে নীল শঙ্খটা বার করে তাতে ফুঁ দিল সে।

মহানীলগৃধ্র অপরাজিতা উড়ে এল আকাশ থেকে। তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নীলাদ্র; তারপর হেসে বলল, “বাঃ, ছেলেটা আমার মানুষ হয়ে গেছে দেখছি!”

অপরাজিতার পিঠে উঠে বসল ওরা। নিমেষের মধ্যে আকাশে উঠে গেল মহানীলগৃধ্র, উড়ে চলল পীতপত্রবনের ওপর দিয়ে।

ওই যে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে আয়তন। ওই যে দেখা যাচ্ছে সারি সারি মানুষগুলোকে।

আকাশ থেকে যখন ওরা নেমে আসছে যুদ্ধক্ষেত্রে, তখন ওদের প্রথম দেখতে পেল মেঘবর্ণ। সে চিৎকার করে উঠল, “ওটা কে আসছে?”

ঐশিকশ্রেষ্ঠ তখনও দাঁড়িয়ে আছেন ওদের মাঝখানে। শর্বরের মুণ্ড একটু আগেই ছিন্ন করেছেন তিনি। মাঠে যত মানুষ, রাক্ষস, অর্ধরাক্ষস ছিল, সবার চোখগুলো স্থির হয়ে রইল পীতপত্রবনের দিক থেকে আকাশপথে এগিয়ে আসা নীলগৃধ্রের পিঠে বসে থাকা মানুষদুটোর গায়ে। তাদের পেছনে বেলাশেষের বেগুনি আকাশ; গায়ে এসে পড়ছে দিনান্তের লালচে আলোর আভা; চুল উড়ছে হাওয়ায়।

লীনা এত জোরে নিধির হাতটা চেপে ধরল, যেন ভেঙে ফেলবে। - “এ তো অভী!”

নিধি তাকিয়ে আছে হাঁ করে; কথা বলতে পারছে না।

পর্বত বিড়বিড় করছে, “অসম্ভব! এ অসম্ভব!”

মেঘবর্ণও চেপে ধরল পাশে দাঁড়ানো শ্যামশ্রীর হাত। “আর ও কে? অভীর পেছনে? দেখতে পাচ্ছ তুমি, শ্যামশ্রী? দেখতে পাচ্ছ?”

শ্যামশ্রী কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁরও চোখ নিবদ্ধ আকাশ থেকে নেমে আসা ওই আকৃতিদুটোর ওপর।

ঐশিকশ্রেষ্ঠের দ্রু কুঁচকে রয়েছে প্রবলভাবে, মুখে চিন্তার আভাস। তিনি জানেন, এ যা হচ্ছে, এ হওয়ার কথা ছিল না।

মাটিতে নেমে এল অপরাজিতা। নীলাদ্রকে ধরে ধরে নিয়ে এল অভী। তাকে মেঘবর্ণের হাতে সমর্পণ করে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে এক গাল হাসল সে। লীনা আর নিধি হাত নাড়ল তার উদ্দেশে।

তারপরেই বজ্রধরের মৃতদেহের ওপর চোখে পড়ল তার। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল অভীর।

“অনেক কথা বলার আছে আমার, মেঘবর্ণ। তবে আসল কথা হবে ওঁর সঙ্গে।”

ঐশিকশ্রেষ্ঠের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল সে। সমরোত্তমরা তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে। বাকিরাও দেখছে এই বিচিত্র দৃশ্য।

অভী এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। “আর আমাদের প্রতারণা করতে পারবেন না আপনি, ঐশিকশ্রেষ্ঠ। নাকি ‘উর্গায়ু’ নামে ডাকব আপনাকে?”

উপস্থিত মানুষগুলোর হাঁ-করা বিস্ময়টা উপলব্ধি করতে পারছিল অভী। ঐশিকশ্রেষ্ঠ গম্ভীরমুখে বললেন, “বড়ো ভয়ানক অভিযোগ করছ, অভী। এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ আছে তোমার কাছে?”

“একটা নয়, তিনটে প্রমাণ আছে। প্রথমত, গতবার শর্বর সমরোত্তমদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিল নাগপাশ অস্ত্র। এই দৈবাস্ত্র কোথায় পেল সে? কে দিল তাকে এই অস্ত্র? কার পক্ষে সম্ভব ছিল এই ধরনের অস্ত্র সংগ্রহ করে শত্রুপক্ষের কাছে তাকে পাচার করার? দ্বিতীয়ত, অচলগুহায় যেখানে শর্বর বন্দি ছিল, সেখানে মায়াবন্ধনী দিয়ে গুহাটা গতবার ঘিরে দিয়ে গিয়েছিলেন আপনি স্বয়ং। সেই বন্ধনী ভাঙার সাধ্য কোনো মানুষ, রাক্ষস বা অর্ধরাক্ষসের ছিল না। অথচ আমরা গিয়ে দেখি সে বন্ধনী ভেঙে আগেই শর্বরকে নিয়ে পালিয়েছে রাক্ষসেরা। কে ভাঙল সেই মায়াবন্ধনী? কার ক্ষমতা ছিল তাকে ভাঙার?”

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন ঐশিকশ্রেষ্ঠ। “ব্যস? এই তোমার প্রমাণের দৌড়? এরই বলে এতবড়ো অভিযোগ করছ তুমি?”

অভীও হাসল। “না ঐশিকশ্রেষ্ঠ, আরও একটা প্রমাণ আছে আমার হাতে। এই দেখুন।”

সেই স্বপ্ন-উপলটা তুলে ধরল সে। এইবার ঐশিকশ্রেষ্ঠের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বুঝতে পেরেছেন, অভীর হাতে তাঁর মৃত্যুবাণ।

মেঘবর্ণের বাড়ানো হাতে জিনিসটা তুলে দিল অভী। পাথরটার ওপর বিশেষ কায়দায় হাত বুলিয়ে শব্দের তীব্রতা বাড়ানোর মায়া প্রয়োগ করল মেঘবর্ণ। সমরগরিমার মাঠ গমগম করে উঠল ঐশিকশ্রেষ্ঠের কণ্ঠস্বরে।

“শর্বরের মতো একটা গাধা হাতে থাকায় আমার বেশ সুবিধাই হয়েছে। গতবারও ওকে প্রলুব্ধ করে এনেছিলাম এখানে, যাতে নীলাভকে উচিত শিক্ষা দিতে সুবিধা হয়। আর এবারও উর্গায়ু সেজে ক্রমাগত ইন্ধন দিয়ে গেছি ওর প্রতিশোধের আওনে। আর অর্ধরাক্ষসগুলোর অতি খারাপ অবস্থাটাকে কাজে লাগিয়ে নিতে পেরেছিলাম বলে এই চঞ্চলের মতো বঞ্চিত গরিবগুলো আমাকে ভগবান ভেবে বসে আছে। মানুষের কাছে সবচেয়ে ভালো কী বিক্রি করা যায় জানো? যার যে জিনিসের অভাব আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, সেই বস্তুটি। এখানকার গরিবদের অনেক ধরনের অভাব আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি অভাব আছে যেটির, সেইটি বিক্রি করেছি বলেই ওরা আমার পায়ে এসে পড়েছে। গরিবের কাছে সবচেয়ে ভালো বিক্রি হয় ‘স্বপ্ন’, বুঝলে অভী? ওদের উজ্জ্বল একটা ভবিষ্যৎ দেওয়ার স্বপ্ন, ওদের ছেলেপুলেরা সুখে থাকবে – এই স্বপ্ন, ওদের কেউ ‘গরিব’ বা ‘অর্ধরাক্ষস’ বলে আর অপমান করবে না – এই স্বপ্ন দেখাতে পেরেছিলাম বলেই আজ এত অনায়াসে জয় পেলাম আমরা। অবশ্য গরিব মূর্খগুলো জানে না, ওরা যেমন ছিল, তেমনই থাকবে চিরটাকাল। সবাই যদি মালিক হয়ে যায়, তাহলে চাকর হবে কে?”

বাকরুদ্ধ হয়ে কথাগুলো শুনছে সবাই। ঐশিকশ্রেষ্ঠের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। অভী বলল, “মেঘবর্ণ, পরের কথাগুলোও বেশ দামি। ওগুলোও সবাইকে শুনতে দাও।”

চরম ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে মেঘবর্ণ একবার তাকাল ঐশিকশ্রেষ্ঠের দিকে। তারপর আবার স্বপ্ন-উপলে বেজে উঠল চেনা কণ্ঠস্বর।

“কী চাই, বললাম তো তোমাকে। যাও, গিয়ে শর্বরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলো, ‘আমি আমার সমরগরিমা বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণ করছি’ – ঠিক তোমার বাবা যেমন করেছিল। কোনো যোদ্ধা সমরগরিমা বিসর্জন দিলে শর্বরের তাকে মারতে সুবিধা হয়। ওই চন্দ্রহাস হাতে নিয়েও এই বিশাল রাক্ষসসমুদ্রের মাঝে তুমি কিছুই করতে পারবে না, বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। এবার তোমার সামনে দুটো রাস্তা খোলা আছে। এক, সবাইকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে নিজের সমরগরিমা অক্ষুণ্ণ রেখে মৃত্যুবরণ করা – যদিও সে চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত কেউই বাঁচবে না। আর দুই, সমরগরিমা ত্যাগ করে ভীকুর মৃত্যু, বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুকে স্বীকার করে নেওয়া – এতে অবশ্য বাকিরা সবাই বেঁচে যাবে, কারণ তুমি মরলেই আমি আমার ঐশিক যুদ্ধদেবরূপে আবির্ভূত হব সবার সামনে; পরাজিত করব শর্বরকে। এবার তুমি কী করবে, স্থির করো।”

এতগুলো মানুষের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে মনে হল, ঐশিকশ্রেষ্ঠ কুঁকড়ে যাচ্ছেন। তিনি বুঝতে পারছেন, আর সাধু সাজার কোনো উপায় নেই তাঁর।

তরবারি হাতে তুলে নিল মেঘবর্ণ। ঐশিকশ্রেষ্ঠ বলে উঠলেন, “তোমার সাধ্য কী, মেঘবর্ণ, তুমি আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করো? ভুলে যেয়ো না, আমি ঐশিক যুদ্ধদেব। আমাকে মারার ক্ষমতা তোমাদের কারও নেই। সমরগরিমার প্রত্যেকটি মানুষকে চাইলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হত্যা করতে পারি আমি।”

অভী বলল, “মেঘবর্ণ, তুমি দাঁড়াও। আমি যাচ্ছি।”

মাটি থেকে চন্দ্রহাস কুড়িয়ে নিল সে। নীলাভ দুর্বল কণ্ঠে বলল, “না, অভী। ও ভয়ানক যোদ্ধা; ওর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে যাস না।”

মেঘবর্ণ একটু হেসে আদরের থাপ্পড় মারল বন্ধুর কাঁধে। “তোর ছেলে তোর থেকেও ওস্তাদ হয়েছে রে। আমি বলছি, ভরসা রাখ।”

হাতে তুলে নিতেই ধকধক করে সাদা আগুনের মতো জ্বলে উঠল চন্দ্রহাস – যেন স্বয়ং চন্দ্রের প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার সুতীক্ষ্ণ শরীর। তার আলো এসে পড়ল অভীর মুখে। নিধি ফিশফিশ করে লীনাকে বলল, “আজ আর ব্যাটার রক্ষা নেই।”

ঐশিকশ্রেষ্ঠ মুখে বলছেন না, কিন্তু তিনি যে ভয় পেয়েছেন, সেকথা বলে দেওয়ার দরকার পড়ে না। তিনি বললেন, “অভী, ও ভয়ংকর অস্ত্র। রেখে দাও, রেখে দাও! ও স্বয়ং শিবের তরবারি – ও জিনিস নিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই!”

অভী বলল, “আপনার কী মনে হয় আমি ছেলেখেলা করছি?”

“আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসো না। আমাকে কেউ পরাস্ত করতে পারেনি কখনও। আমি স্বয়ং যুদ্ধের ঐশিক। বেঘোরে মারা পড়বে তুমি।”

অভী হাসল। “আমি নরক থেকেও জীবন্ত উঠে এসেছি, মাতামহ। আপনি

আমাকে মারতে পারবেন তো?”

চন্দ্রহাস জ্বলছে, তার সঙ্গে জ্বলছে অভীর সারা শরীর। অস্ত্রটা যেন তার শরীরের একটা অংশ হয়ে গেছে – প্রচণ্ড তেজ বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার সারা দেহ থেকে। সে এগিয়ে এল; ঐশিকশ্রেষ্ঠ পিছিয়ে গেলেন কয়েক পা।

মেঘবর্ণ এসে দাঁড়াল অভীর পাশে। “এই পবিত্র অস্ত্রের আঘাত কোনো দেবতাও সহ্য করতে পারবেন না। দোষীর সঙ্গে এর স্পর্শ ঘটলে তার মৃত্যু নিশ্চিত – তাকে আটকানোর কোনো উপায় নেই। তাই, হে শিক্ষকমহাশয়, আপনার ছাত্রদের ছাত্রকে উপযুক্ত সম্মান দিন, এতেই আপনার মঙ্গল।”

অভী তরবারি উদ্যত করল। নিজের অস্ত্র নিষ্কাশন না করেই ঐশিকশ্রেষ্ঠ মাথা নত করলেন। তাঁর নীলকান্তমণিশোভিত স্বর্ণমুকুট লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

“আমি আত্মসমর্পণ করছি।”

চরম অবিশ্বাস চোখে নিয়ে সবাই দেখল, সমরগরিমার প্রতিষ্ঠাতা ঐশিকশ্রেষ্ঠ যুদ্ধদেব তাঁর সমরগরিমা ত্যাগ করে মাথা নোয়ালেন প্রতিপক্ষের সামনে। কপালে তাঁর ফুটে উঠেছে ঘামের বিন্দু, হাত কাঁপছে থরথর করে। অভী তার অস্ত্র নামিয়ে নিল।

এইবার এগিয়ে এলেন শ্যামশ্রী। “নিজের মেয়েকেও মারতে হাত কাঁপেনি তোমার। তারপর তুমি নজর দিলে নিজের জামাই, নিজের নাতির দিকেও? এত নীচ তুমি?”

অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন ঐশিকশ্রেষ্ঠ। শ্যামশ্রী বলে চললেন, “আর এখন নিজের ‘সমরগরিমা’ও বিসর্জন দিলে তুমি? কীসের জন্য? শুধু নিজের জীবনটুকু বাঁচাতে? নিজের আর নিজের ছয় ঐশিকবন্ধুর অমরত্ব রক্ষা করতে? এই তুচ্ছ জীবন এত প্রিয় তোমার কাছে?”

কেউ কোনো কথা বলছে না। শ্যামশ্রীকে এত ক্রুদ্ধ হতে অভী কখনও দেখেনি। তিনি বলে চলেছেন, “নিজে তো তুমি রাক্ষসের মেয়ে অপহরণ করে বিবাহ করেছিলে। তোমার কোনো অধিকার কখনই ছিল না অন্যের বিবাহে বাধা দেওয়ার।”

ঐশিকশ্রেষ্ঠের চোখ বিস্ফারিত। তিনি বলে উঠলেন, “কে তুমি? তুমি তো বজ্রধরের ছাত্রী ছিলে শুনেছি, যাকে সে পরে ‘সমরোত্তম’ পদে উন্নীত করেছিল। এসব গোপন কথা তুমি জানলে কী করে?”

মাঠভরতি লোকের সামনে এই প্রথম সমরোত্তম শ্যামশ্রী তাঁর মুখোশ খুলে ফেললেন। অভী চমকে উঠল। এই মহিলাকেই তো সে স্বপ্ন-সরোবরের তীরে দেখেছিল – কে যেন পিঠে ছুরি মেরে খুন করেছিল ঐকে!

ঐশিকশ্রেষ্ঠ যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। “তুমি!”

“হ্যাঁ বাবা, আমিই।” অদ্ভুত একটা হাসি হাসলেন শ্যামশ্রী। “তোমার মেয়ে, আর অভীর...”

ফিশফিশ করে অভী বলল, “মা!”

কেউ কোনো কথা বলছে না। সমরগরিমার মাঠজুড়ে কী বিপুল নীরবতা।

“বজ্রধর সব জানতেন। সমরোত্তমরাও সবাই জানত। পর্বতও। কিন্তু তোমাকে কেউ বলেনি। কারণ কী জানো? ওরা আমাকে আর নীলাভ্রকে ভালোবাসত, আর ভয় পেত তোমাকে।” শ্যামশ্রীর মুখ যেন পাথরে কোঁদা। “এবার যে তোমার হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ার পালা, বাবা!”

তিনি একবার বিশেষ ভঙ্গিতে হাত দোলালেন; অভীর হাত থেকে উজ্জ্বল চন্দ্রহাস উড়ে গিয়ে পড়ল ঐশিকশ্রেষ্ঠের সামনে।

“তোমাকে এটা দিচ্ছি, যাতে এই শেষ মুহূর্তে কিছুটা হলেও সমরগরিমা নিয়ে তুমি যেতে পারো।”

ঐশিকশ্রেষ্ঠ স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের দিকে। শ্যামশ্রীর মুখে দয়া নেই, করুণা নেই – শুধুই একটা ঘৃণামিশ্রিত অনুকম্পা।

শ্যামশ্রী বললেন, “চন্দ্রহাস দিয়েছি তোমার সামনে। কেন দিলাম, তুমিও জানো খুব ভালো করেই। তোমার পক্ষে এখন যা করা উচিত, ওই অসি তাই করাবে তোমাকে দিয়ে। এবার তুমি কী করবে, তোমার ইচ্ছা।”

মাথা নাড়লেন ঐশিকশ্রেষ্ঠ। একবার তাকালেন তিনি শ্যামশ্রীর দিকে, তারপর তাকালেন অভীর দিকে। বললেন, “নিয়তিই সর্বশক্তিমান। তাই হোক তবে। অভী, আমি দুঃখিত।”

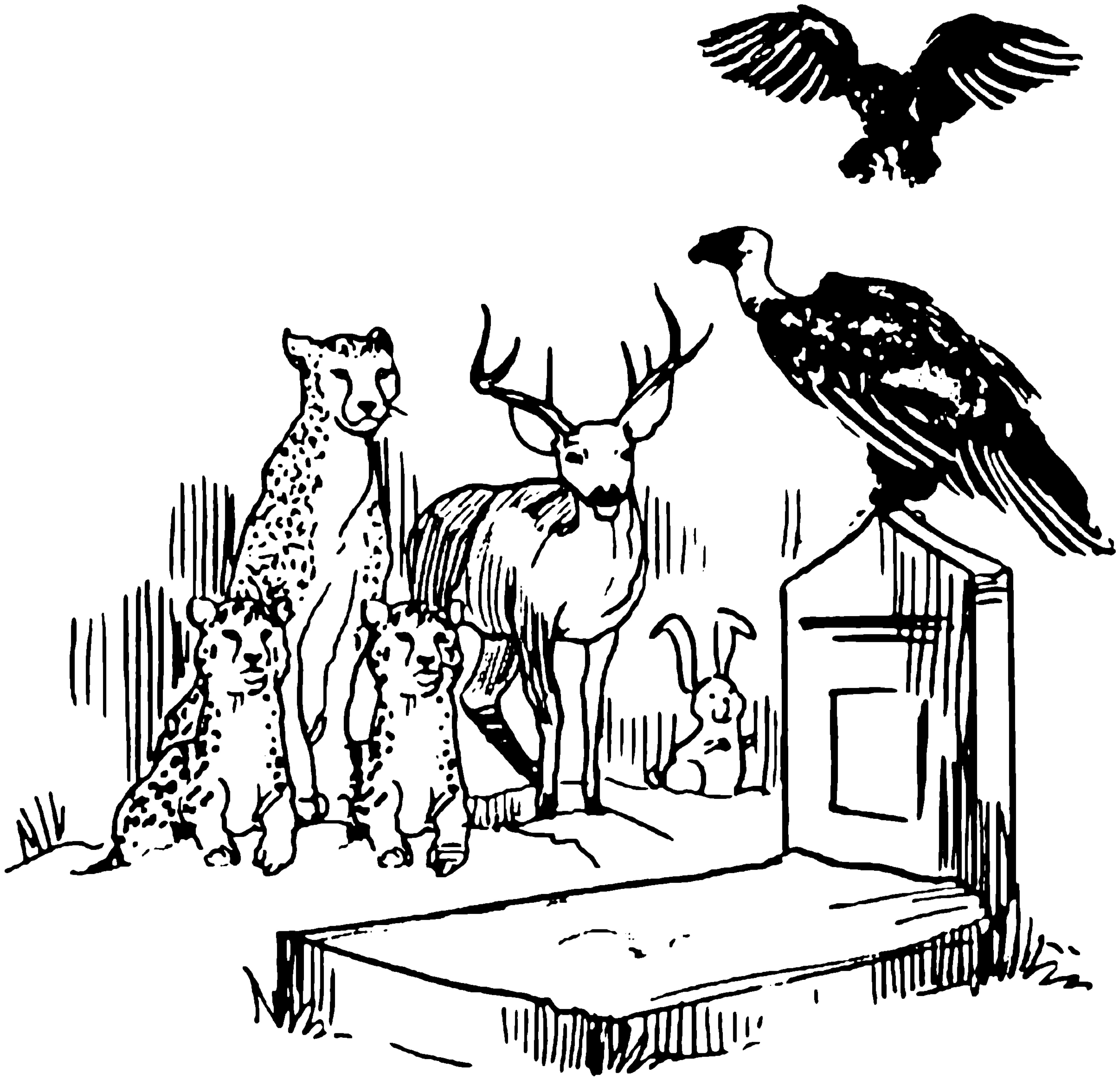
চন্দ্রহাস হাতে নিয়ে নিজের বুকে বসিয়ে দিলেন তিনি। রক্ত বেরিয়ে এল গলগল করে। মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর নিষ্প্রাণ দেহের ওপর চন্দ্রহাস জ্বলতে লাগল অর্ধচন্দ্রের শুভ্রতায়।

ধীর পদক্ষেপে শ্যামশ্রী ফিরে এলেন নীলাভ্রর কাছে। সে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্পলকে।

অভী আর মেঘবর্ণ এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে। এগিয়ে এল নিধি, লীনা, সন্দীপ, তরুণ, মৃগেন্দ্র, পর্বত। রক্ষোবৈদ্য একবার হাসলেন অভীর দিকে তাকিয়ে।

শ্যামশ্রী পাশে বসলেন নীলাভ্রর; তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন নিঃশব্দে।

নীলাভ্র একটু হেসে দুর্বল কণ্ঠে বলল, “অভী, আমি পনেরো বছর নরকবাস করে এইমাত্র এসেছি। তোর মাকে বল, যেন এখনই এত জোরে জড়িয়ে না ধরে।”



।। একবিংশ অধ্যায় ।।

উত্তরকথন

বেশ কিছুক্ষণ পরে পর্বত এসে বলল, “একটা অবাক কাণ্ড দেখে যাও। এমন দৃশ্য তোমরা আগে কখনও দেখো নি।”

নিধি আর লীনার সঙ্গে অভী চলল। শ্যামশ্রীকে নীলাভ্রর কাছে রেখে ওদের সঙ্গে নিল মেঘবর্ণ। সমরগরিমা আয়তনের অনুশীলন মঞ্চের মাঠের এক কোণে যে জলের কূপ ছিল, সেইখানে গিয়ে পর্বত বলল, “একবার উঁকি মেরে দেখো ভেতরে কী আছে।”

বেশি জল এই কূপটাতে থাকে না বলে এটা খুব একটা ব্যবহার করাও হয় না কখনও। কূপের কাছে যেতে যেতেই পর্বতের খিক খিক হাসি শুনতে পাচ্ছিল অভী। মেঘবর্ণসহ ওরা চারজন উঁকি মারতেই দেখতে পেল দৃশ্যটা।

নিয়ামক বিনীতেশ গুটিগুটি মেরে বসে আছেন ভেতরে; ভয়াত, ক্রুদ্ধ মুখে ওদের দেখছেন ওপরের দিকে মুখ তুলে। মেঘবর্ণকে দেখে তিনি বললেন, “শর্বর কই, মেঘবর্ণ?”

কূপের অনেক নীচ থেকে কথা বলায় প্রতিধ্বনি হতে হতে উঠে এল তাঁর কণ্ঠস্বর।

পাশ থেকে পর্বত ফিশফিশ করে বলল, “সম্ভবত শর্বরের বাহিনী আসামাত্র উনি বেগতিক বুঝে এসে লুকিয়ে ছিলেন এখানে। তাই কেউ ওঁকে খুঁজে পায়নি এতক্ষণ।”

মেঘবর্ণ কূপের মধ্যে মুখ নীচু করে বলল, “শর্বর জয়লাভ করেছে যুদ্ধে, নিয়ামক মহোদয়। আপনাকে শূলে চাপিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেবে বলছে। আমাদের পাঠিয়েছে আপনাকে ধরে আনতে।”

নিয়ামক বিনীতেশের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। পাশেই পর্বত খ্যা-খ্যা করে হাসছে পেট চেপে ধরে। “ওঃ মেঘবর্ণ, তুমি পারোও বটে!”

হাসতে হাসতে ওরা তিন বন্ধু সরে এল কূপের সামনে থেকে। ওরা শুনল, মেঘবর্ণ মিছিমিছি ডাকছে, “ওহে রাক্ষসরা, এসো হে এদিকে। আমাদের নিয়ামক মহোদয় এইখানে আছেন।”

ভেতর থেকে প্রতিধ্বনি সহযোগে নিয়ামকের বিকৃত কণ্ঠস্বর উঠে এল। “খবরদার বলছি, মেঘবর্ণ! আমি কোথায় আছি, বলবে না ওদের।”

আর গাঙ্গীর্ষ ধরে রাখতে না পেরে ওখানেই হেসে ফেলল মেঘবর্ণ। তার সঙ্গে আবার যোগ দিল পর্বতসহ বাকিরা। তারপর অনেক কাণ্ড করে নিয়ামককে কূপের মধ্য থেকে তুলে আনার পর পর্বতকে খুব দামি একটা কথা বললেন তিনি।

“হেসো না, পর্বত। সমরগরিমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটা কে বলো তো? অবশ্যই তার নিয়ামক। তাই নিজের প্রাণ রক্ষা করাটা সমরগরিমার জন্যই সবচেয়ে জরুরি ছিল। তুমি একে যা খুশি ভাবতে পারো, কিন্তু আমার কাছে এই আত্মরক্ষার একমাত্র কারণ – খাঁটি দেশপ্রেম। বুঝেছ?”

অধিনায়ক বজ্রধরকে সমাধিস্থ করা হয়েছে পীতপত্রবনে। জলাশয়ের পাশে যে নির্জন স্থানটিতে বসে থাকতে ভালোবাসতেন তিনি, সেইখানেই মাটির আশ্রয়ে চিরকাল শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকবেন অধিনায়ক। সমাধির ওপর একটা ধাতব ফলকে লেখা রইল, “প্রিয় সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর – শিক্ষক, বন্ধু, সহযোদ্ধা। আমাদের মধ্যে যে সমরগরিমা আপনি জাগিয়েছেন, তার কখনও মৃত্যু নেই।”

মেঘবর্ণ বলল, “তুমি ওঁর কন্যাসমা ছিলে শ্যামশ্রী। যাও, তুমিই প্রথম মাল্য-অর্পণ করে এসো।”

চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল শ্যামশ্রীর, কিন্তু তাঁর মুখের ভাব শান্ত। প্রথমে তিনি, তারপর একে একে আয়তনের সব ছাত্রছাত্রী, তারপর রক্ষাবৈদ্য, নিয়ামক বিনীতেশ, পর্বত – সবাই মালা দিয়ে প্রণাম করল সমাধিতে। আয়তনের প্রত্যেকটি সেনা, মিত্রমাসি ও তাঁর মতো ভবন-অধ্যক্ষেরা এবং অন্যান্য কর্মচারীরা প্রত্যেকে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল সমরগরিমার অধিনায়ককে। একদম শেষে মাল্যদান করল মেঘবর্ণ আর নীলাভ্র।

নীলাভ্র ফিশফিশ করে বলল, “মেঘ, উনি আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেলেন রে!”

মেঘবর্ণ কোনো কথা না বলে বন্ধুর হাত জড়িয়ে রাখল। তারপর শেষ নমস্কার করে উন্মুক্ত অরণ্যে তাঁকে রেখে ধীরে ধীরে সবাই ফিরে গেল।

নিয়ামক বিনীতেশ এই মুহূর্তে খুব একটা খারাপ ব্যবহার কারও সঙ্গে করছেন না ঠিকই, কিন্তু অভী জানে ওঁর স্বভাবই এমন যে সুযোগ পেলে আবার নিজের চেনা অবতারে ফিরতে ওঁর দেরি হবে না। তবে আপাতত তিনি শান্তই আছেন; সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন, সমরোত্তমদের সাহায্য ছাড়া ওঁর এখন চলবে না।

মেঘবর্ণকে সমরোত্তম অধিনায়ক পদ দিতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সে এককথায় প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, “ক্ষমা করবেন, নিয়ামক মহোদয়। আমার কাছে চিরকালের অধিনায়ক একজনই, আর তিনি গুয়ে আছেন পীতপত্রবনে। এ জীবনে আর কাউকে আমি ‘অধিনায়ক’ বলে স্বীকার করতে পারব না। সম্ভবত বাকি সমরোত্তম যাঁরা আছেন, তাঁরাও আমার সঙ্গে সহমত হবেন। তবে হ্যাঁ, আপনি যদি পদের কথা বলেন, তাহলে আমার প্রস্তাব, ‘সহঅধিনায়ক’ পদে আপনি সমরোত্তম শ্যামশ্রীকে অভিষিক্ত করুন। আমার মতে, উনিই বর্তমানে এই পদের যোগ্যতম ব্যক্তি।”

নীলাভ্র আর পর্বতেরও সমর্থন পাওয়া গেল এ-বিষয়ে। শ্যামশ্রী ‘সহঅধিনায়ক’ নির্বাচিত হলেন শিক্ষার্থীদের অভিনন্দনের মধ্য দিয়ে।

রক্ষোবৈদ্যও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, “সহঅধিনায়কের কাছ থেকে একটা বক্তব্য আমরা আশা করি কিন্তু শ্যামশ্রী।”

শ্যামশ্রীর মুখ গম্ভীর। তিনি বললেন, “রক্ষোবৈদ্য, এই মুহূর্তে আর বক্তব্য রাখার ইচ্ছা নেই আমার। মাথার ওপর থেকে অভিভাবকের হাত সরে গেছে আমাদের; সমরগরিমার ছাদ ভেঙে পড়েছে। তাকে পুনর্নির্মাণ করাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ। বক্তব্য পরে একদিন হবে, আজ নয়।”

যমদণ্ডের ক্ষমতাসম্পন্ন বজ্রধরের দণ্ডটিকে শ্রদ্ধাভরে সংগ্রহশালায় এনে রাখলেন শ্যামশ্রী। অভী দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। শ্যামশ্রী বললেন, “অভী, একবার আমার সঙ্গে যাবি তো আজ রাতে পীতপত্রবনে।”

অভী একটু অবাক হল, কিন্তু বেশি কিছু না বলে সে বলল, “আচ্ছা।”

নীলাভ্র আর মেঘবর্ণ ঘুরে বেড়াচ্ছিল সংগ্রহশালার মধ্যে। নীলাভ্র বলছিল, “শ্যামশ্রীর কাছে খবর পেলাম, তুই নাকি নরকগহ্বরের দ্বার উন্মুক্ত করার চেষ্টা করছিলি? বজ্রধর জানতেন?”

মেঘবর্ণ একটু হেসে বলল, “দূর! উনি জানলে কি আর ওসব করতে দিতেন? তবে বড়ো কঠিন রাক্ষসমায়া রে ওটা। আমি পারলামই না শেষপর্যন্ত।”

“পারিসনি, ভালোই হয়েছে। ও অতি ভয়ংকর জায়গা। ওর মুখ যদি এখানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে খুলে ফেলতিস, তাহলে সমরগরিমায় প্রলয় হয়ে যেত।”

শ্যামশ্রী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন বজ্রধরের দণ্ডের সামনে। চন্দ্রহাসকে তার নিজের জায়গায় শ্রদ্ধাভরে রেখে দিয়ে অতী ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল বাইরে।

লীনা আর নিধি দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে, অপেক্ষা করছিল তার জন্যে। ওদের সঙ্গে বাইরের মাঠে হাঁটতে শুরু করল সে।

বন্ধুদের সঙ্গে এই সময়টুকু মনে মনে চাইছিল অতী - তার প্রাণ যেন একটু মুক্তি চাইছিল এইসব ঘটনার প্রবাহ থেকে।

চাঁদ উঠেছে রাতের আকাশে; তার আলোয় কোমল ছায়া পড়েছে ওদের। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

তারপর লীনা বলল, “অতী, আমরা একমুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করিনি।”

নিধি বলল, “শুধু ‘বিশ্বাস করিনি’ তাই নয়, কেউ যদি তোমার নামে একটা খারাপ কথা বলত, তার মুখ ভেঙে দিতে দু’বার ভাবতাম না।”

অতী থেমে দাঁড়াল, মুখোমুখি হল বন্ধুদের। “তাহলে তোমাদের একটা কথা বলি। আমাকে ওখানে থেকে যেতে বেশ কয়েকবার বলেছিলেন মৃত দেবতা। কিন্তু তাও আমি ফিরে আসতে পেরেছিলাম - শুধু তোমাদের জন্য। আমার মনে পড়ছিল, আমার বন্ধুদের আমি বিপদের মধ্যে রেখে চলে এলাম। ঐশিকশ্রেষ্ঠ যে কতবড়ো শয়তান, তোমরা কেউ জানতেও পারলে না, আর তার মানে উনি আবার তোমাদের ক্ষতি করবেন - এই চিন্তায় আমার ভেতরটা কেমন যেন ছটফট করছিল।”

লীনা তার হাত ধরল, নিধি থাপ্পড় মারল তার কাঁধে। অতী বলল, “আমি জানতাম, আর যে যা ভাবে ভাবুক, তোমরা কখনও আমাকে বিশ্বাসঘাতক ভাবতে পারবে না।”

নিধি বলল, “সে তোমার সাহস হবে না জানি। তাহলে ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তোমার কঙ্কাল ঝোলাব, মনে আছে নিশ্চয়ই?”

হাসতে হাসতে এগিয়ে চলল ওরা। অতীর মনটা এতক্ষণে একটু হালকা লাগছে ঠিকই; কিন্তু তাও কিছুতেই যেন সে পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারছে না।

অধিনায়ক বজ্রধর আর নেই, যেন মেনে নিতে পারছে না সে কোনোভাবেই।

কী দারুণ স্নেহ করতেন উনি তাকে, সে-ই শুধু জানে।

শ্যামশ্রী পেছন থেকে ডাকলেন, “অতী।”

অতী সাড়া দিল, “যাই।”

বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অতী মায়ের সঙ্গে চলল পীতপত্রবনের দিকে। সুদক্ষিণসারির পথ রয়ে গেল ডানদিকে; ওঁরা বামদিকের পথটা ধরলেন।

চাঁদ অনেকটা উঁচুতে উঠে এসেছে। সারি সারি গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তার উজ্জ্বল দেহাংশ। অরণ্যের গভীরে যাচ্ছেন ওঁরা। গাছের গায়ে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে মৃদু আলোছায়ার বিচিত্র সব নকশা। রাত বাড়ছে, বনের ভেতরটা যেন ঠান্ডা হয়ে এসেছে।

রাশি রাশি মরা, হলুদ পাতা জমে আছে পায়ের তলায়; প্রতি পদক্ষেপে মচমচ শব্দ করে ভাঙছে তারা। শ্যামশ্রীর পাশে নীরবে হেঁটে চলল অভী। সে বুঝতে পারল, তিনি ওকে নিয়ে যাচ্ছেন বজ্রধরের সমাধির দিকে।

মৃদু হলদে একটা আভা যেন বেরিয়ে আসছে গাছগুলোর শরীর থেকে। পুকুরটার সামনে এসে বসলেন শ্যামশ্রী; ওকে ইঙ্গিত করলেন পাশে বসতে।

“সব জেনেও তোর সঙ্গে কাজের কথা বাইরে বেশি কথা বলতে সাহস হয়নি কোনোদিন, জানিস অভী? নিজের ছেলেকে এতদিন ছেড়ে থাকা, তাকে বহুকাল পরে সামনে পেয়েও একবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে না পারা – এ যে কত বড়ো কষ্ট, তুই বুঝবি না।”

অভী চুপ করে রইল। বজ্রধরের পুষ্পশোভিত সমাধির সামনে এসে বসেছে ওরা। ফুল-মালা-ধূপের গন্ধে ভরে আছে জায়গাটা।

শ্যামশ্রী বললেন, “আয়তনে তোকে ফাঁকা পাব না বলেই এখানে নিয়ে এলাম। কিছু কথা তোর জানা দরকার। তার মধ্যে প্রথমটা হল, আর ‘সমরোত্তম শ্যামশ্রী’ নয়, ‘মা’ বলবি আমাকে। পারবি তো?”

অভী মাথা নাড়ল। একটু একটু কান্না পাচ্ছে তার।

শ্যামশ্রী বুঝতে পারলেন তার মনোভাব। আলতোভাবে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বজ্রধরের সমাধির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “এই মানুষটাকে কেন এত ভালোবেসেছিলাম জানিস? আমার নিয়তি দেখ শুধু একবার, বুঝতে পারবি। বিয়ে করলাম, তুই হলি, কিন্তু তারপরেই নিজের বাপ আমাকে খুন করতে চাইল সেই অপরাধে। স্বামীকে দুনিয়াসুদ্ধ লোক ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে চিহ্নিত করে দিল। আমিও ছিলাম সেই দলে, অস্বীকার করি না। স্বামীকেও হারালাম। তারপর পাছে তোর কোনো ক্ষতি হয়, তাই তোকে রেখে আসা হল বাইরে। স্বামী, সন্তান, পিতা – কারও কাছে একমুহূর্তের শান্তি পাইনি রে আমি।”

অভী শুনতে লাগল। শ্যামশ্রী আবার বললেন, “বাবা যখন জানতে পারল আমি নীলাব্রকে বিয়ে করেছি আর আমার একটা সন্তান হয়েছে, তখন সে খেপে আগুন হয়ে গেল। ভবিষ্যদ্বাণী তো ছিলই যে ত্রিরক্তসম্পন্ন এক মানুষের জন্যই একদিন সব ঐশিকের অমরত্ব বিনাশ হবে, তাদের পতন হবে। বাবা ভাবল, তুই-ই সেই প্রলয়যোদ্ধা। তাই সে আমাকে ছুরি মারল পেছন থেকে।

“আমার মা ছিল পত্রতিলক রাক্ষসবংশের মেয়ে। সে বিখ্যাত ছিল অসামান্য সব ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য – সে যা বলত, তাই ঘটে যেত। বাবা সেই লোভেই তাকে অপহরণ করে বিয়ে করেছিল, যাতে মা তার সম্বন্ধে ভালো ভালো ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে সে বুঝতে পারল, ব্যাপারটা ঠিক ওরকম নয়। মা যা বলবে, তাই ফলে যাবে – কাণ্ডটা মোটেই ওরকম নয়। বরং যা ঘটতে চলেছে, মা সেটাই বুঝতে পারত আর ভবিষ্যদ্বাণী করত। তিনরক্তসম্পন্ন এক যোদ্ধা মানুষের জন্য একদিন ঐশিকদের বিনাশ হবে, এ বাণী সে-ই দিয়েছিল একসময়।

“বাবা আমাকে পিঠে ছুরি মারল বটে, কিন্তু আমিও ঐশিকের মেয়ে, তার ওপর রাক্ষসরক্তও আছে আমার দেহে। অত সহজে মরার পাত্রী ছিলাম না আমি। কিন্তু সেই বিষাক্ত বরফের ছুরি আমার শরীরের চামড়া, মাংস ধীরে ধীরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছিল। সে যে কী ভয়াবহ যন্ত্রণা, আমি বলে বোঝাতে পারব না। সেই অবস্থাতেই আমি ছুটলাম বজ্রধরের কাছে। অবস্থা ভালো নয় বুঝেই তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ নিয়ে এলেন রক্ষোবৈদ্যের কাছে।

“এখনও যে বেঁচে আছি, তার একমাত্র কারণ রক্ষোবৈদ্যের নিপুণতা। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জীবন-বন্ধনী প্রয়োগ করতে হত আমার ওপর। মেঘবর্ণ, স্বর্ণশেখর, নীলাব্র- ওরা কেউ তখন নেই আয়তনে। শরীরের যে অংশগুলো তখনও অক্ষত ছিল, সেগুলোকে বাঁচিয়ে বাকিগুলোকে কর্মক্ষম রাখার জন্য আমাকে দিতে হত শক্তিশালী মায়ারক্ত - আর সে রক্ত আমাকে দিয়েছিলেন বজ্রধর। সঞ্জীবন-বন্ধনীতে রক্ত দিলে ওই রক্তের মাধ্যমে দাতার জীবনীশক্তির বেশ কিছুটা দিয়ে দিতে হয় গ্রহীতাকে। এক মুহূর্তেরও দ্বিধা না করে ওই মানুষটা নিজের শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেও আমাকে রক্ত দিয়েছিলেন। আমার জীবনের জন্য ওঁর কাছে আমি ঋণী।

“আমি যে বেঁচে আছি, সে পরিচয় গোপন রইল সবার কাছে। কেবল সমরোত্তমরা, রক্ষোবৈদ্য আর পর্বত জানল সত্যিকথাটা। বাইরের সবাই জানল, আমি মায়াবিদ্যায় দক্ষ, আমি বজ্রধরের প্রিয় একজন ছাত্রী, ব্যস এইটুকুই। সারা শরীরের সঞ্জীবন-বন্ধনী যাতে কেউ দেখতে না পায়, তাই সর্বদা ঢেকে রেখেছি সর্বাঙ্গ; যাতে কেউ, বিশেষত ঐশিকশ্রেষ্ঠ দেখতে না পান, তাই ঢেকে রেখেছি মুখ। এও বজ্রধরেরই বুদ্ধি। আমার ‘শ্যামশ্রী’ নামটাও ওঁরই দেওয়া। এই গোটা জীবনটার জন্য, সমগ্র অস্তিত্বটার জন্যই আমি ঋণী রয়ে গেছি ওঁর কাছে। আমার নিজের বাবা আমাকে কোনোদিন ভালোবাসেনি, কিন্তু ওই মানুষটাকে দেখে আমি বুঝেছিলাম ‘বাবা’ কেমন হয়। ঠিকই বলেছে মেঘবর্ণ, ওঁর পরে আর কাউকে ‘অধিনায়ক’ সম্বোধন করতে আমরা কেউই পারব না।

“এত কিছুর পরেও আমার বাবাকে আমি একজায়গায় ভক্তি করেছি। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার প্রতি যত নিষ্ঠুর ব্যবহারই সে করে থাকুক না কেন, এই সমরগরিমা আয়তনকে, এখানে তার ছাত্রদের সে ভালোবাসে। এখানে যাতে সে এসে আমি যে বেঁচে আছি সেই কথাটা আমার অসতর্ক মুহূর্তে হঠাৎ আবিষ্কার না করে ফেলতে পারে, তাই আমি অভেদ্য মায়াবন্ধনী দিয়ে রেখেছিলাম আয়তনের সীমানা বরাবর। সমরোত্তমরা কেউ আহ্বান না করলে উনি আসতে পারতেন না ভেতরে। কিন্তু সেটুকু খালি আমার নিজের সুরক্ষার জন্যই ছিল। ওঁকে একজন অসামান্য যোদ্ধা হিসেবে, দুর্দান্ত শিক্ষক হিসেবে শ্রদ্ধা করতাম আমি এত ঘটনার পরেও। কিন্তু তখনও আমি জানতাম না যে আমার স্বামীকে বিশ্বাসঘাতক সাজানোর ষড়যন্ত্র ওঁরই; আর আমার ছেলেকেও নরকে পাঠানোর ষড়যন্ত্র করছেন উনি সুকৌশলে মানুষ-রাক্ষস যুদ্ধের আবহ তৈরি করে। বজ্রধরের বিরুদ্ধে চঞ্চলকে প্ররোচনা দিয়ে তাকেও উনি মেরে ফেললেন। আমার সব প্রিয়জনকে একে একে হত্যা করতে চাইছেন আমারই

বাবা, এ আমি ভাবতেও পারিনি।”

কোনো কথা না বলে অভী চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল, বিশালাকৃতির কী যেন প্রাণী একটা উড়ে আসছে চন্দ্রালোকিত গাছপালার ফাঁক দিয়ে।

একটা বিরাট পাখি। অভী চিনতে পারল তাকে। জটায়ুবাহিনীতে বজ্রধরের মহাগৃধ্র সুসভ্য।

বিরাট পাখিটা এসে বসল তাঁর সমাধির মাথার দিকে। স্থিরভাবে বসে রইল সে।

আরও কারা যেন আসছে বনের মধ্যে দিয়ে। অভী জিজ্ঞাসুভাবে তাকাল শ্যামশ্রীর দিকে। তিনি চোখের ইশারায় ওকে চুপ করে বসে থাকতে বললেন।

তিনটে হরিণ এগিয়ে এল; বজ্রধরের সমাধির কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল কোনো শব্দ না করে।

আরও বিভিন্ন জন্তু আসছে এক-এক করে। কয়েকটা খরগোস, বনবেড়াল, বন্য ছাগল। সবাই এসে দাঁড়াচ্ছে সমাধিকে ঘিরে।

সেই মা-চিতাটাকে চিনতে পারল অভী। দুটো ছানাকে নিয়ে সেও এসেছে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। তারা তিনজন জায়গা করে নিল অন্যদের মাঝখানে। একটা লক্ষ্মীপ্যাঁচা উড়ে এসে বসল সুসভ্যের পাশে – কেউ কাউকে আঘাত করল না; স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল সমাধিটার দিকে।

অভীর চোখে জল এসে পড়ল। সে একবার তাকিয়ে দেখল, শ্যামশ্রী নিঃশব্দে কাঁদছেন।

চিতার বাচ্চাদুটো এসে দাঁড়াল অভীর সামনে। তার মনে পড়ল, ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিতেন বজ্রধর। নির্ভয়ে সেও হাত রাখল বাচ্চাদুটোর মাথায়। ওর হাতে মাথা ঘষতে লাগল তারা। একটা হরিণ এসে চেটে দিল অভীর হাত।

চোখ মুছে শ্যামশ্রী বললেন, “এই সময়টার কথাই অনেকবার বলেছেন আমাকে অধিনায়ক বজ্রধর। যমদণ্ডের অংশশক্তি ধারণ করেছেন তো; মহাবীর ছিলেন উনি। তাই জানতেন, এ সময় আসবে; আমাদের অনেক আগেই চলে যেতে হবে ওঁকে। আমাকে বলেছিলেন, একটা মানুষ চলে গেলে কীই বা হয়? জীবন কি থেমে থাকে? না, সে চলতে থাকে আগের মতই। একটা শূন্যতা রয়ে যায়, কিন্তু সূর্য-চাঁদও আলো দেয়, গাছেও ফুল ফোটে, পৃথিবীও চলতে থাকে আপন গতিতে। উনি বলতেন, জীবনের এই বিশালত্বের মাঝখানে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়াতেই নাকি পরিপূর্ণ শান্তি।”

বজ্রধরের সমাধিকে ঘিরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জন্তুগুলো; তারপর ধীরে ধীরে একে একে আবার তারা ফিরে গেল গভীর অন্ধকার অরণ্যে। প্যাঁচাটা আর সুসভ্য উড়ে গেল দূরে।

শ্যামশ্রী বললেন, “উনি সবাইকে মেলাতে পারতেন; সে ক্ষমতা ওঁর ছিল। সে দায়িত্ব এখন আমাদের ওপর এসে পড়ল। ...চল, এবার ফেরা যাক।”

সমাধির সামনে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল অভী। তারপর ধীর পদক্ষেপে
মায়ের সঙ্গে স্থানত্যাগ করল।

প্রিয় অরণ্যের মাঝে জলাশয়ের ধারে শুয়ে রইলেন অকুতোভয় মহাবীর
অধিনায়ক বজ্রধর।

পরের দিন সকালে সহঅধিনায়ক শ্যামশ্রীর ঘোষণামতো শিক্ষার্থীরা অনুমতি
পেল একবার বাড়ির লোকেদের সঙ্গে দেখা করার – সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়। এত
বড়ো যুদ্ধের পর প্রত্যেকেই ছেলেমেয়েগুলিকে কাছে পেতে চাইবেন, এ তো
স্বাভাবিক ব্যাপার।

ছেলেমেয়েরাও এই সিদ্ধান্তে ভীষণ খুশি। বন্ধুদের সঙ্গে অভীও চলল
তাদের বাড়ি। প্রথমে ওরা যাবে মানবমন্দির, তারপর সুদক্ষিণসারি।

নীলাভ্র আর মেঘবর্ণও চলেছে ওদের সঙ্গে। দুই বন্ধুর এতদিন পরে দেখা
– তারা আর পরস্পরের সঙ্গে ছাড়তেই চাইছে না যেন। শ্যামশ্রীও আছেন সঙ্গে
– আজ আর তাঁর মুখে মুখোশ নেই; খোলা চুলের ঢল নেমেছে পিঠে।

অভী শুনল, নিধি আর লীনাকে বলছেন তিনি, “আজ কত বছর পর
কাজল দিলাম চোখে, ভাবতে পারছ?”

মায়ের মুখে হাসি, রোদ-ঝলমলে সকালবেলা। অভী সবার পেছনে হাঁটতে
হাঁটতে ভাবছিল, কী অদ্ভুত সুন্দর আজকের দিনটা।

মানবমন্দিরে পৌঁছে লীনা বলল, “তোমরা এখানে দাঁড়াও। আমি মায়ের
সঙ্গে দেখা করে একবার চমকে দিয়ে আসি।”

ওদেরকে রেখে বাড়ির দিকে ছুটে চলে গেল সে। শ্যামশ্রী আর নীলাভ্র
একটু দূরে সরে গেলেন, ফিশফিশ করে কী যেন আলোচনা করতে লাগলেন।
অভী, মেঘবর্ণ আর নিধি বসে পড়ল ঘাসের ওপর একটা গাছের ছায়ায়।
মেঘবর্ণ বলল, “অভী, আমার সবচেয়ে আনন্দ কীসে হচ্ছে জানো?”

“কীসে?”

“তোমাকে সমরগরিমায় আমি আনতে গিয়েছিলাম বলে। আমার আনা
ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র তুমি, একথা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা
নেই। তার সঙ্গে তোমার প্রথম অসিশিক্ষকও ছিলাম আমি। অবশ্য তুমি
আমাকেও ছাড়িয়ে গেছ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।”

অভী বলল, “না মেঘবর্ণ, আমি তোমাকে ছাড়াতে পারিনি, কেউ পারবে না।
অসিচালনাবিদ্যার অনেক কিছু আমার এখনও শেখা বাকি আছে, আর তুমিই
আমাকে শেখাবে সেসব। অবশ্য বাবার কথা জানি না, কিন্তু এই সমরগরিমায়
তোমার চেয়ে বড়ো অসিবিদ আমি আর কাউকে দেখিনি।”

নিধি বলল, “শুধু অভীকে শেখালে হবে না, আমিও শিখব কিন্তু, মেঘবর্ণ।”

মেঘবর্ণ হাসল। “শেখাব বই কি। উৎসাহী শিক্ষার্থীকে শেখাতে না পারলে
আমরা তোমাদের এখানে এনেছি কেন?”

নিধি বলল, “মেঘবর্ণ, আমার একটা কথা ছিল।”

“হ্যাঁ, বলো না।”

“সেই নীরসেনাদের দেখেছিলাম মৃত দেবতার নদীর ধারে। ওদের হাতে ত্রিশূল দেখেছিলাম, কিন্তু ওই অস্ত্রটা নিয়ে এখানে কাউকে যুদ্ধ করতে দেখিনি কখনও।”

মেঘবর্ণ বলল, “কী বলতে চাইছ বলো তো নিধি।”

নিধি বলল, “আমাকে ত্রিশূল নিয়ে যুদ্ধ করা শেখাবে?”

ক্র তুলল মেঘবর্ণ। “ওই অস্ত্রটি শেষে ভালো লাগল তোমার?”

“কেন? তাতে খারাপ কিছু আছে?”

নিধি বুঝতে পারল না, কিন্তু অভী দেখল, মেঘবর্ণ কী একটা বলতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। “নাঃ, খারাপ কিছু থাকবে কেন? ...ঠিক আছে, আমিই শেখাব তোমাকে ত্রিশূল ব্যবহার করা।”

নিধি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু লীনাকে আসতে দেখে থমকে গেল। লীনার মুখ খুব গম্ভীর।

অভী আর নিধি মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। অভী বলল, “ব্যাপার কী বলো তো?”

নিধি ঠোঁট উলটে বলল, “বুঝতে পারছি না।”

লীনা এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। মেঘবর্ণ হেসে বলল, “কী হল, লীনা? মুখ শুকনো কেন?”

লীনা বসল তার মুখোমুখি। “একটা কথা বলব, মেঘবর্ণ?”

“হ্যাঁ, বলো।”

“আমি যা বলব, তার উত্তরে সত্যি কথা বলবে, বলো।”

“বলব।”

“আমার বাবা সম্বন্ধে কী জানতে তুমি?”

মেঘবর্ণ একটু অবাক হয়ে বলল, “সবাই যা জানত, আমিও তাই জানতাম। খুব ভালো মনের মানুষ, খুব সৎ, পরিশ্রমী একজন মানুষ ছিলেন তোমার বাবা। তোমার মাকে খুব ভালোবাসতেন। আমিও বেশ পছন্দ করতাম ভদ্রলোককে। এই তো; আর কী জানতে চাও বলো?”

লীনা বলল, “আমার কিন্তু বাবাকে মনে পড়ে না। সে যখন মারা গেল, আমার বয়স তখন দু'বছর।”

মেঘবর্ণ কিছু না বলে তাকিয়ে রইল তার দিকে। লীনা আবার বলল, “আমি জানি কেন তুমি আমাদের বাড়ি আসতে চাও না, মেঘবর্ণ।”

“কেন?”

“মা বলেছে, তুমি খুব ভালো লোক, তাই।”

মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল মেঘবর্ণের। সে বলল, “লীনা, তুমি যদি বলো, তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব। বলো, তাই কি চাও তুমি?”

“না, আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে এসো আমাদের বাড়ি। মেঘবর্ণ, আমার বাবাকে অনেকদিন হারিয়েছি আমি, কিন্তু সে অভাব তুমি কোনোদিন বুঝতে

দাওনি। আড়াল থেকে খেয়াল রেখেছ, যত্ন নিয়েছ আমাদের - আমি সে কথা বুঝতে পারি না ভাবো তুমি?"

"কিন্তু তোমার মা...?"

"মা কী বলেছে শুনবে? মা বলেছে, যে মানুষ ভালোবেসে আত্মত্যাগ করতে পারে, তাকে নিজের জীবন দিয়ে ভরসা করা যায়। আর কিছু সে বলবে না আমি জানি, কিন্তু মেঘবর্ণ, মা তোমাকে ভরসা করতে চায়।"

বজ্রাহতের মতো বসে রইল সমরোত্তম মেঘবর্ণ। লীনা বলল, "এবার তুমি কী করবে, তোমার ইচ্ছা।"

ওরা বুঝতে পারেনি, কখন নীলাভ আর শ্যামশ্রী এসে দাঁড়িয়েছেন পেছনে। অটুহাসি হেসে নীলাভ জড়িয়ে ধরল বন্ধুকে। "আরে মেঘ, এতদিনে চাতক বারি যেচেছে রে! যা ভাই, আর দেরি করিস না।"

শ্যামশ্রী দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন মেঘবর্ণকে - তাঁর মুখে হাসি। "যাও বীর, তুমি এ সম্মানলাভের যোগ্যতা অর্জন করেছ।"

অভী আর লীনা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। নিধি বলল, "ঠিকই বলেছিলে লীনা। চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে দিলে এরা..."

হি হি করে খুব খানিক হেসে ওরা চলল সুদক্ষিণসারির দিকে। শ্যামশ্রী আর নীলাভ রয়ে গেলেন এখানেই।

নিধির মা খুব আদরযত্ন করলেন ওদেরকে। আজ তার বাবা একবার শুধু অভীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "রাক্ষসরক্ত শরীরে আছে তাহলে? রাক্ষসরাজ রাবণের তরবারি ধারণের ক্ষমতাও আছে শুনলাম তোমার? তা ভালো, তা ভালো।"

অভী কিছু না বলে একটু হাসল শুধু। কী-ই বা আর বলবে সে এসব কথার উত্তরে?

নীপা দৌড়ে এল, জড়িয়ে ধরল তাকে। "অভীদাদা!"

তার মা এসে বললেন, "কাল থেকে ওই একটা কথাই শুধু বলছে মেয়েটা। 'আমার অভীদাদাকে ওরা আগুনে ফেলেও মারতে পারেনি। আমার অভীদাদার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারেনি।' এই যে অভীদাদা, বোনটির একটু খেয়াল রেখো বাপু।"

পোশাকের মধ্য থেকে একটা উজ্জ্বল রত্ন বার করে আনল অভী। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা ভরে গেল সুন্দর নীলচে আলোয়।

নিধি অবাক হয়ে বলল, "তুমি এ জিনিস কোথায় পেলো? কী পাথর এটা?"

অভী বলল, "নীলকান্তমণি। ঐশিকশ্রেষ্ঠের মুকুটে ছিল এ বস্তু। কাল রাতে যুদ্ধের শেষে সমরোত্তম সহঅধিনায়ক শ্যামশ্রীর অনুমতি নিয়ে এটা নিয়ে রেখেছিলাম আমি - ওকে উপহার দেব বলে।"

খুশি হয়ে জিনিসটা নিয়ে একপাক নেচে নিল নীপা। তারপর মায়ের কান এড়িয়ে ফিশফিশ করে বলল, "তরুণ এসে দেখা করে গেছে আমার সঙ্গে। তোমাকে নিয়ে ও কী বলল জানো, অভীদাদা?"

"কী বলল?"

“বলল, তুমি নাকি দেবতাদের মতো লড়াই করো।”

“তাই?” অভী হাসল। “আর তুই কী বললি?”

“আমি বললাম, মোটেই না; তুমি আসলে লড়াই করো রাক্ষসদের মতো।
তাই না?”

আবার হাসল অভী। “কী যে বলি? আমি বোধহয় মানুষদের মতো লড়াই
করি, বোন।”

ওর বন্ধুরা হেসে উঠল। নিধি হালকা ধমক দিয়ে বলল, “যা, এটা তুলে
রাখ। দেখিস, বাবার নজরে যেন না পড়ে। অবশ্য পড়লেও ক্ষতি নেই; স্বয়ং
রাক্ষসরাজ রাবণের অস্ত্রধারণ করেছে যে ছেলে, তার বোনকে দেওয়া উপহার
দেখলে বাবাও আর নাক সিঁটকাতে পারবে বলে মনে হয় না।”

বাইরে থেকে কে যেন ডাকল, “অভী আছ নাকি এখানে?”

পর্বতের কণ্ঠস্বর। ব্যাপার কী? ওরা অবাক হয়ে উঠে গেল বাইরে।

পর্বতের মুখ বেশ চিত্তিত। অভী বলল, “ডাকছ কেন, পর্বতদা? কী
হয়েছে?”

পর্বত বলল, “আমি আয়তনে ছিলাম। এক গৃধ্র - সে কিন্তু আমাদের
জটায়ুবাহিনীর কেউ নয় - এসে এই বস্তুটি আমার কোলে ফেলে দিয়ে গেল।”

একটা স্বপ্ন-উপল। জিনিসটা অভীর হাতে দিয়ে পর্বত বলল, “এতে ধরে
রাখা দৃশ্যটা তোমার একবার দেখা দরকার।”

বাইরের মাঠে স্বপ্ন-উপল থেকে বেরিয়ে আসা দৃশ্যটা দেখেই চমকে উঠল
অভী।

রবিকাকা!

তার কথা কিছুক্ষণের জন্য তো ভুলেই গিয়েছিল সে। কিন্তু এ কী অবস্থা
তার!

কারা যেন রবিকাকাকে একটা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধেছে। কেউ একজন
কথা বলছে, যদিও তাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সেই অদৃশ্য ব্যক্তির গলা শুনে
এই সকালবেলাতেই অভীর বুক কেঁপে উঠল।

কী নির্মম, কী শীতল সে কণ্ঠ!

সে বলছে, “তুমি আসলে কে, আমরা ভালোই জানি, রবি। তুমি একটি
দারুণ প্রতিভাবান লোক। আর ওই ছেলেটাকে কেন তুমি নিজের কাছে
রেখেছিলে, তাও আমরা ভালো করেই জানি।”

রবিকাকা বন্দি অবস্থায় মাথা নাড়ছে, ছটফট করছে। আন্তরিকভাবেই সে
বলছে, “আমি কেউ না। আমি সামান্য লোক - জঙ্গলে ঘুরেফিরে রোজগার
করি। অভী আমার মরা ভাইয়ের ছেলে। আমরা খুব সামান্য লোক, বিশ্বাস
করুন। আমাকে ছেড়ে দিন।”

“ওই ছেলেটাকে আমাদের চাই।” বলে উঠল সেই ডয়ংকর কণ্ঠস্বর।
“সাত দিন সময়। হয় অভী, নয়তো তোমার মাথা - যে-কোনো একটা আমরা
নেবই। আমাদের থামাতে পারে, এমন কোনো শক্তি দুনিয়ায় নেই। কোনো
মানুষ বা রাক্ষসের ক্ষমতা হবে না আমাদের আটকানোর, মনে রেখো। তোমার

নিজের মায়াঅস্ত্রও আর তোমার কাছে নেই – তাই তুমিও কিছু করতে পারবে না, আমরা জানি। ভুলো না, সময় মাত্র সাত দিন।”

অভী অবাক হয়ে ভাবল, “রবিকাকার ‘মায়াঅস্ত্র’? সেটা আবার কী?”

কিন্তু যাই হোক, আর দেরি করা চলে না। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল সে। রবিকাকা বিপদে পড়েছে – যেতে তাকে হবেই। বন্ধুদের দিকে ফিরে সে বলল, “আমি চললাম। বাবা, মা আর মেঘবর্ণকে খবরটা দিয়ে দিয়ো।”

লীনা আর নিধি হাত তুলে আশ্বস্ত করল তাকে। লীনা বলল, “সাবধানে থেকো।”

মাথা নাড়ল অভী। কোমরে তার ঝুলছে প্রথম অস্ত্র-অনুশীলনের দিনে মেঘবর্ণের দেওয়া ময়ূরবজ্র তরবারি। মনে মনে সে বলল, “রবিকাকা নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। সাতদিন সময় দিয়েছে তো ওরা।”

তাও বুকের মধ্যে উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডটা ধকধক করছে জোরে জোরে। বন্ধুদের দিকে একটু হেসে হাত নেড়ে নীল দক্ষিণাবর্ত শঙ্খটায় ফুঁ দিল সে।

ওই যে আকাশ থেকে নেমে আসছে তার মহানীলগৃধ্র অপরাজিতা। তার ডানার ঝাপটার সঙ্গে দমকা বাতাস এসে লাগছে তার চোখে মুখে।

অপরাজিতার পিঠে উঠে পড়ল সে।

নীচে রয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা, হাত নাড়ছে তার উদ্দেশ্যে। ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে পর্বতের কুকুর বক্রপুচ্ছ। তারপর আরও উঁচুতে উঠে গেল তার বাহন। মাথার ওপরে ভেসে আছে রৌদ্রোজ্জ্বল সাদা মেঘের পুঞ্জ।

সেই মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেল অভী।

সমাপ্ত

শেষের কথা

এই উপন্যাসে উল্লিখিত অস্ত্র এবং যুদ্ধবিদ্যার বেশ কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে অমূল্য সাহায্য পেয়েছি যে কয়েকটি সূত্র থেকে, তাদের কাছে সশ্রদ্ধ ঋণ স্বীকার করলাম।

১ অগ্নিপুরাণ।

২ ধনুর্বেদ। যোগেশচন্দ্র রায়। হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা। প্রথম খণ্ড।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৩ ভারত-রহস্য। শ্রীরামদাস সেন প্রণীত। শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বহরমপুরে প্রকাশিত।

৪ ভারতের অস্ত্রশস্ত্রঃ প্রাচীন থেকে আধুনিক। প্রিয়দর্শন সেনশর্মা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

৫ War in Ancient India. V. R. Dikshitar. Macmillan and Co. Limited.



জন্ম মেদিনীপুর শহরে ১৯৮৫
সালে। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র।
পেশায় স্কুলশিক্ষক। নেশায় পাঠক।
দুঃসাহসে লেখক। লেখেন মূলতঃ
কল্পবিজ্ঞান ও ফ্যান্টাসি। বাংলা ও
ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখালিখি
করছেন দেশ ও দেশের বাইরের
বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও গল্প-
সংকলনে। অস্ট্রেলিয়া এবং
আমেরিকার একাধিক স্পেকুলেটিভ
সংকলন ও পত্রিকায় প্রকাশিত
হয়েছে বেশ কিছু গল্প। হলিউডে
অনুষ্ঠিত কল্পসাহিত্য প্রতিযোগিতা
এল. রন হারবার্ডের নামাঙ্কিত
'রাইটার্স অফ দ্য ফিউচার'-এ
একমাত্র ভারতীয় হিসাবে পরপর
দু'বছর পেয়েছেন 'অনারেবল
মেনশন'-এর সম্মান। ভালোবাসেন
বেড়াল, ব্যাটম্যান, সুকুমার রায়
এবং নলেন গুড়ের সন্দেশ।



aranyamon.com



Rs : 375,00